তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটির প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের যাত্রা শুরু হওয়ার পর অর্ধ-শতাধিক বৎসর অতিক্রম করলেও এখানে সেই অর্থে আঞ্চলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। বিশ শতকের বিশের দশকে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথম বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটান। তিনি বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে প্রথমদিকে 'কয়লাকুঠি' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'রেজিং রিপোর্ট' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'নারীর মন' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), 'বলিদান' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), 'জোহানের বিয়া'(১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)-এর মত বেশকিছু ছোটগল্প লেখেন। এরপর সেই একই অঞ্চলকে নিয়ে তিনি 'বানভাসি' (১৯২৩ খ্রিঃ), 'ষোল আনা' (১৩৩২ বঙ্গাব্দ), 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' (১৯২৬ খ্রিঃ), 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী' এবং 'কয়লাকুঠির দেশ' (১৯৫৮)-এর মত কয়েকটি উপন্যাস লেখেন। বিশ শতকের এই বিশের দশকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র 'পাঁক' (১৯২৬ খ্রীঃ) এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'বেদে' (১৯২৮ খ্রিঃ) উপন্যাসগুলি লেখেন। এরপর বিশ শতকের প্রথমার্ধে অঞ্চল জীবনকে পটভূমি করে একে একে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬ খ্রিঃ), সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ট্রিলজি 'নতুন ফসল'-এর 'ময়ূরাক্ষী' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭ খ্রিঃ) এবং 'সোমলতা' (১৯৩৮ খ্রিঃ), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' (১৯৩৮ খ্রিঃ) এবং 'ইছামতী' (১৯৫০ খ্রিঃ), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'ধাত্রীদেবতা' (১৯২৯ খ্রিঃ), 'কালিন্দী' (১৯৪০ খ্রিঃ), 'গণদেবতা' (১৯৪২ খ্রিঃ), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩ খ্রিঃ), 'কবি' (১৯৪৪ খ্রিঃ) এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭ খ্রিঃ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনখণ্ডে 'উপনিবেশ' (১৯৪৪ খ্রিঃ) এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৫০ খ্রিঃ)-এর প্রথম চরণ প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে মূলত উপরে উল্লিখিত রচনাগুলির আঞ্চলিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)

উপন্যাসটির দ্বিতীয় চরণ এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হলেও এটি যেহেতু প্রথম চরণটিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাই এই অধ্যায়ের আলোচনায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর দু'টি চরণেরই আঞ্চলিকতার বিষয়টি উঠে আসবে।

বিশ শতকের তথা বাংলা কথা সাহিত্যের আঞ্চলিকতা সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬ খ্রিঃ)-এর গল্প-উপন্যাস দিয়েই শুরু করতে হয়। কারণ বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই প্রথম আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটান। তাঁর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন — '' . . . বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা! নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি? বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা নতুন ভঙ্গী এনেছেন? হাতির দাঁতের মিনার চূড়া ছেড়ে যিনি প্রথমে নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে।''[১] তাঁর পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার খয়রাশোলের রূপসীপুর গ্রাম হলেও শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় এবং পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় শৈলজানন্দের শৈশব ও কৈশোর মাতামহের কাছে প্রথমে বর্ধমানের অণ্ডালে এবং পরবর্তীকালে রাণীগঞ্জে কাটে। ফলে শৈশব থেকেই তিনি বর্ধমানের এই কয়লাখনি অঞ্চলের প্রকৃতি এবং সাঁওতাল-বাউরি-হাড়ি জনজাতির তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষদের জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথম যৌবনে তিনি কয়লাখনি অঞ্চলে কাজও করেন। ফলে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এই কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষদের জীবনচর্যাকেই তাঁর লেখার পটভূমি করেন। এই সময় থেকেই তিনি গল্প লেখার দিকে ঝোঁকেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)-এর কার্তিক সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় শৈলজানন্দের প্রথম উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'কয়লাকুঠি' প্রকাশিত হয়। তাঁর এই 'কয়লাকুঠি' গল্পটি পড়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন — ''কে এই নবাগত? মাটির উপরকার শোভনশ্যামল আস্তরণ ছেড়ে একেবারে তার নিচে অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করেছে? সেখানে কয়লার বদলে তুলে আনছে হীরামণি?''[২] ১৩২৯ সালেরই ফাল্গুন মাসে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় তাঁর 'রেজিং রিপোর্ট' নামক ছোটগল্পটি। এই 'রেজিং রিপোর্ট' এবং ১৩৩০ সালে 'প্রবাসী'তে

প্রকাশিত ‘বলিদান’ গল্পটির প্রশংসা করে ড. সুকুমার সেন বলেছেন — ‘‘পরিপক্কতা লইয়া শৈলজানন্দের গল্প ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রবাসীতে বাহির হইল — নাম ‘রেজিং রিপোর্ট’। রানীগঞ্জ-উখড়া-দিশেরগড় অঞ্চলের কয়লাখাদের সাঁওতাল-বাউড়ী কুলি-কামিনদের ধাওড়ার অজ্ঞাত জীবন লইয়া শৈলজানন্দ যে গল্পস্রোত বহাইয়া দিয়া সাহিত্যজগৎ প্রায় চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত এই গল্পে এবং ‘বলিদান’ গল্পে।’’[৩] এরপর একে একে ‘নারীর মন’ (১৩৩০, কল্লোল), ‘জোহানের বিয়া’ (১৩৩৩, কালিকলম) গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। শৈলজানন্দের ‘জোহানের বিয়া’ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’ গল্প দু’টি পড়ে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক জীবনের রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পলেখার একটি নতুন পথের সন্ধান পান বলে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — ‘‘. . . এসময়ে আকস্মিকভাবে তাঁর হাতে পৌঁছায় ‘কালি-কলম’ পত্রিকার দুটি সংখ্যা (১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৯২৬) — এই দুই সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘জোহানের বিয়া’ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’। গল্পলেখার একটি নতুন পথের সন্ধান তিনি পেলেন, তার ফলে লিখলেন ‘রসকলি’ গল্প (১৯২৬)।’’[৪] এছাড়াও তিনি ‘ঝমরু’, ‘মরণবরণ’, ‘বন্দী’, ‘বনবিহগী’, ‘সাঁওতাল’-এর মত বেশকিছু ছোটগল্প লেখেন। তবে ‘কয়লাকুঠি’, ‘রেজিং রিপোর্ট’, ‘মা’, ‘নারীর মন’ এবং ‘জোহানের বিয়া’ গল্পগুলিকেই তাঁর কয়লাকুঠি সিরিজের গল্প বলা হয়। এগুলিতে তিনি রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার অন্ত্যজ মানুষদের তুলে এনে বাংলা কথাসাহিত্যে যথার্থ আঞ্চলিকতার সূচনা ঘটান।

শুধু ছোটগল্পেই নয়, উপন্যাসেও শৈলজানন্দ বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোলের সেই কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার অন্ত্যজ মানুষের জীবনের ছবি তুলে আনার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর হাতে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসেরও যাত্রা শুরু হয়। তিনি এই অঞ্চলটিকে পটভূমি করে অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। তবে এক্ষেত্রে শুধু কয়লাখনি অঞ্চল নয়, রাঢ়ের সমতলভূমির কথাও স্থান পেয়েছে। তাঁর এইরকম উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘বানভাসি’, ‘ষোল আনা’,

'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী' 'পাতালপুরী' 'কয়লাকুঠির দেশ'-এর মত কয়েকটি উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিলেই শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার স্বরূপ স্পষ্ট করা সম্ভব হবে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিকতার আবাহন করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের খয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে কিছু ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এজন্য বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত তাঁর প্রথমদিককার ছোটগল্পগুলিকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কিছু ছোটগল্প পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন — ''শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দারিদ্র্য জীবনের যথার্থতা, অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লিখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনার দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। . . . তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি।''[৫] বিশিষ্ট সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীও শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সম্পর্কীয় গল্পগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন — ''কয়লাকুঠির গল্পগুলি বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজের একঘেয়ে প্রথাবদ্ধ জীবনে এক অনাস্বাদিত মুক্তির সুখস্পর্শ বহন করে আনল। এক সজীব সতেজ জীবনরসের অফুরন্ত স্রোত প্রবাহিত করে দিল বাঙলা কথাসাহিত্যে। কয়লাখনির অতল থেকে লেখক তুলে আনলেন দীপ্ত প্রাণের হীরকখণ্ড। রানীগঞ্জ ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাকুঠির অধিবাসী সাঁওতাল, বাউড়ি, কুলি-কামিনদের সুস্থ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আদিম জীবনের নিঃসঙ্কোচ প্রেম, ঈর্ষা, আত্মত্যাগ ও অকুণ্ঠ স্থূল উদ্দামতার বলিষ্ঠ সরল কাহিনী বাঙালি পাঠকের দৃষ্টিকে মুগ্ধ অভিভূত করে দিল। বস্তুত শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি অঞ্চলের গল্পের মধ্য দিয়ে বাঙলা কথাসাহিত্যের আঞ্চলিকতা (Regionalism) বা স্থানীয় রঙ (Local Colour) বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।''[৬] শুধু তাই নয়, বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেনও তাঁর গল্পকার সত্তার ভূয়সী প্রশংসায় মুখর হয়েছেন — ''শৈলজানন্দের গল্প ''বাস্তব'' (রিয়ালিস্টিক) বলিতে যাহা বোঝায় শুধু তাহাই নয়, ''বাস্তবিক''ও। তীব্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অনুভব শৈলজানন্দের সাহিত্য-সাধনাকে পরিচিত সরণি হইতে ভুলাইয়া উপেক্ষিত-অবজ্ঞাত মানুষের অপরিচিত জীবনের অনাবিষ্কৃত গহনের দিকে পরিচালিত করিয়াছিল।''[৭] আর তাঁর রচিত গল্পগুলি সম্পর্কে অধ্যাপক সেন বলেছেন — ''স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরাজীতে বলে ''লোক্যাল কালার'', তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল। অথচ কাহিনীর অত্যন্ত জৈবিক মানুষগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে কোথাও খর্ব হইয়া হারাইয়া যায় নাই। বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু নূতন।''[৮] এজন্য বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনা করতে বসলেও শৈলজানন্দের কিছু ছোটগল্পের পরিচয় নিতেই হয়। তবে যেহেতু আমাদের আলোচনা উপন্যাসকেন্দ্রিক, তাই আমরা শৈলজানন্দের ছোটগল্পের আলোচনা তাঁর কয়লাকুঠি সিরিজের 'কয়লাকুঠি', 'রেজিং রিপোর্ট' 'মা', 'জোহানের বিয়া' এবং 'নারীর মন' — এই পাঁচটি গল্পের মধ্যে সীমবদ্ধ রেখেছি।

মাত্র বাইশ বছর বয়সে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর **'কয়লাকুঠি'** গল্পটি রচনা করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) কার্তিক সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় এই গল্পটি প্রকাশিত হয়। বাউরি সম্প্রদায়ের মেয়ে বিলাসীর সুতীব্র প্রেমতৃষ্ণা এবং তার করুণ পরিণতি নিয়ে গল্পটি রচিত। গল্পটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্বামী নানকুকে তার স্ত্রী বিলাসী প্রচণ্ড ভালোবাসত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানকু মাইনু নামে আর এক মেয়েকে মন দেয়। তারা দু'জনে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বিলাসী রমনা নামে একজনের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। সে তাকে শরীর দিলেও নানকুর প্রতি অবিচল ভালোবাসা থাকায় মন দিতে পারে না। একদিন বিলাসী খবর পায় যে, মাইনু মারা গেছে এবং নানকু ফিরে এসেছে। এতে বিলাসী আনন্দে আত্মহারা হলেও পরে জানতে পারে কয়লাখনিগর্ভে চাপা পড়ে তার স্বামী নানকুও মারা গেছে। এই খবর শুনে সে প্রচুর মদ্যপান করে রাতের অন্ধকারে খনির তলায় নেমে গিয়ে নানকুর মৃতদেহ খুঁজে বের করে এবং তাকে

জড়িয়ে ধরে উন্মাদিনীর মত বিলাপ করে। এমন সময় কয়লার একটা 'মস্ত চাংড়া' তাদের মাথার উপর সশব্দে নেমে পড়লে নানকুর সঙ্গে সঙ্গে বিলাসীও খনিগর্ভে সমাধিস্থ হয়ে যায়। এভাবে বিলাসী ও নানকুর জীবনের বেদনা-ঘন পরিণতিতে 'কয়লাকুঠি' গল্পটি শেষ হয়েছে।

এই গল্পে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ-আসানসোল এলাকার কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমির বর্ণনা স্বল্প হলেও অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। বিলাসী, নানকু, রমনা, মাইনুর মত চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপ পুরোপুরি এই কয়লাখনি অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের শ্রমিক-মজুর শ্রেণির মানুষদের কথাই স্মরণ করায়। বিশেষ আঞ্চলিক প্রতিবেশের বাইরে এইরকম মানুষজনের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বাউড়ি কন্যা বিলাসীর স্বামী নানকুর প্রতি প্রেমে একনিষ্ঠ থেকেও রমনা খালাসীকে দেহদান করা গল্পটির একটি বিশেষ দিক। আবার ঘরে পতিব্রতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নানকুর অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ সেই কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শ্রমিক-মজুরদের মানসিকতাকেও স্পষ্ট করে। এখানে সাঁওতাল-বাউড়িদের মতো উপজাতি সম্প্রদায়ের আদিম প্রেমের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। প্রচুর মদ্যপান করে বিলাসী স্বামীর মৃতদেহের সন্ধানে যেভাবে কয়লাখনির গর্ভে নেমেছে তা একমাত্র ঐ অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের নারীদের পক্ষেই সম্ভব। হয়তো এখানে আঞ্চলিকতার বিস্তৃত রূপ প্রকাশ পায় নি, ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তবুও এই 'কয়লাকুঠি' গল্পটিতে গল্পকার আঞ্চলিকতাকে নিয়ে এসে বাংলা কথাসাহিত্যে একটা নতুন দিক উন্মোচন করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার পথ অনেকটাই প্রশস্ত করেছে।

'কয়লাকুঠি' গল্প প্রকাশের বছরেই অর্থাৎ ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শৈলজানন্দের কয়লাখনি অঞ্চল নির্ভর আর একটি ছোটগল্প **'রেজিং রিপোর্ট'** প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী'র ফাল্গুন সংখ্যায়। এই গল্পে তিনি কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিক-শোষণের করুণ, মর্মন্তুদ ও কদর্য চিত্র এঁকেছেন। এর কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, কয়লাখনি ম্যানেজার জেমস সাহেব অধিক মুনাফা লাভের নেশায় শ্রমিকদের অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও দু'বার ভাবেন না। তার এই উদগ্র আকাঙ্ক্ষার বলি হয় কয়লাখনির শ্রমিক টুইলা। সে খনির অতলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। কিন্তু

তার মৃত্যু জেমস সাহেবের লোভকে একটুও টলাতে পারে নি। তিনি এই ঘটনাটিকে হালকাভাবে নেন এবং অত্যন্ত উদ্ধতভাবে বলেন — 'কুছ পরোয়া নেই'। কারণ হিসেবে জানান যে, তার হাতে এরকম অনেক হয়েছে। তবুও যেন তেন প্রকারে কয়লার রেজিং বাড়াতে হবে। একসময় খনির রেজিং-বাবু তাঁর কাছে টুইলার ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রসঙ্গ তুললে তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলেন — "Damn your Tuila." এইভাবে এই 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পটিতে এক খনি শ্রমিকের মৃত্যু এবং তজ্জনিত মালিকপক্ষের মনোভাব প্রকাশ করে শৈলজানন্দ সেই অঞ্চলের শ্রমিক-শোষণের ছবি এঁকেছেন। এই গল্পেও রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের জীবন পরিক্রমার ছবি আছে। পাশাপাশি অঞ্চলটির মানুষজন সম্পর্কে তথাকথিত সভ্যসমাজের মনোভাবের কথাও উঠে এসেছে। এগুলি সবই আঞ্চলিকতার লক্ষণ। তাই অধ্যাপক সুকুমার সেনের মত ভাষাবিদ্ ও সাহিত্য-সমালোচক আঞ্চলিকতার নিরিখে শৈলজানন্দের 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

শৈলজানন্দের **'মা'** গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৩৩০ বঙ্গাব্দ)। এটিও গল্পকারের কয়লাকুঠি সিরিজের গল্প। এখানে আঞ্চলিকতার পটভূমিকায় সাঁওতাল যুবক-যুবতীর সমাজ-বিগর্হিত অসংযত যৌবনলীলা, সাঁওতালদের সমাজ-জীবনের ইতস্তত রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাঁওতাল রমণী পরী। সাঁওতাল যুবক টুরা তাকে ভালোবাসে। পরীর সঙ্গে টুরার বিয়ে দিতে টুরার পিতা লামারও আপত্তি নেই। পরী তাকে ভালোবাসলেও তার জ্যাঠা তথা প্রতিপালক দুখনের আপত্তিতে বিয়ে করতে পারে নি। কারণ দুশ্চরিত্র জামাইয়ের হাতে পড়ে তার একটি মাত্র মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করায় দুখনের বিয়ের প্রতি আস্থা চলে গিয়েছিল। পরী ও টুরা দু'জনেই কয়লাখনিতে কাজ করে। টুরা পরীকে বারবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেও সে প্রত্যাখ্যান করে। এরূপ অবস্থায় একদিন কয়লাখনির অন্ধকারে টুরা পরীকে জোর করে ভোগ করলে পরী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তবুও সে টুরাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না এবং আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে শেষ পর্যন্ত তার নবোদ্ভুত জননী সত্তার কারণেই আত্মাহুতি দেওয়া সম্ভব হয় না — তিন নম্বর খাদে আত্মাহুতি দিতে গিয়ে সন্তানের

মুখ মনে পড়লে সে ফিরে আসে। ফিরে আসার পথেই তার সন্তান জন্ম নেয়। সেখানে টুরা এসে পৌঁছোলে পরী আর কোনো কথা না বলে টুরার পেছনে পেছনে ধীর পদক্ষেপে তার কুটিরে এসে প্রবেশ করে। এভাবে এই গল্পে এক প্রান্তিক সমাজের নারী পরীর জননীসত্তার উন্মোচন ঘটানো হয়েছে। পাশাপাশি গল্পটিতে কয়লাখনি অঞ্চলের প্রান্তিক সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজ জীবনের বহুমাত্রিক ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য এই 'মা' গল্পটিও একটি সার্থক আঞ্চলিক গল্প হতে পেরেছে।

শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সিরিজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল **'নারীর মন'**। গল্পটি 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)-য় প্রকাশিত হয়। কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একই পুরুষকে নিয়ে দুই নারীর ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মান-অভিমান এবং সবশেষে গভীর ভগিনী-স্নেহ এই গল্পের মূল উপজীব্য। এই গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ভুলি সাঁওতাল যুবক ভোলার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে পীরু মাঝির পৌরুষ ও উদ্দামতায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের পর জানা যায় ভুলি বন্ধ্যা। এই অজুহাতে পীরু ভুলির বোন টুরনীর প্রতি আকৃষ্ট হলে ভুলি তার প্রতিবাদ করায় স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয়। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ভোলাকে পীরুর বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। সে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভোলা যদি পীরুকে পরাস্ত করতে পারে তাহলে সে তাকে 'সাঙা' করবে। ভুলিকে পাবার আশায় একদিন বিকেলে কয়লাখাদ থেকে ফিরে আসার সময় পরিশ্রমক্লান্ত অবসন্ন পীরুকে ভোলা আক্রমণ করে। জেতা তো দূরের কথা পীরুর কাছে খুব সহজেই ভোলা হার মানে। কিন্তু গাছের আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখে ভুলি একটুও হতাশ হয় না, বরং স্বামী পীরুর জয়ে উল্লসিত হয়। তবে সে সব ছেড়ে আসাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ট্রেনে চেপে বসে। এদিকে আসাম যাওয়ার কথা ছিল তার বোন টুরনীর। টুরনী স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই ট্রেন ছেড়ে দিলে দূরে পলাশ বনে বোনের দৌড়ে আসা দেখে ভুলির চোখ ছলছল করে ওঠে। সে প্রাণ ভরে বোনকে দেখে নিয়ে জানালার পাশে সরে বসে। এইভাবে এই গল্পে শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের অন্ত্যজ নারীদের আদিম ও অকৃত্রিম প্রেম, তাকে পাওয়ার জন্য উদগ্র ও উদ্দাম আচরণ, বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রতিশোধস্পৃহা এবং ভগিনীপ্রীতির ছবি চিত্রিত করেছেন।

এগুলি একটি বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যাকেই প্রতিফলিত করেছে। ফলে কয়লাকুঠি সিরিজের অন্যান্য গল্পের মত 'নারীর মন' গল্পটিও একটি সার্থক আঞ্চলিক গল্প হয়ে উঠেছে।

'জোহানের বিয়া' গল্পটিও কয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখীর মাধ্যমে গল্পকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীর আপাত নির্দয় বুকে প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকিয়ে থাকার ছবি এঁকেছেন। উচ্ছল যুবতী সুখী পরিস্থিতির চাপে পড়ে খোঁড়া জোহানকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু জোহান দৈহিকভাবে সুখীর যোগ্য না হওয়ায় সুখী তাকে নানা ভাবে অবজ্ঞা করে। তার জীবনে জোহানের উপস্থিতিকেও সে অস্বীকার করতে চায়। ঘটনাক্রমে জোহানের অপমৃত্যু ঘটলে সুখী প্রথম বুঝতে পারে তাঁর হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে জোহানের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে। এইজন্য সে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই গল্পে শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সারল্যময় ভালোবাসা ও বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। দেহকে আশ্রয় করে এই ভালোবাসা বিকাশ লাভ করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত দেহাতীত ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়েছে।

এইরকম অজস্র ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে শৈলজানন্দ বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর এই জাতীয় গল্পের প্রশংসা করে বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন — ''শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০) বাঙলা কথাসাহিত্যে তাঁর কয়লাকুঠির গল্প দিয়ে একটা নতুন হাওয়া এনে দিয়েছেন। কয়লার খনি, তার কুলি-মজুর, সাঁওতাল নর-নারী, নিচুতলার মানুষদের বিচিত্র সমাবেশ — বাউরি-হাড়ি-ডোম, খনি-জীবনের পরিবেশের মধ্যে এই অকিঞ্চন মানুষদের অনালোকিত দিনযাপন, একে অবলম্বন ক'রে শৈলজানন্দ যে-সব গল্প লিখেছেন, উপাদানের নতুনত্বের কারণেই শুধু নয়, সহানুভূতির বিস্তারের কারণেও এই গল্পগুলি সেদিন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং কালক্রমে এইভাবে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে যাকে আধুনিক বলতে বাধা নেই।''[৯]

আমাদের আলোচনা যেহেতু উপন্যাসনির্ভর তাই এবারে আমরা শৈলজানন্দের উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি কতটা উঠে এসেছে সেদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এব্যাপারে আমরা বাংলা উপন্যাসের বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছি, যেখানে তিনি ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দের সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসাও করেছেন — ''রচনার প্রাচুর্য ও অজস্রতার দিক দিয়া শৈলজানন্দ সম্মানজনক উল্লেখের অধিকারী। তাঁহার বড় উপন্যাসের মধ্যে কোনোটিই উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কয়লাকুঠির কুলি-মজুর-সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান ও প্রণয়লীলা হইতে বৈচিত্র্য-আহরণের চেষ্টাতেই তাঁহার প্রধান মৌলিকতা।''[১০] শৈলজানন্দের অনেক উপন্যাসই বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যাকে পটভূমি করে রচিত। তবে তাঁর উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনা 'ষোল আনা' এবং 'কয়লাকুঠির দেশ' — এই দু'টি উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকে রচিত **'ষোল আনা'** উপন্যাসটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি সে সময়ে প্রচলিত বীরভূম-বর্ধমানের 'ষোল আনা' ব্যবস্থার ক্লিন্ন রূপটিকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনি অংশ খুব বেশি নয়। এর সূচনায় দেখা যায় যে, রুক্মিণী নামক এক সুন্দরী মেয়ে তথাকথিত নীতির ধার না ধেরে রাখাল নামক এক যুবককে বিয়ে না করেই ঘরে এনে বসবাস করলে গ্রামের মাতব্বরদের সভা 'ষোল আনা'-র কর্তারা ক্ষেপে যায়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আস্ফালন দেখায় হরি পন্ডিত। সে রুক্মিণীর বাড়িতে মৃদু তিরস্কার করতে যায়। তবে স্বাধীনচেতা রুক্মিণী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় মীমাংসার জন্য সে রুক্মিণীকে 'পালোয়ার' জোগাড় করে দিতে বলে। রুক্মিণী তার কথা মত রাখালের পোষা একটি বড় পাঁঠা গ্রামের 'ষোল আনা'কে উপহার দেয়। তবে উপন্যাসের কাহিনি এখানেই শেষ হয় না। এরপর উপন্যাসের কাহিনি রুক্মিণীকে বাদ দিয়ে ভিন্নমুখী হয়। এই ভিন্নমুখী কাহিনিতেও 'ষোল আনা' ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। এই অংশে নিতাই ডাক্তার, মাতু পিসি ও তার মেয়ে রানীর কথা স্থান পেয়েছে। গ্রামের 'ষোল আনা'-র চাপে পড়ে বিবাহিত এবং সন্তানের জনক নিতাই ডাক্তার মাতু পিসির মেয়ে রানীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। অবশ্য নিতাই ডাক্তারের এই বিয়ের পেছনে জমি ও অর্থের লোভও কাজ করেছিল। তার প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মী এই ঘটনায় ভেঙে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মেনে নেয়। কিন্তু বিয়ে সম্পন্ন হলে মাতু

পিসি প্রতিশ্রুতি মত জমি ও অর্থ নিতাই ডাক্তার এবং হরি পন্ডিতকে দিতে অস্বীকার করলে তারা রানীর বিরুদ্ধে 'কুশ পাঁথোল' সংঘটিত করতে প্রয়াসী হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'কুশ পাঁথোল' হয় না — রানীর মা মাতু জামাইকে ১০০ টাকা যৌতুক দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে গ্রামে কালভৈরবের গাজন শুরু হলে মেলা থেকে ফেরার পথে রানীর সঙ্গে নিতাই ডাক্তারের দেখা হয়। ডাক্তার রানীকে দেখে মজে গিয়ে তার সঙ্গে ঘরে আসে, যা দেখে মাতু খুশি হয়। এরপর উভয়ের মিলনের ইঙ্গিতে উপন্যাসটির কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

এই উপন্যাসটির কাহিনি অংশ স্বল্প হলেও বর্ধমান ও বীরভূমের সীমান্ত এলাকার ছোট্ট একটি গ্রামের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক লক্ষণ আছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীও অবগত করেছেন — ''লেখক 'ষোল আনা' গ্রন্থে এই অঞ্চলের 'লোকাল কালার' নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন — এখানেই তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব। সমগ্র গ্রামটির পথঘাট বাড়ীঘর এবং সর্বোপরি কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোভী স্বার্থপর সংকীর্ণচেতা মানুষগুলি একেবারে জীবন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।''[১১] উপন্যাসটির সূচনাতেই আঞ্চলিক পটভূমি মূর্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে ভৈরবীতলা, কয়লাখাদের উল্লেখের পাশাপাশি দু-একবার কয়লাকুঠির প্রসঙ্গও এসেছে। তবে সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে অরণ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামটি। এখানকার আঞ্চলিক গ্রাম শাসনব্যবস্থা হল 'ষোল আনা'। এটি আসলে গ্রাম্য সমাজপতিদের কার্যসিদ্ধির মাধ্যম। উপন্যাসে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম্য মাতব্বরদের অত্যাচার, লোভ, নীতিহীনতার দিকটিকে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। 'পালোয়ার', 'কুশপাঁথোল' প্রভৃতি লোকবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক পটভূমিকে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাষারীতিতে আঞ্চলিক রূপটি গৃহীত হয়েছে। যেমন 'লি-গা', 'জাড়ের রেতে', 'তুমার বিটি', 'ফেলব নাই কুনুদিন', 'লগৌই দিছি', 'গেলম', 'কুথা' প্রভৃতি। সুন্দরী রুক্মিণী, রাখাল, হরি পন্ডিত, নিতাই ডাক্তার, লক্ষ্মী, মাতু পিসি, রানীর মত উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র ও তাদের আচার-আচরণ উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি দ্বারা প্রভাবিত। এসব কারণেই অল্প বয়সে লেখা শৈলজানন্দের এই 'ষোল আনা' উপন্যাসটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হবার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাসেই রাঢ়বঙ্গ এবং সেখানকার কয়লাখনি অঞ্চল প্রাধান্য পাওয়ায় তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হবার পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল **'কয়লাকুঠির দেশ'**। এটি তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস। এর প্রকাশকাল হল ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ। এই উপন্যাসটিতে শৈলজানন্দ বর্ধমান–বীরভূমের কয়লাখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকায় নব্য ধনী দেবু চাটুজ্যের পুত্র রঞ্জনের সঙ্গে বনেদি মুখুজ্যে বংশের সীতারাম মুখুজ্যের কন্যা মালার রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনি অংশ থেকে জানা যায় যে, দেবু চাটুজ্যে ছিল কোলিয়ারির একজন কর্মচারী। কিন্তু কোলিয়ারির নিঃসন্তান এবং বৃদ্ধ ম্যানেজারের বদান্যতায় তার ভাগ্য রাতারাতি বদলে যায়। তিনি দেশে ফিরে যাবার সময় নিজের কুঠিগুলির স্বত্ব কর্মচারী দেবুর নামে লিখে দেন। ফলে দেবু হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠে। এই দেবুর পুত্র রঞ্জনের সঙ্গে সেই অঞ্চলের বনেদি মুখুজ্যে বংশের মেয়ে মালার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মালার পিতা সীতারাম যখন রঞ্জনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে মনস্থ করেছিলেন, তখন একদিন দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির আশায় দেবু সীতারামের কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে মিষ্টিমুখ করে দু'হাজার টাকা নিয়ে যায়। তবে অর্থের লোভে সে এই বিয়ে ভেঙে কোনো এক রাজার কন্যার সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে স্থির করে এবং লোক মারফৎ সীতারামের টাকা ফেরৎ দেয়। ফলে রঞ্জন ও মালার প্রণয়ে সঙ্কট নেমে আসে। এ সময় চুমকি নামের এক ইরানি কন্যা মালাকে রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও নিজে রঞ্জনকে ভালোবেসে ফেলে। সে সরাসরি রঞ্জনকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় এবং তাকে পাবার আশায় দল ছাড়ে। রঞ্জন চুমকির প্রেম প্রস্তাব নাকচ করে দিলেও ইরানি যাযাবর দলটির এক ব্যক্তি তাকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করে বসে। শেষ পর্যন্ত ঐ দলের অন্য একটি লোকের প্রচেষ্টায় রঞ্জন রক্ষা পায়। তবে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কিছুদিন পর মুখুজ্যদের পুকুরে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেলে দেবু চাটুজ্যে সীতারামের নামে খুনের অভিযোগ আনে, যার পরিণামে সীতারামের জেল হয়। এভাবে পরিস্থিতি জটিলতার দিকে এগোলে হঠাৎ রঞ্জনের আবির্ভাব ঘটে। রঞ্জন জানায় সে পালিয়ে গিয়ে এতদিন তার পিসির বাড়িতে ছিল। রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যাওয়াতেই সে ফিরে এসেছে। ফলে

সীতারামের জেল থেকে মুক্তি ঘটে এবং দেবু তার কৃতকর্মের জন্য তার কাছে ক্ষমা চায়। এমতাবস্থায় রঞ্জন ও মালার বিয়েতে কোনো অসুবিধা না থাকলেও মালা বেঁকে বসে। তার বক্তব্য যে, যার জন্য তার বাবা জেল খেটেছে তাকে কোনোমতে বিয়ে করবে না। অবশেষে সকলের চেষ্টায় জট খোলে এবং মালা ও রঞ্জনের বিয়ের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই উপন্যাসটির আলোচনায় আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উঠে আসে। বস্তুত এখানে বীরভূম-বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকে গ্রহণও করা হয়েছে। উপন্যাসটির সূচনাতেই সুলতানপুরের কয়লাখনি অঞ্চলের ভৌগোলিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেখানকার অসমতল ভূমি, আঁকাবাঁকা রাঙামাটির পথ, গেরুয়া রঙের ক্রমশ কালো হয়ে আসা, মাঠের মাঝে যেখানে সেখানে চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া উঠে আসা, লোহার তৈরি প্রকাণ্ড হেড গিয়ারের দণ্ডায়মান থাকা, কয়লাবোঝাই টবগাড়ির আসা যাওয়ার বর্ণনার মধ্য দিয়ে এখানে আঞ্চলিকতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। কয়লার দামের ওঠা নামার মধ্য দিয়ে সেখানকার অর্থনীতিরও যে ওঠা নামা হয় এই উপন্যাসে তারও উল্লেখ আছে — ''কিন্তু এখানকার সবকিছু যেন ওই কয়লার বাজারের সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা। কয়লার দাম যখন চড়ে, সকলের মুখে হাসি ফোটে। আবার দাম যখন পড়ে, চারিদিকে মনে হয় যেন অন্ধকার।''[১২] সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে অত্যন্ত জীবন্তভাবে আছে কয়লাখনি অঞ্চলের প্রকৃতির বাস্তবচিত্র — গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতের বর্ণনা। শুধু তাই নয়, ঔপন্যাসিক সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত 'জল শান্তির উৎসব', 'সংকট-মোচন পূজা'র মত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের কথাও এখানে বলেছেন। জল শান্তির উৎসবের বর্ণনায় লেখা হয়েছে — ''শুরু হল জলশান্তি। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা উপবাস করে রইল।''[১৩] আর সংকট-মোচন পূজার বর্ণনায় লেখা হয়েছে — ''ওদিকে হিঙুল নদীর তীরে শ্মশান ঘাট। সেই শ্মশানের পাশে সঙ্কটভৈরবীর মন্দির। বিপদের দিনে গ্রামের লোক এই সঙ্কট তারিণীর মন্দিরে তাদের সঙ্কটমোচনের প্রার্থনা জানায়।''[১৪] উপন্যাসটিতে শৈলজানন্দ ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় ভাষারীতিরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাই 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

তবে আঞ্চলিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়েও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠির দেশ’ সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি। অধ্যাপক-সমালোচক অলোক রায়ের ‘সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য’ গ্রন্থে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার সূচনা শৈলজানন্দ করেছিলেন বলে মন্তব্য করা হলেও তাঁর ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি – – ‘‘বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শৈলজানন্দ এই ধারাটির সূচনা করলেও তাঁর ‘কয়লাকুঠির দেশ’ ঠিক সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। প্রকৃতি এখানে প্রেক্ষাপটে থেকেও চরিত্রগুলির উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি এবং স্বয়ং একটি চরিত্র হয়ে দেখা দেয়নি।’’[১৫] এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সার্থক আঞ্চলিক গল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করলেও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় তাঁর ব্যর্থতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করেছেন — ‘‘বাংলায় আঞ্চলিক গল্প-উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘নারীমেধ’ নামে গ্রথিত ত্রয়ী-গল্পে (১৯২৮)। সার্থক আঞ্চলিক গল্প তিনি লিখেছেন, কিন্তু উপন্যাসে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ‘কয়লাকুঠির দেশ’। তা উপন্যাস, কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাস নয়, কারণ প্রকৃতি সেখানে কাহিনীর পটভূমিমাত্র, কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চরিত্র নয়, প্রকৃতি সেখানে পাত্রপাত্রীর উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ উপন্যাসে রঞ্জন ও মালার জীবনের সমস্যা (বিবাহ সমস্যা) যে কোন দেশে কালে ঘটতে পারে।’’[১৬] প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কয়লাখনি অঞ্চলকে প্রেক্ষাপট করে মালা ও রঞ্জনের প্রণয় সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের বিরোধের ছবি এঁকেছেন। মালা, রঞ্জন, দেবু, সীতারাম, চুমকির মত উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা কেউ কয়লাখনি অঞ্চলটি দ্বারা প্রভাবিত নয়। বস্তুত উপন্যাসটির পটভূমি কয়লাখনি অঞ্চল না হয়ে অন্য কোথাও হলেও উপন্যাসের কাহিনি এবং চরিত্র চিত্রণে তেমন কোনো ব্যাঘাত ঘটত বলে মনে হয় না। ফলে শৈলজানন্দের ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে নি।

এই উপন্যাস দু'টি ছাড়াও শৈলজানন্দের 'বানভাসি', 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী', 'পাতালপুরী'র মত অসংখ্য উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে রাঢ়বঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এগুলি উপন্যাস হিসেবেই প্রথম শ্রেণির মধ্যে পড়ে না। এজন্য আঞ্চলিক দিকটাও তেমনভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। যাই হোক, বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতা আনয়নের ক্ষেত্রে শৈলজানন্দকে ভগীরথের মর্যাদা দেওয়া হয়। অনেকেই এবিষয়ে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তবে সবাই যে একবাক্যে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন এমন নয়। যেমন তাঁর সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের বিখ্যাত বাস্তববাদী চিত্রকর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মূল্যায়নে বলেছেন — ''শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ — কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এর বাস্তব সংঘাত আসে নি। বস্তিজীবন এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসে নি — বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবাবেগ।''[১৭] আবার অধ্যাপক সুকুমার সেনের মত বোদ্ধা তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথনির্দেশক রূপে বর্ণনা করে তাঁকে শৈলজাপন্থী লেখক বলে মন্তব্য করেছেন — ''তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন — পুরোনো গ্রামের জমিদার-ঘর হইতে নদীচরের মালো-বেদে পাড়া পর্যন্ত।''[১৮]

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সূচনালগ্নের আলোচনাকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের **'পাঁক'** উপন্যাসটিকেও স্থান দিতে হয়। কারণ বিশ শতকের বিশের দশকে 'কল্লোল' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ খ্রিঃ) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে গতানুগতিকতা কাটিয়ে একদল সাহিত্যিক নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসর হন। এতে বাংলা উপন্যাস-ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে আমাদের চিরপরিচিত শহর বা গ্রাম নির্ভরতা কাটিয়ে বসতি, শহরতলি বা অচেনা-অজানা কোনো অঞ্চল প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ফলে বাংলা সাহিত্যে অঞ্চলনির্ভর কথাসাহিত্য রচনার প্রবণতা শুরু হয়। নিঃসন্দেহে এব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছাড়াও এই দশকে আর যারা উপন্যাস চর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৯০৪–১৯৮৮ খ্রিঃ)। তিনি নিজের রচনায় আঞ্চলিকতা নিয়ে তেমন চর্চা করেন নি। তবুও অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে তাঁকে বাংলা আঞ্চলিক জীবনের সবচেয়ে বড় রসস্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী বলে মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জোহানের বিহা' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্প দু'টি পড়ে এগুলির প্রভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' রচনা করেন — ''. . . এসময়ে আকস্মিকভাবে তাঁর হাতে পৌঁছায় 'কালি-কলম' পত্রিকার দুটি সংখ্যা (১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৯২৬) — এই দু সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জোহানের বিহা' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে'। গল্পলেখার একটি নতুন পথের সন্ধান তিনি পেলেন, তার ফলে লিখলেন 'রসকলি' গল্প (১৯২৬)।''[১৯]

বাংলা সাহিত্যের পাঠক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কবি ও গল্পকাররূপে মনে রাখলেও প্রথম জীবনে দু'-একটি উপন্যাস লিখেও বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আলোড়ন ফেলেছিলেন। তাঁর লেখা এইরকম একটি উপন্যাস হল 'পাঁক' (১৯২৬ খ্রিঃ)। এই উপন্যাসটি তাঁর ২২ বছর বয়সে প্রকাশিত হলেও কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি এর রচনা শুরু করেন। এটি তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেন উপন্যাসটির প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন — ''প্রেমেন্দ্রবাবুর প্রথম কাহিনী ''পাঁক'' (১৯২৬) তাঁহাকে ''আধুনিক'' সাহিত্যিকদের উচ্চ শ্রেণীতে তুলিয়া দিয়াছিল। দরিদ্র গৃহস্থ ও বস্তিবাসীর হীন ও কুৎসিত সংসারযাত্রার চিত্রাবলী এই উপন্যাস।''[২০] 'পাঁক' উপন্যাসটি রচনার আগেই শৈলজানন্দের নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটে গিয়েছিল। যদিও 'পাঁক' আঞ্চলিক উপন্যাস হয় নি, তবুও এই উপন্যাসের পটভূমি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রেখেছেন, তার ভিত্তিতেই বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় পাঁক উপন্যাসটি ঢুকে পড়ে।

'পাঁক' উপন্যাসটিতে কাহিনি অংশ খুব বেশি নেই। এখানে দেখা যায় যে, বস্তির মুচিপাড়ায় কালাচাঁদ তার বাপ-মা মরা বিধবা বোন পাঁচিকে নিয়ে বাস করে। কঠোর তাদের জীবন সংগ্রাম। খাদ্য-বস্ত্রের মর্মান্তিক অভাবের বাস্তবতাকে সঙ্গে নিয়ে

তাদের চলতে হয়। কালাচাঁদ রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ের কাজ করে। কিন্তু কাজ করতে করতে বাবুদের বাড়ির কিছু ভেঙে ফেলায় পাওনা মজুরিটুকুও তাকে দেওয়া হয় না। এটা সে নীরবে মেনে না নিয়ে নিস্ফলা প্রতিবাদ করে। অনেকক্ষেত্রেই সে ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে উগ্র ক্রোধ প্রকাশ করেছে। তার সাহসিকতা সেই পাড়ার মেয়ে নেত্যকে মুগ্ধ করে। নেত্য হল 'সুরকী-কলের উপকী-কাটা' মজুরনী। কালাচাঁদ, পাঁচি ও নেত্য ছাড়াও এই পাড়ায় তিনকড়ি মুচি, আহ্লাদীর মা প্রমুখেরা বাস করে। তবে সবাই বস্তির পঙ্কিল পরিবেশে হাপিয়ে উঠে সেখান থেকে মুক্তি খোঁজে। কিন্তু মুক্তি তাদের ঘটে না — ব্যর্থ হয়ে সবাই সেখানেই এসে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, আর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আর্তনাদ করে। এদের মধ্যে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতার মত মানবিক প্রবৃত্তিগুলি অত্যন্ত প্রবল পরিমাণে থাকায়, এদের যন্ত্রণা অনেক বেশি। কালাচাঁদ ও নেত্য এর মধ্যেই রোমান্টিক ভাবালুতায় সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখে; কিন্তু জাতিভেদপ্রথার সংস্কারের জন্য তাদের প্রেম সফল হয় না। পাঁচী বাপ-মা মরা বিধবা হলেও তার মধ্যে সংস্কারবোধ ও অভিমান অত্যন্ত প্রবল। উপন্যাসে তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে করুণরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা আছে। আহ্লাদি এবং স্ট্যানলির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে মিশনারী জীবনের উন্নততর রূপের আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে কেবল পঙ্কিল পরিবেশের চিত্রণ করেন নি, তা থেকে উত্তরণের জন্য সমাজতান্ত্রিক পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। উপন্যাসের শেষ অংশে বিলেত ফেরৎ অর্থনীতিবিদ্ অশান্ত কর্মকারের মাধ্যমে সেই আদর্শের বাণী ও গণ-আন্দোলনের বার্তা উচ্চারিত হয়েছে। সে ছদ্মবেশে বস্তিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে দরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

এভাবে 'পাঁক' উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক পটভূমি হিসেবে আমাদের অতি পরিচিত কোনো শহরাঞ্চল বা গ্রামীণ এলাকাকে না নিয়ে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তির মুচিপাড়াকে গ্রহণ করেছেন। কালাচাঁদ, নেত্য, পাঁচী, আহ্লাদীর মা-র মত চরিত্ররা উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে তেমন সফল না হলেও সকলেই সেই বস্তির মানুষজনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এখানে বস্তির জীবনের নগ্ন রূঢ় বাস্তবতা, ক্লেদ-গ্লানি, দারিদ্র্য, শোষিত-পীড়িত মানুষের অসহায়তার ছবিও আছে। স্থানবিশেষে বস্তি অঞ্চলে প্রচলিত ভাষারীতির প্রয়োগও আছে। এগুলি

সবই আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' কখনোই আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। বাংলা সাহিত্যের কোনো আলোচকও উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় স্থান দেন নি। অনেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি ও গল্পকার সত্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে প্রথম শ্রেণির প্রতিভা হিসেবে স্বীকার করতে চান নি। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পকার সত্তার প্রশংসা করলেও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ ('বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'র পঞ্চম সংস্করণ) পর্যন্ত তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার মূল্যায়নে বলেছেন — ''বড় উপন্যাস-রচনায় প্রেমেন্দ্র তাঁহার শক্তির অনুরূপ সাফল্য এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। লেখক এখনও এ-বিষয়ে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত আছেন মনে হয় — সাধনার দুর্গম পথ অতিক্রমের পর সিদ্ধি এখনও তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই।''[২১] তবে এটা মনে রাখা দরকার প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন 'পাঁক' উপন্যাসটি লেখেন, তখন বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার কেবল সূচনা হচ্ছিল — তখনও পর্যন্ত সেই অর্থে কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস লেখা হয় নি। এই উপন্যাসটিও তাঁর ২০-২২ বছর বয়সের রচনা। স্বাভাবিকভাবে তাঁর মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছলতা তখনও কাটেনি এবং সার্থক উপন্যাস লেখার মত পরিণতিবোধ আসেনি। এমতাবস্থায় এই উপন্যাসে পটভূমি থেকে শুরু করে ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র চিত্রণের মত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রূঢ় বাস্তবতার যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা পরবর্তীকালে রচিত নানা ঔপন্যাসিকের সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তাই আঞ্চলিক উপন্যাস না হয়েও অত্যন্ত বাস্তবধর্মী উপন্যাস হওয়ার কারণে তরুণ বয়সে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় স্থান করে দেওয়া উচিত বলেই মনে হয়।

বিশ শতকের বিশের দশকে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **'বেদে'** (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটির কথাও এই প্রসঙ্গে উঠে আসে। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যকে রবীন্দ্র-ভাব-পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত করতে যে কয়েকজন প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন এই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। 'কল্লোল যুগ' (১৯৫০ খ্রিস্টার) গ্রন্থের প্রণেতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অচিন্ত্যকুমারও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতই সাহিত্যে

বাস্তবতার খোঁজে আমাদের চির পরিচিত লোক সমাজের বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন। তিনি নিজের গল্প-উপন্যাসে শহরতলি, বসতি, অজানা-অখ্যাত গ্রামীণ এলাকাকে পটভূমি করে সেসব স্থানের এতদিনের অজ্ঞাত অথচ ভীষণভাবে বাস্তবনির্ভর জীবনচিত্র অঙ্কনে অগ্রসর হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর রচনায় অনেক সময় উদাসীন বাউন্ডুলে জীবন এবং নরনারীর যৌন জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। তাঁর 'বেদে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর পাঠক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন উঠেছিল। এর পেছনে অবশ্য উপন্যাসটির উচ্ছৃঙ্খল যৌনতা প্রকাশের বিষয়টি কাজ করেছিল। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রকাশিত এই উপন্যাসে অচিন্ত্যকুমার কাঞ্চন নামক এক ভবঘুরে চরিত্রের জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়ে মূলত প্রান্তিক যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে তুলে আনার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। কথাসাহিত্যের সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় অচিন্ত্যকুমারকে ঔপন্যাসিক হিসাবে তেমন কোনো স্বীকৃতি দিতে না চাইলেও তাঁর 'বেদে' উপন্যাসটির প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। যদিও তিনি উপন্যাসটিকে হামসুনের 'Hunger' উপন্যাসের প্যাটার্নে রচিত উপন্যাস বলে মন্তব্য করেছেন, তবুও এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই উপন্যাসটি সেদিনকার তরুণদের কাছে একটি ম্যানিফেস্টোর মত হয়ে উঠেছিল — ''হামসুনের Hunger উপন্যাসের ভবঘুরে নায়কের প্যাটার্ন অনুসরণ ক'রেই অচিন্ত্যকুমার তাঁর প্রথম উপন্যাস বেদে রচনা করেন। বেদে সেদিনের আধুনিক তরুণদের কাছে একটা ম্যানিফেস্টোর মত কাজ করেছিল।''[২২] অন্য অনেকের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখরাও 'সেদিনের আধুনিক তরুণ' ছিলেন। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক থেকে না হলেও 'বেদে' উপন্যাসের পটভূমি এদের আকর্ষণ করে থাকতেই পারে। এখানে ঔপন্যাসিক অন্ত্যজ জীবনের একটি বিশেষ রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বাভাবিকভাবে এতে সমাজ বাস্তবতাও অত্যন্ত তীব্রভাবে এসেছে। এর পটভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি সে সময়কার বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিকতা কাটিয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এজন্য আঞ্চলিক উপন্যাস না হলেও বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনালগ্নে রচিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই 'বেদে' উপন্যাসটি সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার।

এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি অচিন্ত্যকুমারের প্রথম মৌলিক উপন্যাস। এর নায়ক পচা ওরফে কাঁচা ওরফে কাঞ্চন। তার কোনো সঠিক পরিচয় নেই — সে কোথা থেকে এসেছে, তার মা-বাবাই বা কে, সে কোথায় যাবে এসবের কিছুই উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। জোয়ারের জলে সে ভাসতে ভাসতে আসে, মনে হয় সে যেন স্রোতের শ্যাওলা। তার যাযাবর জীবনের কোনো স্থির আদর্শ নেই, তেমন কোনো লক্ষ্যও নেই। চলার পথের পরিবর্তমান ঘটনা ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়। তবে সব সময় এক অস্থির যৌবনের ফেনিল উন্মত্ততা তার মধ্যে কাজ করেছে — বিদেহী প্রেমের চেয়ে দেহের ক্ষুধাই তার কাছে অধিকতর প্রত্যক্ষ বলে মনে হয়েছে। সে ভবঘুরে জীবনের প্রথম কৈশোর থেকে পূর্ণ যৌবনকালের মধ্যে ছ'টি নারীর সংস্পর্শে এসেছে। এই নারীরা হল আহ্লাদি, আসমানী, বাতাসী, মুক্তা, বনজোৎস্না ও মৈত্রেয়ী। প্রাণধর্মের অমোঘ আকর্ষণে এদের সঙ্গে কাঞ্চনের পরিচয় ঘটলেও কোথাও তার এই আকর্ষণ একনিষ্ঠ প্রেমের রূপ নিতে পারে নি। এজন্য এই নারীদের সঙ্গে কাঞ্চনের সম্পর্ক শুধু শারীরিক থেকে গেছে — কখনো নেহাৎ শরীরকে অতিক্রম করে কিশোর জীবনের প্রেমের একনিষ্ঠতার স্নিগ্ধ সৌরভ ও স্বপ্নের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। কাঞ্চন পাপ-পুণ্য সম্পর্কে উদাসীন, নীতির কোনো অনুশাসন সে মানতে শেখেনি। স্রোতের শ্যাওলার মত সে ভেসে বেড়িয়েছে। এতেই যেন তার সুখ। তার জীবনে কোনো মূল, কোনো বন্ধন না থাকায় তার ভালোবাসা পথিকের সঙ্গে পথিকের ক্ষণকালের পরিচয়ের মত নিতান্তই পথের পরিচয়ের মত উন্মূলিত হয়েছে। এই ভালোবাসা শিকড়হীন প্রান্তিক মানুষের ভালোবাসা যা মূল জনসমাজের মানুষেরা ভাবতেও পারে না। এই জীবনও প্রান্তিক জীবন। আঞ্চলিক উপন্যাসে এই রকম মূল জনসমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষ এবং তাদের তথাকথিত প্রান্তিক জীবনকেই তুলে আনা হয়।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কাঞ্চনের এই জীবন পরিক্রমার পাশাপাশি তার পথের সঙ্গী হিসেবে অন্ত্যজ ভবঘুরে সহায়-সম্বলহীন নানান দুঃখী-দরিদ্র-হতভাগ্য মানুষকেও নিয়ে এসেছেন। তারা বিশেষভাবেই কলকাতা শহরের বাসিন্দা। তবে শহর কলকাতার তথাকথিত ভদ্র মানুষজন এদের দিকে ঘুরেও তাকান না। শহরের নিকৃষ্ট

স্তরের মেস বা আস্তাকুঁড়ের মত বস্তিতে বাস-করা এই মানুষগুলি নিদারুণ দারিদ্রের চাপে নিষ্পিষ্ট। বিকাশ, বিনোদ, সৌম্য, বনজোৎস্না প্রমুখ হল এইসব মানুষ। এরাও নিজেদের জীবনকে নিয়ে নানা স্বপ্ন দেখে। কিন্তু নগর জীবনের যান্ত্রিক নিষ্ঠুর চাকার তলায় পিষ্ঠ হয়ে তাদের যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন ঝরে, ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ভবঘুরে কাঞ্চন এদের দুঃখ-দারিদ্রের সেই চরম রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। আঞ্চলিক উপন্যাসে ঠিক এই জিনিসটাই দেখা যায়। এই ধরনের উপন্যাসে মূল জনসমাজ বিচ্ছিন্ন একটি বিশেষ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের অঞ্চলটি নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে, তবে শেষপর্যন্ত তাদের কোনো স্বপ্নই পূরণ হয় না; সভ্যসমাজের লোভ-লালসার কাছে তাদের সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এমনকি এরা নিজেদের অঞ্চলটির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও রক্ষা করতে পারে না।

অবশ্য অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস নয়; এমনকি আঞ্চলিকতার লক্ষণ সম্পন্ন উপন্যাসও নয়। এই উপন্যাসটি যে সময়ে লেখা হয়েছে, তখন বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার ধারা শুরু হয় নি। তখনও পর্যন্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় কোনো বিশিষ্ট অঞ্চলকে পটভূমি করে কয়েকটি ছোটগল্প রচিত হয়েছিল মাত্র। প্রথম সার্থক বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস বা আঞ্চলিকতার লক্ষণধর্মী উপন্যাস লেখা হয়েছিল এর অনেক পরে — ত্রিশের দশকের শেষাংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের হাত ধরে। সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার মতো প্রতিভা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মধ্যে ছিল না বলে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁকে প্রধানত কবি ও গল্পকার বলে মত দিয়ে জানিয়েছেন যে, তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস শিথিল-গ্রন্থিত এবং ভাবাবেগ ও কাব্যিকতার দ্বারা আক্রান্ত। তিনি যে ভাষাশিল্পী, উপন্যাসে এটা বিজ্ঞাপিত করতেই তাঁর উৎসাহ বেশি — ''অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রধানত কবি এবং গল্পকার। শেষের দিকে তিনি বেশ কয়েকটি ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে বাঙালি সমাজের নিচুতলার অনেক জীবন্ত ছবি আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাঁর উপন্যাস অধিকাংশই শিথিল-গ্রন্থিত এবং ভাবাবেগ ও কাব্যিকতার দ্বারা আক্রান্ত। তিনি যে ভাষাশিল্পী এই তথ্যটা তিনি উপন্যাসে এমনভাবে বিজ্ঞাপিত করতে উৎসুক যে,

পাঠকের দৃষ্টি অনেক সময় সেই দিকেই আটকে যায়।''[২৩] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'বেদে' উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে তেমন সম্মানের আসন দিতে চান নি। যাই হোক, 'বেদে' আঞ্চলিক উপন্যাস বা আঞ্চলিকতার লক্ষণধর্মী উপন্যাস না হলেও এই উপন্যাসের কাহিনি পরিকল্পনা, পটভূমি গ্রহণ, চরিত্র চিত্রণ, বাস্তবতার মত বিষয়গুলিতে ঔপন্যাসিক যে বলিষ্ঠতার ছাপ রেখেছেন, তা পরবর্তীকালের অনেক আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রণেতাদের প্রভাবিত করেছিল। এখানেই বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনায় 'বেদে' উপন্যাসটির গুরুত্ব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ)–এর উপন্যাসগুলির মধ্যে **'পদ্মানদীর মাঝি'** উপন্যাসটি যে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস সেকথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেনও স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি 'পদ্মানদীর মাঝি'কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে না করলেও এই উপন্যাসটিকে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস এবং ভালো লেখা বলে মত দিয়েছেন — ''মানিকবাবুর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' ভালো লেখা তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা নয়।''[২৪] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'পদ্মানদীর মাঝি'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন — ''পদ্মানদীর মাঝি' বোধ হয় তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।''[২৫] উপন্যাসটির এই জনপ্রিয়তার পেছনে প্রথম দু'টি কারণ হিসেবে তিনি 'পদ্মানদীর মাঝি'র বিষয়ের অভিনবত্ব অর্থাৎ পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কিছুটা অসাধারণ জীবনযাত্রার আকর্ষণী শক্তি এবং পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতা বর্জিত কথ্যভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের কথা বলেছেন। তবে এই উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী–অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ। এই ধীবর–পল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই।''[২৬] বলা বাহুল্য, যে কোনো আঞ্চলিক উপন্যাস এই লক্ষণগুলিকে নিয়েই গড়ে ওঠে। এগুলি ছাড়াও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আরও

কিছু আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। উপন্যাসটির জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী থেকে জানা যায় যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি রচনার কিছুদিন আগে তিনি তাঁর দাদা হিমাংশুবাবুর বিয়ের পাত্রী খোঁজার জন্যে পরিবারের অনেকের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে পাত্রী খুঁজে বিয়ের কাজ সমাধা করতে তাঁদের মাস খানেকের বেশি সময় কেটে যায়। এই দীর্ঘ সময়কালে তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। হিমাংশুবাবুর বিয়ের পর পরিবারের অন্যরা সবাই ফিরে এলেও দিন পনেরোর মত তিনি পূর্ববঙ্গে থেকে যান। এই সময়টায় মাঝে মাঝেই তিনি পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের জেলে-মাঝিদের বসতিতে গিয়ে হাজির হয়ে তাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন, তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা-খাওয়া-পরা সমস্ত কিছুই করতেন। ফলে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন পদ্মা তীরবর্তী এই সমস্ত অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের দৈনন্দিনকার জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। এরপর কলকাতা ফিরে এসে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই তিনি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এটি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর আগে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ নিজেদের গল্প-উপন্যাসে মূল ধারার বাইরে গিয়ে আঞ্চলিক জীবনকে তুলে ধরে সাহিত্যচর্চা শুরু করে বাংলা কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য আনার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি। তবে এদিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক বেশি সফল ও ভাগ্যবান বলা যায়। তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস থেকেই বাংলা উপন্যাসে যথার্থ আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটে। মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানাদিক থেকে স্বতন্ত্র একটি বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের জীবন পরিক্রমাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছেন।

পূর্ববঙ্গের পদ্মা-তীরবর্তী কেতুপুর নামক একটি গ্রামকে পটভূমি করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এই গ্রামের জেলেপাড়ার বাসিন্দা হল কুবের। সে-ই

উপন্যাসের নায়ক। উপন্যাসটিতে তার জীবন পরিক্রমাকে তুলে ধরা হয়েছে। সে জেলেপাড়ার সমস্ত জেলে-মাঝিদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই কুবের হল দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম। বর্ষাকালে দু'-তিন আনা ভাগে অন্যের নৌকা ও জালের সাহায্যে পদ্মার বুকে ইলিশ মাছ ধরে তার জীবন চলে। বছরের অন্য সময় তাকে সেই অঞ্চলের কারও পুকুর-ডোবা জমা নিয়ে সেখানে মাছ ধরে অথবা অপরের নৌকায় মাঝিগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ঘরে তার শারীরিকভাবে পঙ্গু স্ত্রী মালা আছে, যার সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই। একটি নবজাত শিশু ছাড়াও এই উপন্যাসে কুবের-মালার তিনটি সন্তানের উল্লেখ আছে — মেয়ে গোপি এবং ছেলে লখা ও চন্ডী। গ্রামের জমিদার বংশের মেজোবাবু অনন্ত তালুকদার নানাভাবে জেলেদের উন্নয়নের চেষ্টায় নামলেও জেলেপাড়ার মেয়েদের নামে কলঙ্ক দেওয়ার বাইরে কিছু করে উঠতে পারে না। এই গ্রামেই দেবদূতের মত আবির্ভাব ঘটে হোসেন মিয়ার, যে কারণে-অকারণে জেলেপাড়ার দরিদ্র মানুষগুলির সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। তাকে দরিদ্র জেলে-মাঝিরা ভয় করে এবং তার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে চায়। তবে কেউ-ই হোসেনের অনিবার্য আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারে না। সে বহুদূরে সমুদ্রের মাঝে জেগে ওঠা জঙ্গলাকীর্ণ একটি দ্বীপ নীলামে কিনে নিয়ে তার নাম রেখেছে ময়নাদ্বীপ। জনমানবহীন এই দ্বীপকে মনুষ্য বাসের উপযোগী করে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরিয়ে তোলাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ময়নাদ্বীপে সে আদিম শ্রমনির্ভর এক শোষণহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। এজন্য সংসার জীবনে পরাস্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া অথচ সন্তান উৎপাদনে সক্ষম মানুষদের সেখানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে তার উৎসাহের সীমা নেই। এই উপন্যাসে জেলে-মাঝিদের প্রতিনিধি তথা নায়ক কুবেরকে ময়নাদ্বীপে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করার পরিকল্পনাও সে করে। এদিকে কুবের ঘরে স্ত্রী মালা থাকলেও শ্যালিকা কপিলার প্রতি এক রহস্যময় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কপিলার একটার পর একটা আচরণ তাদের এই সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা আনে। শেষপর্যন্ত কুবেরের জেলে-মাঝি সত্তা ছেড়ে কপিলার হাত ধরে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনি অংশটি অনেকটাই আঞ্চলিকতার বাতাবরণে পরিবেশিত হয়েছে। তবে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় কী না, তা

নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। একদল একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে চান, আবার অপর একদল একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে মানতে না চেয়ে ব্যক্তিজীবনের রোমান্টিক আখ্যান বলে অভিহিত করতে চান। তবে উপন্যাসটির আলোচনাকালে সমস্ত সমালোচক একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে না চাইলেও এখানে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এটাও ঠিক যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি পাঠকালে এর মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে উপন্যাসটির সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বের করা দরকার।

এই উপন্যাসটির মূল পটভূমি হল পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়া। উপন্যাসের বেশির ভাগ ঘটনা ঘটেছে হয় কেতুপুর গ্রামে অথবা বহমান পদ্মার বুকের উপর। এছাড়াও সোনাখালি, দেবীগঞ্জ, চরডাঙা, আকুরটাকুর, আমিনবাড়ি এবং ময়নাদ্বীপে কিছু ঘটনা ঘটেছে। এই অঞ্চলগুলির সঠিক অবস্থানের উল্লেখ উপন্যাসে না থাকলেও এটা ঠিক যে, এগুলি পূর্ববঙ্গে অবস্থিত নানা স্থান। এগুলির মধ্যে আকুরটাকুর এবং ময়নাদ্বীপ বাদে সবগুলিই পদ্মাতীরে অবস্থিত। উপন্যাসে এই স্থানগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, এগুলি মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হলেও সেখান থেকে পৃথক একটি অঞ্চল বলেই মনে হয়। এই অঞ্চলটিতে নানা ধরনের মানুষ বসবাস করলেও উপন্যাসে মূলত জীবন ও জীবিকার বিষয়ে পদ্মার উপর নির্ভরশীল জেলে-মাঝিদের জীবন পরিক্রমার দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসটি শুরুও হয়েছে বর্ষার ভরা পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার বিবরণের মধ্য দিয়ে —

''বর্ষার মাঝামাঝি।

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্তরাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য

সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়। একসময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে গ্রামে রেলস্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনও নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।''[২৭]

পদ্মার বুকে মাছ ধরার প্রসঙ্গেই নায়ক কুবেরের আবির্ভাব ঘটেছে। সে উপন্যাসে বর্ণিত অঞ্চলটির অর্থাৎ জেলেপাড়ার পদ্মার উপর নির্ভরশীল মানুষগুলির প্রতিনিধি। এখানে তার জীবন পরিক্রমাকেই তুলে ধরা হয়েছে। কুবেরের জীবন পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির সমগ্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও প্রতিফলিত হয়েছে।

কুবের জাতিতে জেলে হলেও তার নিজের জাল বা নৌকা কিছুই নেই। বর্ষার পদ্মায় অন্যের জাল ও নৌকায় দু'-তিন আনা ভাগে সে মাছ ধরে এবং বছরের অন্য সময় কারও পুকুর বা খাল জমা-বিলি নিয়ে অথবা অপরের নৌকায় মাঝিগিরি করে তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তার উপার্জনের বেশির ভাগটাই হয় বর্ষায় ইলিশের মরশুমে। এজন্য জ্বর গায়ে স্ত্রীর নিষেধ অমান্য করেও সারারাত জলে ভিজে ভিজে তাকে মাছ ধরতে হয়। এত কষ্ট করে মাছ ধরার পরেও তাকে জাল ও নৌকার মালিকের কাছে তো বটেই, আড়তদার, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে অনেকের কাছেই ঠকতে হয়। ফলে তাকে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। এটা শুধু কুবেরের জীবন পরিক্রমার ছবি নয়, এ যেন জেলে পাড়ার পদ্মার উপর জীবন-জীবিকার ব্যাপারে নির্ভরশীল সমস্ত মানুষের জীবন পরিক্রমার ছবি। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে এই জেলেদের পাড়াটিও মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন — ''পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই

এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পারে না। একটি কুঁড়ের আনাচেকানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।''[২৮]

দারিদ্র্য জেলেপাড়ার মানুষের অনিবার্য নিয়তি। এদের বাড়ির পরিবেশ, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ প্রকাশ পায়। সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া নারীদের জন্যেও এরা ঠিকমত থাকার ব্যবস্থা করতে পারে না। কুবেরের বাড়ির সর্বত্র এই দারিদ্র্যের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় — ''কুবের ওদিকের দাওয়াবিহীন ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার আকাশে কড়া রোদ উঠিলেও জানালা দরজার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় এ ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার। কোণার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈলচিক্কণ কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসি এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়িকলসিতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়িকলসি কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নীচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই।''[২৯] উপন্যাসের অনেক জায়গায় কুবেরের এই অপরিসীম দারিদ্র্যের বিবরণ আছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে — ''ঘটিটা তুলিয়া লইয়া ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া কুবের উঠানে কুলকুচা করিল। গণেশের মতো ঘটি উঁচু করিয়া আলগোছে জল খাইয়া কলিকায় তামাক সাজিতে বসিল। পিসি দাওয়ার একপাশে ইলিশ মাছের তেলে ইলিশ মাছ ভাজিতেছে। অন্য পাশে মালার আঁতুড়। নিচু দাওয়ায় মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু ওইখানেই ভিজা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মালা দিবারাত্রি যাপন করিবে।''[৩০] শুধু কুবের একাই এমন দরিদ্র নয়, জেলেপাড়ার প্রায় সবাই এরূপ দারিদ্র্যের শিকার। তাই দেখা যায় যে, জেলেপাড়ার সিধু সস্তায় একটা পাঁঠার মাথা কিনে আনলে রান্নার অন্যান্য উপকরণের জন্য তাকে কুবেরের দ্বারস্থ হতে হয়। সে

কুবেরকে পাঁঠার মাথাটি দেখিয়ে বলেছে — ''শ্যাষ বেলায় সস্তা কিনলাম কুবির। পুরা পাঁচ আনা চাইয়া শ্যাষ ম্যাশ চোদ্দ পয়হায় দিল। মাইয়াটারে ব্যানুন রাঁইধবার কইলাম, তা কয়, ত্যাল মরিচ নাই, চালও নাকি বাড়ছে।''[৩১]

অবশ্য এত দারিদ্র্যের মধ্যেও জেলেপাড়ায় পরনিন্দা-পরচর্চার অভাব ঘটে না। এই কাজে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী হল নকুল। কালো গায়ের রঙযুক্ত কুবেরের ফর্সা পুত্র সন্তান জন্মালে নবজাতকের গায়ের রঙের কারণে কুবেরের স্ত্রী মালাকে নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করতে সে দ্বিধা করে নি — ''তুই তো দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা? ঘরে তো থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।''[৩২] পীতমের বাড়িতে গিয়ে পীতমের মেয়ে যুগী ও জমিদারের মহুরি শীতলবাবুকে জড়িয়ে সে পীতমকে বাজে ঈঙ্গিত করেছে। তাই ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''কে জানে, কী আশ্চর্য ইহাদের উপভোগ্য রসিকতা। যুগী পীতম মাঝির মেয়ে, সম্প্রতি জেলেপাড়ারই একধারে একখানা ঘর বাঁধিয়া মেজোকর্তার মুহুরি শীতল ঘোষের সঙ্গে বাস করিতেছে। এত লোকের মাঝে পীতমের সামনেই তাহার মেয়ের সম্বন্ধে নকুল অনায়াসে রসিকতা করে, সকলে হাসাহাসি করিয়া তাহা উপভোগও করে বিনা বাধায় ও বিনা দ্বিধায়।''[৩৩] তাই মনে হয় যে, জেলেপাড়ায় এ ঘটনা যেন স্বাভাবিক — কাল পরম্পরায় তা চলতেই থাকে।

এই উপন্যাসের চরিত্ররা বেশির ভাগ উপন্যাসে বর্ণিত জেলেপাড়াটির প্রতিনিধিত্ব করেছে। জেলেপাড়ার পুরুষদের দিনের অধিকাংশ সময় পদ্মার উপর কাটে। এদের মধ্যে কেউ পদ্মার বুকে মাছ ধরে, কেউ পদ্মার উপর নৌকা চালিয়ে মাঝিগিরি করে। যারা মাছ ধরে তারা বছরের পুরোটা পদ্মার উপর নির্ভরশীল না থাকলেও সারাটা বছর এদের জল, জাল, ডিঙি প্রভৃতি নিয়েই কাটে। এক্ষেত্রে এরা পদ্মা সংলগ্ন কোন খাল, ডোবা বা কারও পুকুরের উপর নির্ভর করে — ''পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়।''[৩৪]

জেলেপাড়ার সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হলেও মেয়েরাও সংসার চালানোর কাজে আত্মনিয়োগ করে। তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''ছেলের বয়স আট-দশ বছর পার হইয়া গেলে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা জেলেপাড়ার মেয়েদের রীতি নয়। চিন্তা করিবার অপরাপর বিষয়ের তাদের অভাব নাই। কচি ছেলে ছাড়া মায়ের কোল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিষ্ঠুর ছাড়া স্বামী বড়ো একটা হয় না। দুটি কুঁড়েঘরের কুটিরে যে সংকীর্ণ সংসার, তারও কাজ থাকে অফুরন্ত। পুরুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকারি কেনাবেচা করে, চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ যোগান দেওয়া তাদের কাজ নয়। ও কাজটা জেলেপাড়ার মেয়েরা সন্তান প্রসবের আগে-পিছে দু-একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া করিয়া যায়। অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কোন সন্তানের ছোট ছোট বিপদ-আপদের কথা ভাবিবারও যেমন তাহাদের সময় নাই, ওদের স্নেহ করিবার মত মানসিক কোমলতাও নাই। নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা। ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়াকান্না কাঁদে।''[৩৫] তবে পুরুষেরা মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। একটুতেই জেলে রমণীদের কপালে তাচ্ছিল্য, উদাসীনতা, অপমান, ধমক, মারধোরের মত বিষয়গুলি জোটে। উপন্যাসের নানা স্থানে মালা-কুবেরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর বিবরণ আছে। আপন মেয়ে গোপির বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়েও স্ত্রী মালার সঙ্গে আলোচনায় কুবেরের অনীহা কাজ করে — ''তা শুইনা তর কাম কী? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস — রাও করস কে রে?''[৩৬] জেলে রমণীরা নিজেদের অঞ্চলে স্বচ্ছন্দ থাকলেও বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এজন্য হোসেন মিয়া কলকাতা গেছে শুনে মালার এক পয়সার সূচ আনানোর কথা মনে পড়ে — ''মালা আপশোশ করিয়া বলিল, কবে গেল? আগে নি একবার কইলা! এক পয়হার সুই আইনবার কইতাম—কইলকাতায় পয়হায় দশখান পাওন যায়।''[৩৭] বাইরের জগৎ সম্পর্কে এই অজ্ঞতা শুধু মেয়েদেরই নয়, জেলেপাড়ার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে গোপিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটির উল্লেখ করতে হয়

— ''একটা চওড়া কাঠের তক্তায় শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গোপিকে নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইল। কাঁথা বালিশ হাতে করিয়া কপিলা গেল সঙ্গে। ইতিমধ্যে জেলেপাড়ায় খবর রটিয়া গিয়াছিল। গ্রামের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া প্রতিমা বিসর্জনের চেয়ে কম গুরুতর ব্যাপার নয় জেলেপাড়াবাসীদের কাছে — এই ভোরে নদীতীরে একটি ছোটোখাটো ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কুবের একেবারে হয়রান।''[৩৮] অবশ্য জেলেপাড়ার মেয়েরা সবাই একরকম নয়, এর ব্যতিক্রমও আছে। এই উপন্যাসে এইরকম ব্যতিক্রমী মহিলা হল — যুগী ও কপিলা। এরমধ্যে পীতমের মেয়ে যুগী জেলেপাড়ার সমাজকে তোয়াক্কা না করে স্বেচ্ছায় জমিদারের মহুরি শীতলবাবুর রক্ষিতা হয়েছে, আর কপিলা পুরুষতন্ত্রের বেঁধে দেওয়া বন্ধনে আটকে না থেকে নিজেই নিজেকে চালনা করেছে।

কুবেরের ছেলেদের বিবরণের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে জেলেপাড়ার শিশু-কিশোরদের জীবন পরিক্রমার ছবিও প্রকাশ পেয়েছে — ''লখা ও চন্ডী হয় ডাংগুলি খেলিতে গিয়াছে, আর না হয় কোথাও বঁড়শি ফেলিয়া ধরিতেছে পুঁটিমাছ। যেখানেই ওরা থাক আর যাই করুক, জলে ভিজিয়া জ্বরে পড়িবে না, জলে ডুবিয়া মরিবেও না। সে ভয় মালার নাই। সে কেবল ভাবিয়া মরে, মারামারি করিয়া ছেলে দুটা কোনোদিন না খুন হইয়া আসে।''[৩৯] এভাবেই জেলেপাড়ার মানুষদের জীবন অতিবাহিত হয়। মেজোকর্তা অনন্তবাবু এবং হোসেন মিয়া — এরা দু'জন জেলেপাড়ার বাইরে থেকে এসে এই উপন্যাসে জেলেদের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে। এরমধ্যে সর্বদা জেলেদের সঙ্গে থেকে, তাদের বৃত্তি গ্রহণ করে হোসেন জেলেদের একজন হয়ে উঠলেও মেজোকর্তা অনন্তবাবুর সঙ্গে তাদের দূরত্ব থেকেই গেছে — ''জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজোবাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। শিক্ষা মাঝিরা পায় নাই, মাঝিদের বউ-ঝিরা শুধু পাইয়াছিল দুর্নাম, গ্রামে গ্রামে খবর রটিয়াছিল যে কেতুপুরের মেজোকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী চাখিয়া বেড়াইতেছেন — জেলেপাড়া মেজোবাবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ! আজ আর জেলেপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় মেজোবাবু পান না। মাঝিদের কারও সঙ্গে দেখা

হইলে খবর জিজ্ঞাসা করেন। সকালে দুপুরে জেলে পাড়ার ভাঙা কুটিরে গিয়া সময় যাপন করিবার সময়েও যে দুস্তর ব্যবধান মাঝিদের সঙ্গে মেজোবাবুর থাকিয়া গিয়াছিল, কোনও মন্ত্রে তাহা ঘুচিবার নয়। মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালো করিবার খেয়ালে বড়লোক কবে গরিবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছে? মেজোবাবু তো হোসেন মিয়া নয়। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নিচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভর, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা — এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরিব ছোটলোক, মেজোবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন? ও কাজ হোসেন মিয়ার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজোবাবুর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।''[৪০]

এই উপন্যাসে গৃহীত জেলেপাড়াটির মানুষজনের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ জনিত লোকাচার-লোকবিশ্বাসের বর্ণনাসহ সেখানে ঘটে যাওয়া নানা উৎসব-অনুষ্ঠান এবং অঞ্চলটির সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কিছু লোককথার বিবরণও আছে। কেতুপুরের জেলেপাড়ায় নবজাতককে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। কোনো বাড়িতে নবজাতকের আবির্ভাব ঘটলে আনন্দ-উৎসবের পরিবর্তে সেই বাড়ির জেলেরা ভাবে তাদের পরিবারে খাওয়ার জন্য একজন লোক বাড়ল — ''জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লিতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।''[৪১] জেলেপাড়ায় মানুষের মৃত্যু হয় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অথবা পদ্মার বুকে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে। মানুষের মৃত্যু ঘটলেও তারা এ সম্পর্কে খুব বেশি হা-হুতাশ করে না, অনিবার্য নিয়তি বলেই মেনে নেয়। এই উপন্যাসে মৃত্যু সংক্রান্ত লোকাচারের বিবরণ তেমনভাবে নেই। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মধ্যে জেলেদের কাছে বিবাহ একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এনিয়ে যোগ্য পাত্রদের মধ্যে রীতিমত লড়াই-বিবাদ বেঁধে যায়। মেয়ের বাবারাও পাত্রের সচ্ছলতা দেখার পাশাপাশি রীতিমত মোটা অঙ্কের পণ আদায়ের হিসেব করে। কুবেরের মেয়ে

গোপির বিয়ের ক্ষেত্রেও এই জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। মেয়ে গোপির জন্য জামাই হিসেবে গণেশের শালা যুগলকে কুবেরের মনে ধরে। গণেশ তার সমস্ত কাজের সঙ্গী হলেও কুবের যুগলের থেকে মোটা অঙ্কের পণ নেওয়ার ফন্দি করে — ''গোপির বয়স এগারো, কুবের মেয়ের বয়স এক বছর ভাঁড়ায় আর এক বছর হাতে রাখিয়া বলে, নয়। ন বছর বয়সে যে মেয়ের এগারো বছরের বাড়, বিয়ের বাজারে তার দাম আছে। গণেশের শালা যুগল সম্প্রতি পাশের গ্রাম হইতে বোনের তত্ত্ব লইবার ছলে আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছে। সোজাসুজি কথা সে এখনও পাড়ে নাই, আলাপ আলোচনার মাঝখানে বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করিয়া কুবের কী রকম দর হাঁকিবে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্পষ্ট করিয়া কুবেরও এখন পর্যন্ত কিছু বলে নাই। কথা উঠিলে বহুক্ষণ ধরিয়া মেয়ের প্রশংসা কীর্তন করিয়া শুধু একটু আভাস দিয়াছে দুকুড়ি তিনকুড়ি টাকার। বুদ্ধি থাকে যুগল আন্দাজ করিয়া নিক। গণেশের আত্মীয় বলিয়া টাকার বিষয়ে কুবের তাহাকে খাতির করিবে না। যুগল সম্ভবত তাহা টের পাইয়াছে, তাই ইলিশ মাছের মরশুমটা শেষ হইবার প্রতীক্ষায় আছে। হাতে তখন কী রকম টাকা জমে দেখিয়া কথা পাড়িবে। কুবের বোঝে না কী! সকলের গোপন মতলব সে চোখের পলকে আঁচ করিয়া ফেলে।''[৪২] শেষপর্যন্ত, ঝড়ে গোপির পা ভাঙায় যুগল গোপিকে বিয়ে না করলে ময়নাদ্বীপ ফেরৎ সর্বহারা রাসু তাকে বিয়ে করার জন্য তৎপর হয়। কুবের তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা দিলেও বেশি পণ নিয়ে হোসেন মিয়ার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে গোপির বিয়ে দেয়। এনিয়ে রাসুর সঙ্গে কুবেরের শত্রুতার জন্ম হয়। সম্ভবত এর ফলশ্রুতিতেই উপন্যাসের শেষে রাসুর মামা পীতমের চুরি যাওয়া টাকার ঘটি কুবেরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এবং পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য কুবেরকে গ্রাম ত্যাগ করে কপিলার হাত ধরে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হয়।

এই উপন্যাসে জেলেপাড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি উৎসবের বর্ণনা আছে — রথযাত্রা, দুর্গাপূজা এবং দোল। রথের মেলায় জেলেপাড়ায় ভালোই ধুম পড়ে। কেতুপুরের অপর পারে পদ্মা তীরবর্তী সোনাখালিতে রথের দিন থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত সাতদিন ধরে বেশ বড় এই মেলা চলে। জেলেপাড়ার প্রায় সবাই মেলা দেখতে আসে। জেলেরা এই মেলা থেকে তাদের শখের জিনিসের পাশাপাশি অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিস কেনে। আবার অনেকেই মেলায় এসে

জুয়া খেলে নিজের অতিকষ্টে জমানো টাকা-পয়সা সর্বস্ব খুইয়ে ফেলে। রথের মেলার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''রথের দিন এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উল্টারথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পদ্মা আগে তফাতে ছিল, এখন এত কাছে সরিয়া আসিয়াছে যে মেলার একটা প্রান্ত প্রায় নদী তীরেই আসিয়া ঠেকে। স্থলপথ ও জলপথে দল বাঁধিয়া আসিয়া মানুষ মেলায় ভিড় বাড়ায়। ভিড় বেশি হয় প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের কদিন মেলা একটু ঝিমাইয়া যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্তই মেলায় আমদানি হয়, এমনকি শহরের নারী-পণ্যের আবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। কাপড়ের দোকান, মনোহারি দোকান, মাটির খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, দোকান যে কত বসে তার সংখ্যা নাই। . . . কয়েকটি স্থানে গবর্ণমেন্ট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে। মেলার এটা একটি প্রধান অঙ্গ।''[৪৩] রথের মেলার সন্ধ্যেগুলো জেলেপাড়ার বাড়িগুলিতেও এক অনাবিল আনন্দ বয়ে আনে — ''যাহারা রথের মেলায় গিয়াছিল একে একে তাহারা ফিরিয়া আসিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দ। বউরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে, নূতন কাচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে। আহ্লাদ বহন করিয়া এই তুচ্ছ উপকরণও যে কুটিরে আসে না, সেখানে যে বিষাদ জমাট বাঁধিয়া থাকে তা নয়, কোন না কোন রূপে সোনাখালির মেলার আনন্দের ঢেউ সে কুটিরেও পৌঁছিয়াছে। একটি কাঁঠাল, দুটি আনারস, আধসের বাতাসা — এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরা পুঁটির তেলে ভাজা পুঁটিমাছ দিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে — খুশি হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের?''[৪৪]

রথের মেলার পাশাপাশি দুর্গাপূজাতেও জেলেপাড়াতে আনন্দ নেমে আসে। ঢাকঢোল বাজিয়ে খুব ধুমধাম করে কেতুপুরে দুর্গাপূজা হয়। এ সময় নারী-পুরুষ সকলে ঠাকুর দেখে, প্রসাদ নেয়, আনন্দ করে; কেউ কেউ আকণ্ঠ মদ গিলে দিন কাটায় — ''কেতুপুরে চারদিন পূজার ঢাকঢোল বাজিল — উৎসব হইল। জেলেপাড়ার

ছেলেবুড়া দুবেলা ঠাকুর দেখিল, কেহ কেহ তাড়ি গিলিয়া খুব মাতলামি করিল, শীতল একদিন একটা দেশি মদের বোতল সাবাড় করিয়া রাসুকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া পিটাইয়া দিল।''[৪৫] রঙের উৎসব দোলও এই গরীব জেলে-মাঝিদের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে। টাকা-পয়সার অভাব থাকায় কাদা-রঙ মিশিয়ে এরা হোলি খেলে, শোভাযাত্রা বের করে — ''রং ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলের উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এ পাড়ায় বেশি। চাষাভূষা জেলেমাঝির পাড়া এটা, এখানে রঙের বড়ো অনটন। অনেক বেলায় কাদামাখা মূর্তিসমূহের একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। গাধার মতো ক্ষুদ্রকায় একটা ঘোড়ার উপর বিচিত্র সাজে দোলের রাজা অতিকষ্টে বসিয়া আছে, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোর মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্নভিন্ন জামা, চারিদিকে লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া। . . . তাথৈ তাথৈ নাচ, ছুটাছুটি হইচই, ডোবা পুকুরের পাঁক তুলিয়া যাকে খুশি ছুঁড়িয়া মারা — আনন্দ বটে দোলের!''[৪৬] এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও এই উপন্যাসের একস্থানে আঞ্চলিক উৎসবের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বাজারে টিনের চালার নীচে যেখানে তরিতরকারির দোকান বসে সেইখানে যাত্রার আসর বসিয়াছে, লোক জমিয়াছে ঢের। কুবের একপাশে বসিয়া পড়িল। পানবিড়ির দোকান ছাড়া এত রাত্রে পসরা সাজাইয়া কেহ নাই, রূপ-কন্যারাও যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। পেশাদার দল নয়, আলু-বেচা তেল-বেচা মানুষের সখের দল, অনেকে হয়তো পড়িতেও জানে না, একে ওকে দিয়া পড়াইয়া শুনিয়া শুনিয়া পার্ট মুখস্থ করিয়াছে, শক্ত শক্ত অনেক শব্দই উচ্চারণ হয় না, তাই হাস্যকর রকমে ভাঙিয়া জিহ্বার উপযোগী করিয়া নিয়াছে — বক্তৃতাগুলি কথ্য ও শুদ্ধ ভাষার এক অপরূপ খিঁচুড়ি। পোশাকপরিচ্ছদের যেমন অভাব, অভিনেতা নির্বাচনে কাণ্ডজ্ঞানেরও তেমনই অভাব। বালক লখিন্দরের পাশে তার চেয়ে একহাত বেশি লম্বা বেহুলা নির্বিকার চিত্তে পার্ট বলে — গলাটি মিহি বলিয়া আর চমৎকার ঢঙে অভিনয় করিতে পারে বলিয়া ওকে বেহুলা করা হইয়াছে, আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।''[৪৭]

এই সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের পাশাপশি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কিছু লোককথার বিবরণও আছে। সোনাখালির যে স্থানটিতে রথের মেলা বসে তাকে

অন্নাবাবার মাঠ বলে। এই মাঠ সম্পর্কে সে অঞ্চলে একটা লোককথা প্রচলিত আছে — ''স্থানটির অন্নবাবার মাঠ নাম হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া এই মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া দেন। নিজের বলিতে সন্ন্যাসীর এক কানাকড়ি সম্বলও ছিল না। শোনা যায়, এমনই আশ্চর্য ছিল মানুষের উপর তাহার প্রভাব যে সামনে দাঁড়াইয়া চোখে চোখে চাহিয়া তিনি হুকুম দিতেন আর বড়ো বড়ো জমিদার মহাজনেরা মণে মণে চাল ডাল পাঠাইয়া দিত এই মাঠে। শত শত ভদ্র গৃহস্থ নিজেরাই কোমর বাঁধিয়া তাহা রান্না করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের বিতরণ করিত অন্ন। ব্যাপারটা যে ঠিক এইরকমই ঘটিয়াছিল তার কোন প্রমাণ এখন আর নাই। যেসব বড়ো বড়ো উনানে সেই বিরাট ক্ষুধা-যজ্ঞের আগুন জ্বলিত আজ তাহার একটু কালির দাগ পর্যন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।''[৪৮]
এই অঞ্চলের পদ্মার জেলে-মাঝিরা নৌকা যাত্রার পূর্বে কিছু লোকবিশ্বাস মেনে চলে। এরা মুসলমানদের পাঁচপীরের মধ্যে বদরের নাম করে যাত্রা শুরু করে। এদের বিশ্বাস নৌ যাত্রাকালে বিপদে-আপদে বদরই তাঁদের রক্ষা করবে — ''গুমটি দিছে, বাদাম চলব না, সকাল সকাল রওনা দিবা। বদর কইও মাঝি, সাঁঝের আগে ফির‍্যা আইও, আসমান ভাল দেখি না। শুইনা আলাম আজকালির মদ্যি জবর ঝর হইবার পারে।''[৪৯] প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সময় তার প্রকোপ কমানোর জন্য বাড়িতে এই অঞ্চলের জেলে-মাঝিদের মেয়ে-বৌয়েরাও কিছু লোকবিশ্বাস মেনে চলে — ''একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। কালবৈশাখী কোথায় লাগে। সারাদিন টিপি টিপি বৃষ্টি হইল, সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া আসিল নিবিড় কালো মেঘ, মাঝরাত্রে শুরু হইল ঝড়। কী সে বেগ বাতাসের আর কী গর্জন! বড়ো বড়ো গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মতো বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে। . . . ঝড় শুরু হইলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে — ঝড়ের দেবতা বসিবেন, শান্ত হইবেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা কপাল কুটিয়া মধুসূদনকে ডাকিয়াছে। এ কি রোষ দেবতার? কেন এ প্রলয়?''[৫০]

উপন্যাসটিতে পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চলকে গ্রহণ করার পাশাপাশি চরিত্র হিসেবে সেই অঞ্চলের মানুষজন এবং তাদের জীবন-জীবিকা, আচার-ব্যবহার, উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোককথাকে তুলে আনার পাশাপশি ভাষা প্রয়োগের দিক থেকেও আঞ্চলিক উপভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসটি প্রথম পুরুষ কথনরীতি বা সর্বজ্ঞ রীতিতে লেখা। তাই উপন্যাসের বর্ণনার ভাষার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বাংলা সাধু ভাষারীতিকে গ্রহণ করলেও সংলাপের ভাষায় তিনি পূর্ববঙ্গের বাংলা আঞ্চলিক কথ্যভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। এই ভাষারীতির কিছু দৃষ্টান্ত হল—

কুবেরের সংলাপ :

১। ''আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গে আইজ।'' (পৃ ১০)

২। ''জিগানের কাম কী? তা কই নাই খুড়া। মিছা কওয়নের মানুষ তুমি না। মাছ নি কাল বেশি বেশি পড়ছিল, তাই ভাবলাম তোমারে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।'' (পৃ ১২)

৩। ''চুপ যা গণেশ। পোলা দিয়া করুম কী? নিজেদের খাওয়ন জোটে না, পোলা!'' (পৃঃ ১৫)

৪। ''বয় গণেশা, বয়। অ পিসি, আমারে আর গণশারে দুগা মুড়ি দিবা গো? আ লো গোপি, আমারে নি এক ঘটি জল দিবার পারস?'' (পৃ ১৯)

মালার সংলাপ :

১। ''আ গো যাইও না, শুইনা যাও। চালা দিয়া নি ঘরে জল পড়ছে? ছনগুলা লইয়া যাও, বিছানার তলে ছন দেওন না দেওন সমান।'' (পৃ ২১)

২। ''বুড়া কী বজ্জাত! মাথার ভাগ দিব না আইঠা কলা দিব, দেইখো।'' (পৃ ৩০)

৩। ''ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কবে কই নিছিলা আমারে, চিড়ডা কাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউক্কা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান?'' (পৃ ১০৬)

গোপির সংলাপ :

১। ''বাই উ ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইছে বাবা। নকুইলার মাইয়া পাঁচি কী কইয়া গেল শুনবা? সায়েবগো এমন হয় না। না পিসি?'' (পৃ ১৭)

২। ''ক্যান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?'' (পৃ ১৭)

৩। ''রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগোর বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদল পাঁক দিমুনে মুখের মধ্যে।'' (পৃ ১৭)

কপিলার সংলাপ :

১। ''পোলাপান, সাধ নি মেটে দেইখা? তোমার লখা বুড়া তো হয় নাই মাঝি, একনজর দেইখা ফাল দিয়া বাড়িত্ ফিরবো? যারে লখা যুগী মাসির লগে—দেইখো বইন পোলারে, পোলা বড় বজ্জাত।'' (পৃ ৫৯-৬০)

২। ''চুপ কর মাঝি, বেবাকে শুনব। যাইবা যাও, কী আর কমু তোমারে? এউক্কা কথা কইয়া দিই মাঝি, মাথা খাও, দিদিরে কথাডা কইও। কইও, কপিলা পরের ঘরের বউ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই। অতিথ্ কই থাকবো, অতিথ্ কী খাইবো, কপিলারে কেডা তা জিগায়? দুষি কইরো মাঝি, শাইপো—কিন্তু এই কথাটা কইও দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইও।'' (পৃ ৯৮)

৩। ''ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামির ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি—পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দেশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে। ছাড়, মানুষ আহে।'' (পৃ ১১১)

হোসেন মিয়ার সংলাপ :

১। ''যাবা না ক্যান? ডর কিসির? আসমান দেইখ্যা রওনা দিবা, আসমান দেইখা ফিরবা। বাদলা দিনের ঝড় জানান দিয়া আহে।'' (পৃ ২৪)

২। ''বিয়ানে একবার বাড়িত্ যাইও রাসু বাই। পয়সাকড়ি পাইবা মালুম হয়, নিকাশ নিয়া খারিজ দিমু। ময়নাদ্বীপির জমিন না নিলি জঙ্গল কাটনের মজুরি দিই—খাওন পরন বাদ। কাইল যাইও। . . . মন করতিছ, হোসেন মিয়া ঠক। তোমারে ঠকাইয়া হেসেন মিয়ার ফয়দা কিসির! কোন্ হালারে আমি জবরদস্তি ময়নাদ্বীপি নিছি? আপনা খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানবা রাসু বাই। ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কতি পারলা না? একসাথ আইতাম?'' (পৃ ৩৪)

৩। ''ময়নাদ্বীপি মোল্লা পামু কই? রাজবাড়ির আজীজ ছাহাব কন, ময়নাদ্বীপি শও জনা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকতি পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু না নিলি মানুষ পামু কই? হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু না। ক্যামনে দিমু কও? মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুরঘর—না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলব না।'' (পৃ ৮৬)

গণেশের সংলাপ :

১। ''চল্ কুবির, না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে।'' (পৃ ১৯)

২। ''হীরু জ্যাঠা ছন দিব? জ্যাঠারে তুই চিনস্ না কুবির, কাইলের কাণ্ড জানস? বিহানে ঘরে ফির‍্যা শুমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত। খাও আইঠা কলা, ভর রাইত জাইগা ঘুমের লাইগা দুই চক্ষু আঁধার দ্যাহে—চাল বাড়ন্ত! বউরে কইলাম হীরুজ্যাঠার ঠাই দুগা চাল কর্জ আন্‌গা, দুপুর গাঁয়ে গিয়া কিনা আনুম। কলি না পিত্যয় যাবি কুবির, বউরে জ্যাঠা ফিরাইয়া দিল। কয় কী বিষ্যুদবার কর্জ দেওন মানা।'' (পৃ ২০-২১)

ধনঞ্জয়ের সংলাপ :

১।''কাইল চাইরে নামবো। হালার মাছ ধইরা জুত নাই।'' (পৃ ৮)

২।''জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত্ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।'' (পৃ ৯)

৩।''হ, চাইরশ না হাজার। দুইশ সাতপঞ্চাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশর দাম দিছে।'' (পৃ ১২)

নকুলের সংলাপ :

১। ''শ্যাষ রাইতে তর বউ খালাস হইছে কুবির।'' (পৃ ১৫)

২। ''আমাগোর পাঁচি গেছিল, আইসা কয় কি কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্তুর আইছে বাবা, ওই একরত্তি একখান পোলা, তাঁর চাঁদপানা কথা কী কমু। রং হইছে গোরা।'' (পৃ ১৫)

রাসুর সংলাপ :

১। ''কই কুবিরদা, কই। তোমাগো দেইখা মুখে রাও সরে না, কতকাল পর ফিরা আলাম!'' (পৃঃ ২৬)

২। ''আমি একা ফির‍্যা আইলাম গো মামা, সবকটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি একা ফির‍্যা আইলাম।'' (পৃ ২৮)

সিধুর সংলাপ :

১। ''তা আইলাম কুবির, তা আইলাম। রঙ্গ কইরা কইলাম, বোঝস না? কোঁচটা কিনা আনলি সন্দ করি। নিল কত?'' (পৃ ২৯)

২। ''ত্যাল মরিচ দিয়া ব্যানুন যা হইব—অমর্ত। আমিনুদ্দির ঠাই প্যাজ রসুন মাইগা আইনা—'' (পৃ ৩০)

এছাড়াও এই উপন্যাসে পদ্মার মাঝিদের একটি নিজস্ব ভাষার উল্লেখ আছে। পদ্মার উপর ময়নাদ্বীপ থেকে ফেরার সময় রাসু এবং কুবের এই সাংকেতিক ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করেছে — ''বহুদূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল, মানবকণ্ঠের একটানা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। দুই কানের পিছনে হাত দিয়া হাঁক শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুবের সাড়া দিয়া উঠিল। এ এক ধরনের ভাষা, পূর্ববঙ্গের মাঝিশ্রেণির লোক ছাড়া এ ভাষা কেহ জানে না। এ ভাষায় কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরে, বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মতো মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে, পদ্মানদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে। শব্দের দুর্লক্ষ্য উৎসের দিকে চাহিয়া সে বুক ভরিয়া বাতাস গ্রহণ করে। বাঁ হাত কানের পিছনে রাখিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে আনিয়া সঞ্চালিত করিয়া উচ্চারিত একটানা আওয়াজে সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।''[৫১]

এতকিছুর পাশাপাশি উপন্যাসটিতে পদ্মানদীর উপস্থিতিও এর আঞ্চলিক লক্ষণকে অনেকটা দৃঢ় করেছে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের উপর পূর্ববঙ্গের এই নদীটি এতটাই অনিবার্য প্রভাব ফেলেছে যে, একে ছাড়া পদ্মা তীরবর্তী মানুষেরা নিজেদের জীবনের কথা ভাবতে পারে না। পদ্মা নানা সময়ে তার তীরে বসবাসকারী জেলে-মাঝিদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ালেও ঔপন্যাসিক বলেছেন — ''তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন

চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা।''[৫২] উপন্যাসে পদ্মার বুকে তার মাঝিদের বিশেষ অধিকারের উল্লেখও নানা জায়গায় আছে। মেয়ে গোপিকে আমিনবাড়ির হাসপাতালে রেখে কপিলাকে নিয়ে কুবের পয়সা দিয়ে নৌকা ভাড়া করতে চাইলে জনৈক মাঝির সঙ্গে কুবেরের কথোপকথনটির উল্লেখ করা যায় — ''কত নাও যাইবো কাইল, পয়সা দিয়া ক্যান যাইবা কুবের বাই? বলিয়া পরিচিত মাঝি কুবেরকে নৌকায় রাত্রি যাপন করিতে অনুরোধ করে। শুধু পরিচিত মাঝি কেন, পদ্মানদীর মাঝি সে, পদ্মানদীর যে-কোন মাঝির নৌকায় রাত্রিযাপনের অধিকার তার জন্মগত, . . . ।''[৫৩] আবার রাসু যখন ময়নাদ্বীপ থেকে পালিয়ে এসেছিল তখন সোনাখালি মেলায় আগত একটি নৌকায় সে চেপেছিল। এতে নৌকার মাঝি রাগ করলেও ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''রাগের কারণটা তাহাদের সহজেই বোঝা যায়। সুলপী হইতে সোজাসুজি সোনাখালির মেলায় যাওয়ার বদলে রাসুকে এখানে পৌঁছাইয়া দিতে তাহাদের পদ্মা পার হইতে হইয়াছিল। প্রতিদানে রাসু যে তাহাদের কিছুই দিতে পারে নাই তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু এ ক্রোধ তাহাদের ফলপ্রসু নয় — এ শুধু ক্রোধ। রাসুর মতো দুরবস্থায় পড়িয়া আবার যখন কেহ তাহাদের পদ্মা পার করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইবে এমনিভাবে রাগিয়া উঠিলেও সেই নিরুপায় মানুষটিকে তাহারা না বলিতে পারিবে না, বিনা প্রত্যাশায় বোঝাই নৌকা লইয়া তিন ক্রোশ অতিরিক্ত বইঠা বাহিবে। ইহা মহত্ত্ব নয়, পরোপকার নয় — ইহা রীতি, অপরিহার্য নিয়ম। আশ্চর্য এই, এ নিয়ম পালন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠাও অনিয়ম নয়।''[৫৪]

এভাবে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাটিতে আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে এইরকম অজস্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তবে এই উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলার প্রসঙ্গে সমালোচকেরা দ্বিধাবিভক্ত। অনেকেই একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে চান নি। মূলত উপন্যাসটির স্থানগত ব্যাপ্তি, সমষ্টিকে প্রাধান্য না দিয়ে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া, বহিরাগত শক্তির সঙ্গে স্থানীয় শক্তির দ্বন্দ্বের অভাব, 'পদ্মানদীর মাঝি'র অনুকরণে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারা সৃষ্টি না করা, উপন্যাসটির ক্ষেত্রে

আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে যাওয়া প্রভৃতি বিষয় এই উপন্যাসটির সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে না পারার কারণ হিসেবে উঠে আসে।

এটা ঠিকই যে এই উপন্যাসটির ঘটনাস্থল যতক্ষণ পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রাম ও তৎসংলগ্নস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। কিন্তু হোসেন মিয়া এবং তাঁর ময়নাদ্বীপের অনুপ্রবেশ ঘটার পর এর আঞ্চলিক লক্ষণ অনেকটাই আক্রান্ত হয়েছে। কারণ ময়নাদ্বীপের বাসিন্দারা প্রায় সবাই জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া সৈনিক, তারা কেউ আর পদ্মার উপর নির্ভরশীল জেলে-মাঝি নয় — এরা সবাই আদিম কৃষিনির্ভর সমাজ পত্তনের কারিগর। এই বিষয়টি অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়েরও দৃষ্টি এড়ায়নি — ''এই উপন্যাসে সুদূরের ইশারা এনেছে রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া ও তার দূরবর্তী দ্বীপ। ঐ অপরিচিত দ্বীপে বসতি স্থাপনের দুঃসাধ্য প্রয়াসে রত হোসেন মিয়া পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়ে উপন্যাসের আঞ্চলিক সীমা-সংহতিকে শিথিল করে দিয়েছে। জেলে-মাঝিরা যেখানে পদ্মার কাছে, প্রকৃতির কাছে হার মেনেছে, হোসেন মিয়া সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই দিয়েছে। এই ইঙ্গিতটি একেবারে অগ্রাহ্য নয়।''[৫৫] অধ্যাপক অলোক রায়ের 'কথাসাহিত্য সাহিত্যকোষ' গ্রন্থে অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে বলেছেন — ''পদ্মানদীর মাঝি'তে সেখানকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঐ নদীরই প্রভাবে। নদীর অস্থিরতা ও বেগ ঐ সম্প্রদায়ের জীবনে যাযাবরত্ব ও গতি এনে দিয়েছে। তথাপি এখানে গোষ্ঠীচেতনা প্রবল হতে পারে নি। হোসেন মিঞার কতুবদিয়া দ্বীপের মায়াময় আকর্ষণ এখানকার অধিবাসীদের আর এক রাজ্যে আহ্বান করেছে।''[৫৬]

আঞ্চলিক উপন্যাসে নায়ক বা নায়িকা চরিত্রের অবতারণা করা হলেও এখানে শুধু তাদের জীবন পরিক্রমার বিবরণ থাকে না; তাদের বসবাসকারী অঞ্চলটির সামগ্রিক ছবি এখানে উঠে আসে। এককথায় আঞ্চলিক উপন্যাস কোন ব্যক্তি মানুষের কাহিনি না হয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত মানুষের (সমষ্টির) কাহিনি হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসটির কাহিনির সূচনায় সমষ্টির ইঙ্গিত থাকলেও শেষপর্যন্ত তা ব্যক্তি মানুষ অর্থাৎ উপন্যাসের নায়ক কুবেরের কাহিনি হয়ে উঠেছে বলে অনেকেই মনে করেছেন।

এদের মধ্যে সবার আগে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে হয়। উপন্যাসটির আলোচনায় তিনি বলেছেন — ''ইহা ততটা নদীতে মাছমারার কাহিনী নহে যতটা নদী হইতে গৃহ-প্রত্যাগত ধীবরের গার্হস্থ্য জীবন ও হৃদয়-সমস্যার অশান্ত আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ।''[৫৭] উপন্যাসটির কাহিনি অংশে এটা দেখাও যায় যে, পদ্মা তীরবর্তী জেলে-মাঝিদের জীবন পরিক্রমার বিবরণ দিয়ে শুরু হলেও অচিরেই তা কুবেরের ব্যক্তিজীবনের কাহিনির দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই বিষয়টি সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়েরও দৃষ্টি এড়ায় নি — ''পদ্মার জেলেদের জীবনযাত্রা, তাদের জীবনসংগ্রাম এ উপন্যাসে মানিকের লক্ষ্য নয়। মানিকের লক্ষ্য কপিলা আর কুবেরের অবৈধ আকর্ষণ, ফলে পদ্মা নদী, মাছের কেনা-বেচা সব নিয়ে যে ধীবরজীবন, তার অনেকটাই উপন্যাসে ফোকাসের বাইরে পড়ে গিয়েছে। বরং রোমান্সের টানে হোসেন মিয়ার মত অভিনব চরিত্র ও তার বিচিত্র কার্যকলাপ ক্রমশ কেন্দ্র দখল করে নিয়েছে।''[৫৮] অধ্যাপক অশুকুমার সিকদারও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বস্তুসমগ্রতার অভাব লক্ষ করেছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাস যেন সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সাহিত্যরূপ। ফ্রেমটা আঞ্চলিক উপন্যাসের, কিন্তু 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। একটা বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি, এইক্ষেত্রে পদ্মানদী, কীভাবে সে অঞ্চলের গোষ্ঠীজীবনকে প্রভাবিত করে তার ইশারা হয়তো আছে। 'নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ।' কিন্তু তবু গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বস্তুসমগ্রতা বর্ণনা করা এই উপন্যাসের লক্ষ্য নয়। বরং চলমান নদীস্রোতের পটভূমিতে জেলেগ্রাম কেতুপুরের এক প্রান্তে মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের কথাই 'পদ্মানদীর মাঝি'তে রূপায়িত।''[৫৯]

তবে গোষ্ঠিবদ্ধ জীবনের কাহিনি না হওয়ায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি যে একেবারে আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এই মত কেউ-ই প্রদান করেন নি। এই প্রসঙ্গে সমস্ত সমালোচকের হয়ে সম্ভবত অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাস মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক উপন্যাস, 'পদ্মানদীর মাঝি' ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস। তবু আঞ্চলিক উপন্যাসের শর্ত কিছুটা পালিত হয়েছে। এ উপন্যাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে দেখা দিয়েছে, ভূ-প্রকৃতি

মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ভৌগোলিক সীমাসংহতি রক্ষিত হয়েছে। যে ধীবর-গোষ্ঠীর জীবন এখানে চিত্রিত, তা একান্তভাবে বাস্তবনির্ভর। কোনো উচ্চ আদর্শ, বাস্তববর্জিত সৌন্দর্যবোধ, রোমান্টিক দৃষ্টি ধীবর-পল্লীর উপর রঙীন আলো ফেলে নি। পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের মান-অভিমান-ঈর্ষা-চক্রান্ত-দ্বন্দ্ব-দলাদলি-প্রীতি-ভ্রাতৃত্ব সব কিছুই নিখুঁতভাবে রূপায়িত।''[৬০] যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে এসব কিছুরই অস্তিত্ব থাকে।

যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে গৃহীত অঞ্চলটির স্থানীয় সংস্কৃতি অর্থাৎ লোকাচার, লোক-সংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোককথার বাস্তব রূপচিত্র অঙ্কন করা হয়। সেই সঙ্গে এও দেখানো হয় যে বহিরাগত শক্তির প্রভাবে সেই স্থানীয় সংস্কৃতি ভেঙে পড়ে। উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীরা অনেক চেষ্টা করেও সেই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে সেই অর্থে অভ্যন্তরীণ শক্তির সঙ্গে বহিরাগত শক্তির বিরোধ নেই। আসলে এখানে পদ্মা তীরবর্তী জেল-মাঝিদের স্থানীয় সংস্কৃতিরই পূর্ণাঙ্গ রূপ নেই, তাই ভেঙে যাওয়ার প্রসঙ্গ আসেনি। বহিরাগত শক্তি হিসেবে হোসেন মিয়া এলেও সেও পদ্মানদীর মাঝিদের একজন হয়ে উঠেছে। তবে এটা ঠিক কুবেরের মত পদ্মানদীর মাঝিরা যখন হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ বসতি স্থাপন করবে তখন সেখানে আর কেতুপুরের জেলেপাড়ার সংস্কৃতিকে লালন-পালন করবে না। কারণ হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে মন্দির-মসজিদের কোনো ব্যাপারই নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মত সাহিত্যিকরা মূলত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হন। তাদের এই প্রয়াস থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটে। তবে কেউ-ই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস লিখতে পারেন নি। এরপর বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক — এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন ঘটে। এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জন তাঁদের সাহিত্য কর্মে স্থানিক বিষয়কে প্রাধান্য দেন। এরমধ্যে তারাশঙ্কর তো বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এদের সমধর্মী ছিলেন না বলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — ''অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ'-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্লোলের উত্তরপুরুষ বলেছেন। কিন্তু কল্লোলীয়দের সঙ্গে নিজের মনোভঙ্গীর পার্থক্য মানিক নিজেই নির্দেশ করে দিয়েছেন তাঁর 'লেখকের কথা' নামে ছোট বইটির পাতায়। . . . মানিক কল্লোলের ধারাবাহী নন, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের স্থানিক সাহিত্যও তাঁকে প্রেরণা দেয়নি।''[৬১] সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আঞ্চলিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেছেন — '' . . . 'পদ্মানদীর মাঝি' একান্তভাবে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' নয়। বস্তুত এই একখানি গ্রন্থ ছাড়া পদ্মানদী বা পূর্ববঙ্গের এধরনের আঞ্চলিক পরিবেশ অবলম্বন করে লেখক আর কোনও উপন্যাস লেখেননি। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা কথাসাহিত্যে 'আঞ্চলিক উপন্যাস'-এর কোন ধারা রচনা করতে চান নি।''[৬২] অবশ্য তিনি এই অনুমানের নিরসন নিজেই ঘটিয়েছেন — ''শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের হাতে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের আঞ্চলিক জীবনকথা যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে তেমনি পূর্ববঙ্গের স্থানীয় রঙ (local colour) ফুটে উঠেছে সংযত বাস্তব বর্ণবিন্যাসের নৈপুণ্যে। পদ্মানদীর মাঝির দল, তাদের পরিবারের লোকজন — সকলের চরিত্র নিখুঁত বাস্তবতায় লেখক চিত্রিত করেছেন। তাদের দুঃখ দারিদ্র্য, জীবন ধারণের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম, পারস্পরিক সহানুভূতি আবার কলহ-দলাদলি সব কিছুর মধ্য দিয়ে তাদের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণধর্ম প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পদ্মার প্রচন্ড স্রোতোবেগের সঙ্গে লেখক যেন এই দুর্মর প্রাণবেগের নিগূঢ় সাদৃশ্যের ব্যঞ্জনা অনুভব করেছেন মনে হয়।''[৬৩] অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এই উপন্যাসটির প্রশংসায় বলেছেন — ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) থেকে উপন্যাসে পটভূমি ও বৃত্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়তে শুরু করে।''[৬৪] এই মন্তব্য থেকে আমরা ধরেই নিতে পারি যে, তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস থেকেই বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছে।

অবশ্য উপন্যাসটি পদ্মা তীরবর্তী গ্রামজীবনের জীবনচর্যার বিবরণ দিয়ে শুরু হলেও এর আবেদন নিছক গ্রামকেন্দ্রিক নয় — পদ্মা তীরবর্তী গ্রামগুলিকে ছাড়িয়ে বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। সমালোচক আশিস কুমার দে বিষয়টিকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন — ''স্থাণীয় বর্ণ, আঞ্চলিকতা পেরিয়ে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর কথা 'পদ্মানদীর মাঝি'তে বারবার আছে। সেগুলিকে উপেক্ষা করে প্রতিবেশ, উপভাষার স্বাদ এবং আচার ব্যবহার, চিন্তা-অনুভূতির বিশেষ রূপ নিয়ে বিচার করলে সমালোচনা অনেক কিছু হারাবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'র রূপকে জীবনের নানা কথা — যা বৈশ্বিক — তাই বলতে চেয়েছেন।''[৬৫] একথা শুনে মনে হয় 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পরেনি। অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যও উপন্যাসটির আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন — ''নির্দিষ্ট আঞ্চলিক পটভূমিকায় রচিত হলেও পদ্মানদীর মাঝি আঞ্চলিক উপন্যাসও নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই কেবল আঞ্চলিক উপন্যাস হয় না। তা অঞ্চলকে ছাড়িয়ে যায়। যেখানে প্রকৃতি ও মানবজীবনকাহিনী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে কোন উত্তরণ নেই, সেখানে আঞ্চলিক চিত্র যতই বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন তা আঞ্চলিক চিত্র মাত্র, উপন্যাস নয়।''[৬৬] তবে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এরূপ সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে — ''আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করাই আঞ্চলিক উপন্যাসের শেষ লক্ষ্য। . . . 'পদ্মানদীর মাঝি'তে (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক ভূ-প্রকৃতি ও প্রকৃতিনির্ভর জীবনকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুসরণ করেও জীবনের গভীর নদীপ্রতিম রহস্যকে উদ্ভাসিত করে তোলেন।''[৬৭] সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে যে 'পদ্মানদীর মাঝি'র আঞ্চলিকতাকে নস্যাৎ করা যায় না তা নিশ্চিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়র 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটিকে সকলে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস না বললেও কেউ উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু এবং পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রয়োগ নিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ সপ্রশংস মন্তব্য করে বলেছেন — ''পদ্মাতীরবর্তী ধীবর-জীবন এর মুখ্য কথাবস্তু। সম্ভবত এটিই প্রথম বাংলা উপন্যাস যেখানে আদ্যন্ত কথোপকথনে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।''[৬৮] মানিক-গবেষক কানাই সেন

এই উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন — ''সমাজের একটি শ্রেণীর সম্পূর্ণ শ্রেণী-চরিত্র তুলে ধরতে গেলে কিম্বা একটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ঔপন্যাসিকের যে দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভঙ্গি এবং বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সেগুলি পরিপূর্ণভাবে দেখা গেছে। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে এর পরিচয়। মুখের ভাষা থেকে শুরু করে সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস এবং সর্বোপরি পরিবেশ সচেতনতায় এ উপন্যাসটি একটি শ্রেণী-বিশেষের পূর্ণাঙ্গ জীবন-চিত্র হিসেবে সার্থক হয়েছে।''[৬৯] শুধু এই মন্তব্যটির ভিত্তিতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায়। তবুও এর আঞ্চলিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। অবশ্য সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রদত্ত তাঁর পরিভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থটির একটি মন্তব্যে — ''আঞ্চলিক উপন্যাসে দেশের এক বিশেষ অঞ্চলের পরিচয় থাকতেই হবে — এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কিম্বা বর্ণিতব্য অঞ্চলের ভাষাই (অর্থাৎ সেখানকার উপভাষা বা dialect) চরিত্রাবলীর মাধ্যমে উচ্চারিত হবে — তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। জন্মভূমির একটি বিশেষ অংশের মধ্যে মানুষের একটা পরিচয় থাকে, কিন্তু তাকে ঐ পরিবেশনির্ভর (সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ পরিসরজনিত) আবহাওয়ার বাইরে আসতে হয়, সেখানে সে দেশ-কালের বাইরের সত্তাকে উপলব্ধি করে। আঞ্চলিক উপন্যাসেও মানুষের এই সত্তার পরিচয় দিতে হবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কুবের পদ্মার মতই আবেগ-সম্পন্ন হয়েছে, জন্মভূমিখন্ডের প্রকৃতি তাকে জীবনচেতনায় নিয়ন্ত্রিত করেছে — এইখানেই আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থকতা।''[৭০]

যাই হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পেরেছে কি না — এই সংক্রান্ত অজস্র প্রশ্ন আজ পর্যন্ত উঠেছে। সম্ভবত এই ধরনের প্রশ্ন আরও উঠবে। কারণ এই উপন্যাসটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের একেবারে প্রথম যুগের রচনা। আঞ্চলিকতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য তখনও নির্ণীত হয় নি। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে তা মেনে চলাও সম্ভব হয় নি। অবশ্য এটাও ঠিক যে কোন কালজয়ী সাহিত্য নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য মেনে চলে না। 'পদ্মানদীর মাঝি'র ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে। এখানে মানিক

পদ্মার তীরে বসবাসকারী ধীবরদের জীবনের একটি রূপকে দেখাতে চেয়েছেন। কুবেরের মধ্যে দিয়ে সে উদ্দেশ্যে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছেন। ধীবর কুবের পদ্মার তীর ছেড়ে সুদূর ময়নাদ্বীপের বাসিন্দা হওয়াতেই উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন। তবে মনে হয় ধীবর জীবনের অনিবার্য পরিণতিকে দেখানোর জন্যই ঔপন্যাসিক ময়নাদ্বীপের পরিকল্পনা করেছেন। তাই বলা যায় যে, বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রথম যুগের রচনা হওয়ায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি হয়তো সম্পূর্ণ সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে নি ; কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেকগুলি লক্ষণ সঙ্গে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩–১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ)–এর একটি জনপ্রিয় ও আলোচিত উপন্যাস হল **'নতুনফসল'**। এটি ট্রিলজি। 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'সোমলতা' (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) — এই তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এর কাহিনিবস্তু গড়ে উঠেছে। এগুলিতে ঔপন্যাসিক বিনোদিনী নামক এক গ্রাম্য গৃহবধূর জীবন পরিক্রমার ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের তিনটি ভিন্ন পর্যায়কে প্রকাশিত করেছেন। এই ট্রিলজির অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস তিনটিতে তিনি বীরভূম সংলগ্ন ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশের প্রকৃতি ও কৃষিজীবী মানুষজনের বাস্তব ও জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। পাশাপাশি সেই অঞ্চলের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনাড়ম্বর জীবনচর্যারও ছবি এই উপন্যাসত্রয়ীতে উজ্জ্বলভাবে উঠে এসেছে। তাই একটি বিশেষ অঞ্চল ও সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যাকে ভিত্তি করে রচিত এই ট্রিলজিটির আলোচনা সমালোচকেরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই করেছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ট্রিলজির অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস তিনটিকে বৈষ্ণব জীবনের সত্য বলে মেনে নিয়ে জানিয়েছেন — ''বৈষ্ণব জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' (১৯৩৮) — এই তিন খন্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসাবলী উল্লেখযোগ্য।''[৭১]

'ময়ূরাক্ষী'তে ঔপন্যাসিক বীরভূম সীমান্তবর্তী পশ্চিম মুর্শিদাবাদের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী কমলপুর নামক একটি গ্রামকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই কমলপুর গ্রামের উনিশ বর্ষীয়া গৃহবধূ বিনোদিনী হল এই উপন্যাস তথা সমগ্র

‘নতুনফসল’ ট্রিলজির নায়িকা। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক স্বামী হারান এবং হাবল ও মেনি নামের দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তার আপাত সচ্ছল সংসার। উপন্যাসের কাহিনি অংশে দেখা যায় মোটামুটি অবস্থাপন্ন পরিবারের গৃহবধূ বিনোদিনী সারাদিন পল্লী সংসারের অভ্যস্ত খাঁটা-খাটুনির মধ্য দিয়ে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে সংসার জীবন নির্বাহ করে। আপাতভাবে তাকে সুখী বলে মনে হলেও স্বামী হারানের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান তাকে মাঝে মাঝে সংসার বিমুখ করে তোলে — সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করলেও প্রায় রাতেই সে স্বামীর সঙ্গে কলহে জড়িয়ে পড়ে। হয়তো এই কারণেই একদিকে কলেজে পড়া গ্রাম্য তরুণ তারাপদ এবং অপরদিকে বাল্যপ্রণয়ী চালচুলোহীন বৈষ্ণব গৌরহরির প্রতি আকর্ষণ তাকে মাঝে মাঝেই উন্মনা করে তোলে। বাল্যপ্রণয়ী গৌরহরির আকর্ষণই সে বেশি করে অনুভব করে। গৌরহরির গান তার মনকে মাঝেমাঝেই সংসার জীবন থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বাউল-বৈষ্ণবদের আখড়ায়। এর ফলশ্রুতিতে হারানের সঙ্গে সামান্য সাংসারিক বিবাদে জড়িয়ে পড়ে বিনোদিনী স্বামীগৃহ ত্যাগ করে। বিনোদিনীর এই স্বামীগৃহ ত্যাগের মধ্য দিয়েই সরোজকুমারের ‘ময়ূরাক্ষী’র কাহিনি অংশ শেষ হয়েছে।

‘ময়ূরাক্ষী’র পর বিনোদিনীর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ‘গৃহকপোতী’র মধ্য দিয়ে। এর কাহিনি অংশে দেখা যায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করে বিনোদিনী তার বাল্যসখী ললিতার কাছে আশ্রয় নেয়। বৈষ্ণব সমাজের ললিতা স্বামীগৃহ ত্যাগ করে আপন মনের মানুষ রসময়কে নিয়ে সাতগাঁ-কাঞ্চনপুরে আখড়া তৈরি করে বাস করছিল। এখানে গৃহধর্মের বেড়াজালহীন মুক্ত আকাশে বিচরণ করা রসময়-ললিতার উদাসী সংসার জীবন বিনোদিনীকে আকর্ষিত করলেও গৃহকপোতী বিনোদিনীর গৃহীমনকে ফেলে আসা সংসার এক অজানা আকর্ষণে টানতে থাকে। তাই রসময়ের আখড়াতেই সে নিজের একাকী সংসার পেতে বসে — রীতিমত মানুষের ধান-কলাই ভেঙে দিয়ে পয়সা রোজগার শুরু করে দেয়, এমনকী লোককে ধার-বাকী দিয়ে সুদ আদায়ের ব্যবসাও সে শুরু করে। এদিকে বাউল-বৈষ্ণবদের মুক্ত আকাশ, গানের সুরকেও সে ভুলতে পারে না — তার হৃদয় কন্দরে লুকিয়ে থাকা গৌরহরির প্রতি গুপ্ত প্রণয় মাথা চাড়া দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বিনোদিনীর মা এবং দাদা নিতাইপদ এসে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বিনোদিনীর দাদার সংসারে ফিরে যাওয়ার মধ্য

দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'ময়ূরাক্ষী'তে ঔপন্যাসিক বিনোদিনী-হারাণের সংসার জীবনের প্রেক্ষিতে কৃষিজীবনের ছবি আঁকলেও 'গৃহকপোতী'তে রসময়ের আখড়ার প্রেক্ষিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার অন্তর্নিহিত দিকটিকে প্রকাশ করেছেন।

এরপর দাদা-বৌদির সংসারে বিনোদিনীর জীবনের তৃতীয় পর্যায় 'সোমলতা' সূচনা হয়। এর কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, দাদার সংসারে থাকাকালীন অবস্থায় গৌরহরির প্রতি বিনোদিনীর গুপ্ত প্রণয় প্রকাশ্যে আসে। এ সময় বিনোদিনী বারবার নিজের হৃদয়কে চেনার চেষ্টা করলে, প্রতিবারই তার হৃদয় গৌরহরির প্রতি ধাবিত হয়। এর ফলস্বরূপ তার জীবনে কলঙ্ক নেমে আসে। সে গৌরহরিকে একেবারে আপন করে পেতে চায়। কিন্তু বিনোদিনীকে কলঙ্কিত করার পর থেকেই গৌরহরির মন অন্যদিকে ধাবিত হয় — সে আপন সম্প্রদায়ের কিশোরী কমললতাকে নিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এদিকে গৌরহরির কাছ থেকে পাওয়া কলঙ্কই বিনোদিনীকে পরিশুদ্ধি দেয়। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায় যে, সে স্বামী হারান এবং দুই সন্তান হাবল ও মেনিকে সঙ্গে নিয়ে কমলপুরে পুনরায় তার নিজের সংসারে ফিরে যায়। উপন্যাসের শেষে বিনোদিনীর আপন সংসারে ফিরে যাবার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বাঁধাঘাটের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ললিতা আর নয়নতারা দেখলে, সেই মাঠের পথ ভেঙে ওরা চলেছে ষ্টেশনের দিকে। আগে হারান। তার মাথায় বিনোদিনীর পেটারী, কোলে মেনী। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মূর্তির মতো বলিষ্ঠ, সুদীর্ঘ, সুঠাম দেহ। মাথায় মধ্যাহ্ন সূর্যের পরিপূর্ণ আলোর রাজছত্র। যেন সে এই বসুন্ধরার দিগ্বিজয়ী রাজা। পাশে তারই লাঠিটি কাঁধে করে দৃপ্ত ভঙ্গীতে চলেছে হাবল। পিছনে বিনোদিনী। মাঠের প্রবল হাওয়ায় তার পিঠের কাপড় নৌকার পালের মত ফুলে ফুলে উঠছে। বাঁধাঘাটের উঁচু পাড় থেকে সবাইকে চেনা যাচ্ছে, কেবল ওকে নয়। ও যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও যেন এই বসুন্ধরা স্বয়ং — আলোয় ছায়ায়, অন্ধকারে, ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে দেয় দেখা। কলঙ্কে এবং মহিমায় সে রূপের আর শেষ নেই।''[৭২] বিনোদিনীর হৃদয়ের টানাপোড়েন, গৌরহরি দ্বারা কলঙ্কিত হওয়া এবং সেই কলঙ্কের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে সংসার জীবনে ফিরে আসার মধ্য দিয়েই 'সোমলতা'র পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এই ট্রিলজির তিনটি উপন্যাসেই ঔপন্যাসিক ময়ূরাক্ষী লালিত পশ্চিম মূর্শিদাবাদের মূল জনসমাজ থেকে নানা দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে নায়িকা বিনোদিনীর জীবন পরিক্রমার তিনটি বিশেষ পর্যায়কে ফুটিয়ে তুলেছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি সেই অঞ্চলের চাষি সমাজের পাশাপাশি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার ছবি প্রকাশ করেছেন। ফলে এগুলিতে সেই অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষজন এবং তাদের জীবনচর্যা অর্থাৎ আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, লোকবিশ্বাস-লোককথা, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশিষ্ট ভাষারীতির মত আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক লক্ষণও প্রকটিত হয়েছে। এইজন্য অধ্যাপক অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' রচনায় বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু উপন্যাসের সঙ্গে সরোজকুমারের এই উপন্যাসত্রয়ীকেও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে — ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' . . . প্রভৃতি কতকটা ব্যাপক অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাস।''[৭৩] অবশ্য এই 'নতুনফসল' ট্রিলজির অন্তর্গত উপন্যাস-ত্রয়ীকে আঞ্চলিক উপন্যাসের আখ্যা দেওয়া যায় কি না তা নির্ধারণের পূর্বে এগুলিতে আঞ্চলিক লক্ষণ কতটা ফুটে উঠেছে সেটা জানা অত্যন্ত জরুরি।

যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান শর্ত হল যে, ঐ উপন্যাসে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার জনসমাজকে তুলে আনতে হয়, যাদের সম্পর্কে তথাকথিত সভ্যসমাজের মানুষজন খুব বেশি খোঁজ খবর রাখে না। ঔপন্যাসিক সরোজকুমার এইরকম মানসিকতারই লোক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে শিশিরকুমার দাশ জানিয়েছেন — ''সরোজকুমারের রচনার ভৌগোলিক পটভূমি মূর্শিদাবাদ। এখানকার নদীপ্রান্তর, মানুষ তাঁর উপন্যাসের মূল উপকরণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই তাঁর উপন্যাসে একটি স্থানগত বৈশেষিকতা আছে।''[৭৪] 'নতুনফসল' ট্রিলজির তিনটি উপন্যাসেই তিনি পটভূমি হিসেবে ময়ূরাক্ষী লালিত বীরভূম সংলগ্ন পশ্চিম মূর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চল এবং সেখানকার জনসমাজকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাস তিনটির কাহিনি ধারার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এগুলির প্রধান

ঘটনাস্থল হিসেবে তিনটি স্বতন্ত্র স্থানকে তিনি নিয়ে এসেছেন। এরমধ্যে প্রথম উপন্যাস ‘ময়ূরাক্ষী’র ঘটনাস্থল হারান-বিনোদিনীর কমলপুর গ্রাম, দ্বিতীয় উপন্যাস ‘গৃহকপোতী’র ঘটনাস্থল সাতগাঁ-কাঞ্চনপুরের রসময়-ললিতার আখড়া, আর তৃতীয় উপন্যাস ‘সোমলতা’র ঘটনাস্থল মূলত বিনোদিনীর বাপের বাড়ির গ্রাম, তবে এই উপন্যাসের কিছু ঘটনা বৈষ্ণব সমাজের বড় বাবাজীর আখড়াতে এবং কমলপুরে হারানের বাড়িতে ঘটেছে। এই স্থানগুলি সবই তথাকথিত মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এজন্য ঔপন্যাসিক এই জায়গাগুলির আলাদা করে স্থান নির্দেশও করে দিয়েছেন। প্রথম উপন্যাস ‘ময়ূরাক্ষী’র শুরুতেই গ্রীষ্মের জলহীন ময়ূরাক্ষীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে সরাসরি উপন্যাসের পটভূমি কমলপুরের বর্ণনায় ঢুকে পড়েছেন — ‘‘এদিকে, কমলপুরের দিকে, খেয়াঘাটের কিছু উপরেই স্নানের ঘাট। সরু এক ফালি রাস্তা উঁচু পাড় থেকে এঁকে বেঁকে ঘাটে নেমে এসেছে। স্নানের সময় সে রাস্তা মেয়েদের ভিজে কাপড়ের জলে এমন পিছল হয়ে থাকে যে নিতান্ত অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারও সে পথে ওঠা-নামা করা কঠিন। মেয়েরা পারে। তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তারা ঘাটে ঘড়া নামিয়ে বসে দাঁত মাজে, নিজেদের ঘরকন্না সুখ দুঃখের গল্প করে, ওরই মধ্যে খেয়াঘাটে যারা পার হয় গুণ্ঠনের ফাঁকে তাদেরও দেখে নেয়। তারপর স্নান শেষ করে জলভরা ঘড়া কাঁখে নিয়ে ডানহাত দোলাতে দোলাতে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে আসে।

উপরেই একটা প্রাচীন বটবৃক্ষ চারিদিকে ছায়ায় অন্ধকার করে আছে। তারই নীচে দিয়ে গ্রামে আসার পথ। আলপথে একটুখানি এসেই গ্রামের রাস্তা, আলের চেয়ে খানিকটা চওড়া। গ্রামখানি নিতান্তই ছোট। সকলেই চাষি গৃহস্থ। সম্মুখেই কয়েক ঘর কুমোরের বাস। তাদের শালের আগুনের ধোঁয়া অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। ওদিকে গ্রামের অপর প্রান্তে কয়েক ঘর হাড়ি-বাগ্দি বাস করে, গ্রাম থেকে একটুখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে অত্যন্ত জরাজীর্ণ ছোট ছোট চালাঘরে।’’[৭৫]

দ্বিতীয় উপন্যাস ‘গৃহকপোতী’র শুরু হয়েছে বাউল-বৈষ্ণব রসময়-ললিতার আখড়াস্থল সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর গ্রামের বর্ণনা দিয়ে — ‘‘সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর গ্রামখানি আকারে বড়। আসলে দু’টি একই গ্রাম, মধ্যে একটি পুল। পুলের এধার সাতগাঁ, ওধার কাঞ্চনপুর। এইটুকুমাত্র ব্যবধানে পৃথক গ্রাম হওয়ার কথা নয়। পার্থক্য গ্রাম

দু'টি পৃথক জমিদারের অধীন ব'লে। সাতগাঁর জমিদার সিংহগোষ্ঠী, কাঞ্চনপুরের মল্লিকবাবুরা। সাতগাঁয়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের সংখ্যাই বেশি। অন্যান্য জাতি দু'চার ঘর ক'রে। কাঞ্চনপুরে সদ্‌গোপের সংখ্যাই বেশি। অন্য জাতির সংখ্যা কম। পশ্চিম প্রান্ত ময়ূরাক্ষী। তার ধারে অনেকখানি জায়গা নিয়ে উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়, তার ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ ইত্যাদি। তারই অদূরে একটা আমবাগানের মধ্যে রসময়ের আখড়া। একেবারে নদীর উপরে বললেই হয়।''[৭৬]

'সোমলতা'য় আলাদা করে কোন গ্রামের বর্ণনা না থাকলেও এর মূল পটভূমি বিনোদিনীর বাপের বাড়ির গ্রাম এবং সেখানকার কৃষিভিত্তিক জনসমাজ। এখানে গৌরহরির আখড়াকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন চর্যারও উল্লেখ আছে। 'নতুনফসল' ট্রিলজির তিনটি উপন্যাসেই মূলত কৃষিনির্ভর গ্রাম সমাজের ছবি উঠে এসেছে। তবে ময়ূরাক্ষী নদী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়াগুলি উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামগুলিকে মূল জনসমাজ থেকে নানা দিক থেকেই স্বতন্ত্র করেছে। 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসটির শুরুতেই শেষ গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষীর বর্ণনা দিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন —

''ময়ূরাক্ষী চলে বয়ে।

শেষ গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষী। স্রোত তার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। একদিকে ধূ ধূ করছে বালুচর। কত পাখির পায়ের দাগ তার উপর বিচিত্র আলপনা কেটে গেছে। চিহ্ন রয়েছে কত মানুষের পায়ের দাগের। কেউ জল নিতে এসেছে, কেউ গেছে। গত রাতের চক্রবাকী ফেলে গেছে একটি পালক। সেটি হাওয়ায় ইতস্তত উড়ছে। কর্মব্যস্ত মানুষের চোখে তার মূল্য নেই। দুটি পাখির নিগূঢ় বিরহ-মিলন কথার এই নীরব সাক্ষী কারও চোখে পড়ে না। ক্ষয়-ক্ষীণ শীর্ণা ময়ূরাক্ষীতে এখন খেয়াঘাটে নৌকা নেই। খেয়া পারাপার বন্ধ। লোকে হেঁটে পার হচ্ছে। তারই চিহ্ন নদীতটে আঁকা। কাকচক্ষুর মত নির্মল জলে এক টুকরো আকাশের ছায়া পড়ে। দিনে রৌদ্রজ্জ্বল ধূসর আকাশ, অপরাহ্নে গলিত স্বর্ণাভ, রাত্রে তারায় ভরা নির্মল নীল। . . . এমনি করে বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী। কোথাও গ্রামের কোল ঘেঁষে লাজনম্রা তনুদেহ কিশোরী বধূর মত। কোথাও দিগন্তপ্রসারী ছায়াহীন শূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে অনশনক্ষীণা ব্রতচারিণী দেয়াসিনীর মতো। আবার দহের কাছে যেন স্থির-যৌবনা বিলাসিনীর মতো, তার নিস্তরঙ্গ নীলাভ কালো জল মৃত্যুর মতো লোভার্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।''[৭৭] এই ময়ূরাক্ষী লালিত

অঞ্চলটির সঙ্গেই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা একাত্ম হয়ে উঠেছে। এই কারণেই সমালোচক বলেছেন — ''বীরভূম-মুর্শিদাবাদের ময়ূরাক্ষী নদীলালিত অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে সরোজকুমারের উপন্যাস তিনটির বৈষ্ণব পাত্রপাত্রীর নিবিড় সংযোগ। বিনোদিনী ও হারানের জীবন ঐ প্রকৃতির জীবন ছন্দে এরই সুরে বাঁধা।''[৭৮] সুতরাং উপন্যাসত্রয়ীতে উল্লিখিত ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী অঞ্চলটিও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। এটি যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

এই ট্রিলজির চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনটি উপন্যাসেই মূলত দুই ধরনের চরিত্র আছে — কৃষক পরিবারের চরিত্র এবং বৈষ্ণব চরিত্র। উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী, তাঁর স্বামী হারান, দুই সন্তান হাবল ও মেনি, তার মা, দাদা নিতাইপদ, বৌদি নয়নতারা, বাপের বাড়ির গ্রামের শিবদাস এবং তার মা ও স্ত্রী, কমলপুর গ্রামের রসিক পাল এবং তার স্ত্রী ও পুত্রবধূ মানিকের মা, তারাপদের বাবা সদানন্দ, মা ও বোন কিশোরী, রতনমণি, বৃন্দাবন, বৃদ্ধ গয়ানাথ, হারানের বাড়ির রাখাল থেকে শুরু করে অসংখ্য কৃষক পরিবারের চরিত্র এই উপন্যাস তিনটিতে দেখা যায়। কৃষক পরিবারের চরিত্রগুলি মূলত 'ময়ূরাক্ষী' এবং 'সোমলতা'তেই আছে। এদের পাশাপাশি বৈষ্ণব চরিত্রগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এরূপ চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধান হল বিনোদিনীর বাল্যপ্রণয়ী গৌরহরি, গৌরহরির বোন ও বিনোদিনীর বাল্যসখী ললিতা ও তার স্বামী রসময়। এরা ছাড়াও ছোট বাবাজী সহ বড় বাবাজীর শ্রাদ্ধকার্যে আসা ও গৌরহরির আখড়ায় মহোৎসবে উপস্থিত মানুষজন এবং তমাললতা হল বৈষ্ণব চরিত্র। এছাড়াও কলেজে পড়া তারাপদ, সাতগাঁ-কাঞ্চনপুরের তামাকের লোভে রসময়ের আখড়ায় হাজির হওয়া ইংরেজি ইস্কুলে পড়া সুদাম ও রাধিকা, গ্রাম্য ওঝা, ডাক্তারের মত বেশ কিছু স্বতন্ত্র চরিত্রও এই উপন্যাস তিনটিতে আছে।

ঔপন্যাসিক নিজে মুর্শিদাবাদের এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মেছিলেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর গ্রামেই কেটেছিল। সুতরাং গ্রাম্য কৃষিজীবী মানুষ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। নিজের চোখে দেখা কৃষিজীবী মানুষদেরই তিনি এই উপন্যাসে কৃষক চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এজন্য তিনি হারান, সদানন্দ, নিতাইপদ, বৃন্দাবন, রসিক পালের মত গ্রাম্য কৃষকদের যথার্থভাবেই এঁকেছেন। এদের কথাবার্তা,

আলাপ-আলোচনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই কৃষিকাজকে ভিত্তি করেই এগিয়েছে। নায়িকা বিনোদিনী ও তার বৌদি নয়নতারা যথার্থই কৃষকবধূ রূপে অঙ্কিত। বাংলার প্রায় সমস্ত কৃষকবধূর মত এদের জীবন পরিক্রমাও স্বামী, সন্তান, সংসারের মঙ্গল কামনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য রসময়ের আখড়ায় থাকার সময় অথবা দাদার সংসারে থাকার সময় এক মুহূর্তের জন্যেও বিনোদিনী তার সংসারের চিন্তা ত্যাগ করতে পারে নি। তবে কৃষক পরিবারের এই চরিত্রগুলি চিত্রণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক পারদর্শিতা দেখালেও সেই অর্থে অভিনবত্ব আনতে পারেন নি। তারাপদ, গ্রাম্য ওঝা, ইংরেজি ইস্কুলে পড়া ছাত্রদ্বয়, ডাক্তারের মত চরিত্রগুলি গতানুগতিক চরিত্ররূপেই চিত্রিত। তবে তিনি অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন গৌরহরি, রসময়, ললিতা, ছোট বাবাজী, কমললতা, বড় বাবাজীর শ্রাদ্ধসভায় এবং গৌরহরির আখড়ায় উপস্থিত হওয়া বৈষ্ণব সমাজের নানা ধরনের নরনারীর চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে। শোনা যায় তাঁর এইসকল বৈষ্ণব চরিত্র চিত্রণ দক্ষতা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ঔপন্যাসিক নিজ স্বীকারোক্তিতেই জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের অঞ্চলটা বৈষ্ণব প্রধান এবং তাঁরা বৈষ্ণব পদকর্তা যদুনন্দন দাসের বংশধর। ফলে তাঁর দেহেও আছে বৈষ্ণবীয় রক্ত। হয়তো এই কারণেই তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষগুলি অত্যন্ত জীবন্তভাবে স্থান পেয়েছে। এসব ছাড়াও তিনি এখানে মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তে বয়ে চলা ময়ূরাক্ষী নদী এবং তার তীরের প্রকৃতিকেও চরিত্রায়ন করেছেন। ময়ূরাক্ষীর প্রকৃতিই যেন নায়িকা বিনোদিনীর মানসিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। ময়ূরাক্ষীর মতই কখনো সে সুজলা-সুফলার অবতার নিয়ে সংসার জীবনকে ভরিয়ে দিয়েছে, কখনো গ্রীষ্মের শুষ্কতায় নিজের জীবনে হাহাকার ডেকে এনেছে, আবার কখনো বা দু'কূল প্লাবী বানে নিজে তো ভেসেছেই, তার আপাত সুখী সংসারকেও ভাসিয়ে দিয়েছে। এজন্য এই ট্রিলজিতেও মূল জনসমাজ থেকে আপাত বিচ্ছিন্ন একটি বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার গ্রাম্য প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে।

এগুলি ছাড়াও এই ট্রিলজির অন্তর্গত উপন্যাস তিনটিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে এখানে মূলত দু'ধরনের চরিত্র আছে — কৃষক শ্রেণির চরিত্র এবং বৈষ্ণব চরিত্র। ঔপন্যাসিক

শুধু এই দু'ধরনের চরিত্র চিত্রণ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি — তাদের জীবনের বিস্তারিত ছবিও প্রকাশ করেছেন। ফলে আমরা চাষিজীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, লোককথা, অন্ধবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষারীতির পাশাপাশি এখানে বৈষ্ণব সমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষারীতি সহ অনাড়ম্বর মাধুর্যময় জীবনের ছবিও পাই।

এই উপন্যাস তিনটিতে ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী মূর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তের বিশেষ অঞ্চলটির কৃষকসমাজের বাস্তব ও জীবন্ত ছবি উঠে এসেছে। ফলে চাষবাসের খুঁটি-নাটি বিবরণসহ এর সঙ্গে যুক্ত গ্রাম্য-দলাদলি, পরশ্রী-কাতরতা, কুৎসা-রটনা, গ্রাম্য লোককথা, পুষ্কর মেঘের বৃত্তান্ত, ছড়া-প্রবাদ, ডাক-খনার বচন, বৃষ্টি নামাতে ব্যাঙের বিয়ে, ওঝা দ্বারা ভূত তাড়ানো, বাস্তু সাপ জনিত গ্রাম্য সংস্কার প্রভৃতির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে যথার্থ আঞ্চলিক পরিবেশও ঔপন্যাসিক গড়ে তুলেছেন। ঐ অঞ্চলে একটি ছড়া প্রচলিত ছিল —

''যদি বর্ষে ফুনি ফুনি
বাঁশের ডগায় শোল পৌনি।
যদি বর্ষে ছিটে ফোটা,
তবে জানবে বর্ষা গোটা।
যদি বর্ষে মুষলধারে,
মাঝ দরিয়ায় বগা চরে।''[৭৯]

হারান এই ছড়াটির মর্মকথা জানতো, তাই বর্ষার শুরুতে মুষলধারে বৃষ্টি দেখে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। তবে সদানন্দের কাছে 'পুষ্কর মেঘ'-এর গল্প শুনে তার আশংকা অনেকটাই কমে গেছে। গ্রাম্য মানুষকে নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। এই উপন্যাসে 'ডাইনি বুড়ির গল্প', ওঝা দিয়ে ভূত তাড়ানোর ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সেসবের ছবিও আঁকা হয়েছে। এছাড়াও অনাবৃষ্টির কারণ হিসেবে হারান মনে করেছে —

''চত্রি মাসে পাঁচ শনি,
লরের মাংস না খায় শকুনি।''[৮০]

এই অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করেছে। এই বিয়েতে বিয়ে সংক্রান্ত নানা লৌকিকতা পালনের পাশাপাশি গ্রাম্য ছড়াও গাওয়া হয়েছে। যেদিন ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই রাতেই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। হারানের বাস্তু সাপ মারা যাওয়া এবং সেই কারণে প্রায়শ্চিত্ত করার মধ্য দিয়ে গ্রাম্য সংস্কারের আর একটি দিকও এই উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিসপত্রের মধ্যে এখানে 'তালপাতার তালাই', 'বসার চাটাই', 'গাই দোয়ার কেঁড়ে', 'মাছধরার ঘাটজাল', 'তেল রাখার চোঙ' প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে এখানে ঔপন্যাসিক গ্রাম্য পাঠশালা, মাইনর স্কুল, ইংরেজি বোর্ডিং স্কুলের উল্লেখ করেছেন। চাষিঘরের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করত না বললেই চলে। অবশ্য কেউ কেউ গ্রামের পাঠশালা ও মাইনর স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে শহরে কলেজে পড়তে যেত। এখানে গ্রাম্য ছেলে তারাপদ তা করেছে। তবে একে গ্রামের মানুষ বিলাসিতাই মনে করত। এজন্য তারাপদের পিতা সদানন্দকে নানা কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। কেউ কেউ নিজেদের ছেলেকে দূরের গ্রামে ইংরেজি বোর্ডিং ইস্কুলে রেখেও পড়াত। সুদাম এবং রাধিকা — এই রকম দুইজন বোর্ডিং ইস্কুলে পড়া ছাত্র। ঐ অঞ্চলে পয়সার বদলে বিনিময় ব্যবস্থাও যে চালু ছিল তাও এখানে দেখানো হয়েছে।

ঐ অঞ্চলের মানুষজনের খাদ্যতালিকা ও খাদ্যাভ্যাসের পরিচয়ও এই ট্রিলজিতে আছে। প্রাতঃরাশ হিসেবে মুড়ির চলই ছিল। তবে এর সঙ্গে শশা, কাঁচা লঙ্কা, গুড়, দই প্রভৃতি খাবার যুক্ত হত। হারানের প্রাতরাশের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বিনোদিনী একটা বড় জামবাটিতে করে একবাটি মুড়ি, তার ধারে দু কুচি শশা, একটা কাঁচা লঙ্কা, একটা বাটিতে একবাটি গুড় আর একবাটি দই তার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল।''[৮১] বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্ব এলে খাবারে নতুনত্ব যোগ হত। তাই বিনোদিনী প্রদত্ত রসময়-ললিতার জলখাবারের তালিকায় দেখা যায় — ''চিড়ে ভাজা, ছোলা ভাজা, নারকেল, আদার কুচি, কাঁচা লঙ্কা, শশা, বড় জামবাটিতে বাটিভরা মুড়ি, গুড়, দই।''[৮২] প্রধান খাবারের তালিকায় গরম ভাত, পান্তা ভাত, পেঁয়াজ দিয়ে কলাই বাটা, শাক, টক দিয়ে মাছের ঝোল প্রভৃতি ছিল।

তামাক পুরুষদের কাছে অত্যন্ত আবশ্যকীয় ছিল — ''এখানে তামাক খাওয়াটা ভাত-মুড়ির মত একটা খাদ্য।''[৮৩]

উপন্যাস তিনটির কৃষক পরিবারের লোকেরা সাধারণ চলিত ভাষায় কথা বললেও তাদের কথায় অনেক আঞ্চলিক শব্দ ঢুকে গেছে। 'ভগমান', 'গোবর সানতে বসা', 'গরু পিইয়ে যাওয়া', 'মাছ ধরে ভুট্টি নাশ করা' প্রভৃতি এইরকম আঞ্চলিক শব্দ। শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য মহাশয় সরোজকুমারের এই চাষি সংলাপ রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জানিয়েছেন — ''চাষি সংলাপে তিনি (সরোজ) . . . শরৎচন্দ্র ও তারাশংকরের চাইতে (তাঁদের অন্য অনেক কৃতিত্ব সত্ত্বেও) অধিকতর দক্ষ এবং সে-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতর বলেই মনে হয়। তাছাড়া চাষিদের জীবন দর্শন সম্পর্কেও সরোজকুমার পূর্বসূরীর চাইতে বেশি ওয়াকিবহাল।''[৮৪]

এইভাবে ঔপন্যাসিক তাঁর 'নতুনফসল' ট্রিলজিতে চাষিদের জীবনচর্যার বিবরণ তুলে ধরে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করেছেন। তবে শুধু চাষিদের জীবন চিত্রণের জন্য নয়, এখানে মূলত সেই অঞ্চলের বৈষ্ণবদের অত্যন্ত বাস্তবসম্মত জীবনচর্যার ছবি আঁকার কারণেই তাঁকে বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার তারাশঙ্করের 'সমানধর্মা' বলা হয়। এই উপন্যাস ত্রয়ীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষজনের জীবনচর্যার যথার্থ প্রকাশ ঘটার কারণেই অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এদের আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে চেয়েছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থক উদাহরণ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী' গোষ্ঠীভুক্ত তিনটি উপন্যাস : 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' (১৯৩৮)। রাঢ়-বাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিতে বিধৃত বৈষ্ণব সমাজের কাহিনী এই উপন্যাস ত্রয়ী। বৈষ্ণব সমাজের স্বাধীন স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত নরনারীর জীবন কাহিনী এখানে চিত্রিত হয়েছে।''[৮৫] একথা সত্যি যে, ঔপন্যাসিক এগুলিতে রাঢ়ের বৈষ্ণবীয় জীবনধারার অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। তিনি বৈষ্ণব জীবনের সহজ, নির্লিপ্ত, নৈতিকতার প্রভাবমুক্ত জীবন-মাধুর্য প্রকাশ করতে ঔপন্যাসিক কুণ্ঠিত হননি। উপন্যাসগুলিতে গৌরহরি, রসময়, ললিতারা নিজেদের গানের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কারের বাধাবন্ধনহীন মুক্ত জীবনের আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে জীবনপথে এগিয়ে চলেছে — গানের

মধ্য দিয়েই এরা যেন জীবনে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, হৃদয়-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন ভুলে থাকতে চায়। মনের টানে এই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা জোড় বেধে আখড়া তৈরি করে বসবাস করলেও কেউ কারো প্রতি অহেতুক অসপত্ন অধিকার ফলাতে যায় না। এজন্য অনায়াসেই ললিতা তার আপাত সচ্ছল স্বামীগৃহ ত্যাগ করে 'মনের মানুষ' রসময়ের সঙ্গে 'কণ্ঠিবদল' করে একসঙ্গে যেমন বাস করতে পারে, তেমনি রসময়ের অগোচরে তারাপদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। অনুরূপভাবে গৌরহরিও তার বাল্যপ্রেমকে কলঙ্কিত করার জন্য বিন্দুমাত্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় না — বিনোদিনীকে কলঙ্কিত করে ত্যাগ করার পর, গৌরহরি তার নৈতিক স্খলনের চেয়ে দীর্ঘদিনের বিমূঢ়তার জন্য বেশি কষ্ট অনুভব করেছে। এরা 'মনের মানুষ'-এর সঙ্গে 'কণ্ঠিবদল' করে সংসার করার জন্য নয় — সাধনার সঙ্গী হিসেবে কাছে পাবার জন্য। তাই ললিতা-রসময় বা গৌরহরিরা জীবনের যে কোন পিছুটানকে কাটিয়ে উঠে আপন সাধনায় ডুবে যেতে পারে। তারা মনের আনন্দে গান বাধে, সেই গান গেয়ে লোকের দরজায় ভিক্ষা করে। এতে যা জোটে, তা দিয়েই দিনাতিপাত করে। সঞ্চয়ের বা ভবিষ্যতের কোন চিন্তা এদের মধ্যে থাকে না — এমনকী পরদিন কী করে চলবে, তা নিয়েও এরা খুব বেশি ভাবিত নয়। এদের কথাবার্তায় সর্বদা বৈষ্ণবীয় বিনয় থাকে। অনেক সময় বিভিন্ন বৈষ্ণব পদ গেয়ে এরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে। এই বৈষ্ণবীয় জীবন ধারার প্রকাশই এই ট্রিলজির অভিনবত্বের দিক। চাষিজীবনের বর্ণনা তো বটেই, এই বৈষ্ণবীয় জীবনের আন্তরিক প্রকাশই এই ট্রিলজিকে মূল ধারার বাংলা উপন্যাস থেকে বের করে এনে আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী যখন সরোজকুমারের সমালোচনা করে কিছু কথা বলেন, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে সে সব কথা মেনে নেওয়াও যায় না। তিনি বলেছেন — ''তারাশঙ্করের সঙ্গে সরোজকুমারের সমতুলনীয়তা আমাদের সাহিত্যভাবনায় প্রবাদ-প্রতিম হয়ে পড়েছে। অথচ সবটুকুই সকারণ নয়। সরোজকুমারের সর্বাপেক্ষা পরিচিত উপন্যাস-ত্রয়ী — ট্রিলজি — 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৩৬), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭) আর 'সোমলতা' (১৯৩৮) একত্রে 'নুতনফসল' নামে পরিচিত। এই উপন্যাসগুচ্ছ নিয়েই তারাশঙ্করের সগোত্রতার কথা পুনঃপুন উচ্চারিত হয়ে থাকে। তিনটি খণ্ড জুড়ে

গ্রাম্যজীবনের নিবিড়-গভীর কাহিনী। কমলপুর গ্রামে 'ভদ্রলোক' এক ঘরও নেই; সবাই চাষা — নিজের হাতে জমি চাষ করে। আর বৈষ্ণব বৈরাগীর আখড়া। এই খড় মাটি নিয়ে কেবল গল্পের কাঠামো নয়, বিচিত্র-বিসর্পিল গতিময় জীবনের পূর্ণ প্রতিমাও গড়া। একই গ্রামীণতার প্রসঙ্গে অঞ্চল-পরিবদ্ধতার কথাও আসে। বীরভূমের সংলগ্ন 'পশ্চিম মুর্শিদাবাদ'-এর গ্রামাঞ্চল যেন চাকলা বেঁধে উঠে এসেছে গল্পের পরিসরে। তাহলেও সরোজকুমারের কাহিনী 'আঞ্চলিক' নয় অবশ্যই, যে-অর্থে তারাশঙ্করের। প্রকৃতি-চকিত গ্রামজীবনের প্রতি শিল্পীর কবিতা-স্নিগ্ধ প্রীতির অনুভবে বিভূতিভূষণের কথাও মনে আসতে পারে। তাহলেও তারাশঙ্করের অতি-সচেতন বর্ণাঢ্যতা কিংবা বিভূতিভূষণের অতি উদ্বেলতা তার নিরুচ্চার উপলব্ধিতে অনুপস্থিত।''[৮৬] এর যথার্থ উত্তর দিতে আমাদের অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্মরণাপন্ন হতে হয় — ''লেখকের একটি বিশেষ গুণ এই যে, চরিত্র পরিকল্পনায় ও মন্তব্য-প্রকাশে তিনি কোথাও সংযম ও পরিমিতিবোধ হারান নাই। আধুনিক উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব — over-emphasis বা সুর চড়াইবার প্রবণতা। ইহার চরিত্রগুলি সর্বদাই বিস্ফোরণের (explosion) সীমান্তে দণ্ডায়মান, বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়িবার ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রধূমিত। লেখকের মন্তব্য-বিশ্লেষণও যেন পাঠককে বধির ভাবিয়া লইয়া তাহার কর্ণে অবিমিশ্র উচ্চ চিৎকার। সর্বত্র অস্বাভাবিক তীব্র গতিবেগ, পরিবর্তনের ঘুর্ণিবায়ু, ভূমিকম্পের ভারকেন্দ্রচ্যুত বিপর্যয়, ভাব-বিলাসের অনিশ্চিত বাষ্পাকুলতা। এই সাধারণ প্রবণতার মধ্যে সরোজকুমার একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। তাঁহার উপন্যাস খুব গভীর বা জটিল নয়, কিন্তু ইহার মধ্যে একটি মৃদু, শান্ত সত্যপ্রিয়তা বর্তমান। বাংলার কৃষক-প্রধান পল্লীজীবনের যে ব্রতপার্বন উৎসবে চাষার আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ উথলিয়া পড়ে, কৃষিকার্যের বিভিন্ন স্তরকে আশ্রয় করিয়া তাহার মনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভক্তি-বিশ্বাসের মৃদু কম্পন দোলা দেয় লেখক তাহা কোনরূপ অতিরঞ্জন না করিয়া, খুব সহজ ভাবে আঁকিয়াছেন।''[৮৭] উপন্যাসটি সম্পর্কে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন — ''শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার তিনখানি উপন্যাস বা উপন্যাস-ত্রয়ীতে (ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী, সোমলতা) যে সৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাহাও অনন্যসুলভ। ইহাতে যেমন

একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমাজের জীবনালেখ্য অপূর্ব কলানৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনই সেই সমাজের অন্তরে পূর্ণ প্রবেশ করিবার যে মহানুভব শক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহাও একটি উৎকৃষ্ট কবিশক্তি। যে ভূমি, যে প্রতিবেশ ও যে সংস্কৃতির পটভূমিকায় তিনি জীবনের এই নতুন রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে যে কত বাস্তব তাহা অনুভব করি তাহার স্টাইলে — ভাষার অতিশয় সংক্ষিপ্ত সরলতায়, ভাবালুতার সতর্ক সংযমে।''[৮৮]

বিশিষ্ট সমালোচক সমরেশ মজুমদার 'নতুনফসল' ট্রিলজির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন — ''নতুনফসলে'র ট্রিলজি অর্থাৎ 'ময়ূরাক্ষী'-'গৃহকপোতী'-'সোমলতা' বৈষ্ণব জীবনের সহজ সারল্যে মণ্ডিত সেই জীবন বিন্যাস যা পশ্চিম দৃষ্টিবাদীদের স্নিগ্ধ শ্যামল মাটির গন্ধে ভরপুর। এখানেই তার আঞ্চলিকতার বন্ধন। ময়ূরাক্ষী তীরস্থ গ্রামীণ জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন সরোজকুমার। বাউল জীবনের সঙ্গে নিকট পরিচয়ে অচ্ছেদ্য লেখক, বাউল জীবনে নিভৃত মুহূর্তগুলি তুলে ধরেছেন। এখানকার কৃষক জীবনের উপাদান উপাচারে সজ্জিত করেছেন উপন্যাস শরীরকে, এখানে আছে গ্রামের কলহ উৎসব লৌকিক অলৌকিকতা, তিনটি খন্ডে বিন্যস্ত 'নতুনফসল' চাষি জীবনের গৃহাঙ্গণকে সম্প্রসারিত করেছেন লেখক। পথের দুধারে বৈষ্ণবের আখড়ার দুয়োর পর্যন্ত, যেখানে মিশেছে আসক্তি বিজড়িত মায়ার সংসার ও নির্লিপ্ত বাউলের উদাস বৈরাগ্য — এ দুয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন সরোজকুমার।''[৮৯] তিনি এখানেই না থেমে আরও বলেছেন — ''পশ্চিম মুর্শিদাবাদের এক ধরনের বাউল-সমাজের জীবন যাপন, জীবনচর্যা, অপরাপর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, সামগ্রিকভাবে জীবন সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা বিমুক্ত হয়ে একটি অঞ্চল একটি অনন্য অনুভূতির সূত্রে গ্রথিত হয়েছে, সরোজকুমার সাবলীল ভঙ্গিতে সেই জীবনস্বরূপ, গাথা সংযোজিত করে বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিধি যেমন বিস্তৃত করে দিয়েছেন, তেমনি একটি আঞ্চলিকতাবদ্ধ ইতিহাস রচনা করে দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।''[৯০]

সরোজকুমারের উপন্যাস তিনটির মূল্যায়নে বলা যায় যে, এই উপন্যাসগুলি হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির উপন্যাসগুলির মধ্যে পড়ে না, তবে উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন

ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী বীরভূম সংলগ্ন পশ্চিম মুর্শিদাবাদের একটি বিশেষ অঞ্চল এবং সেখানকার কৃষিজীবী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ জনের জীবনচর্যা অর্থাৎ রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, লোকসংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশিষ্ট ভাষারীতি প্রভৃতির পরিচয় আছে। এগুলি যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' এবং 'সোমলতা'কে সার্থকতার মাপকাঠিতে না ফেলেও আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করাই যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)-এর **'আরণ্যক'** উপন্যাসটি ভাগলপুরের অদূরে অবস্থিত ফুলকিয়া, নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য প্রকৃতি ও মানুষের জীবনচিত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এর বিজ্ঞাপন অংশে বলা হয়েছে — ''আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।''[৯১] ঔপন্যাসিক কর্মজীবনে পাথুরিয়াঘাটার বিস্তৃত জমিদারী এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে তাদের ভাগলপুরের জমিদারীতে কার্যোপলক্ষে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। এইসময় কাজের সুবাদেই তাঁকে ভাগলপুরের অদূরে বন জঙ্গল পরিহিত অঞ্চলে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। তখন তিনি যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেগুলির ভিত্তিতে এই উপন্যাসটি রচনা করেন। অবশ্য ভাগলপুরের সেই বনাঞ্চলে কাটানোর সময়েই তাঁর মাথায় ভাবনা আসে যে, এই অঞ্চলটিকে শিল্পিত রূপ দিতে হবে। এ সম্পর্কে তিনি 'স্মৃতির রেখা'য় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারীতে জানিয়েছেন — ''এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখব — একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি।''[৯২] সম্ভবত এই ভাবনাকেই বাস্তবরূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি এই উপন্যাসটি লেখেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাশ বলেছেন — ''কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণ কিছুকাল ভাগলপুর নিকটবর্তী এক বনাঞ্চলে থাকতেন। সেই বনভূমি ও তার সঙ্গে যুক্ত অজস্র মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শের অভিজ্ঞতাই এই কাহিনীর ভিত্তিভূমি।''[৯৩] আর অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের

মতে — ''মাঝে গোরক্ষিণী সভার ভ্রাম্যমাণ প্রচারক রূপে বাংলা আসাম ত্রিপুরা ও আরাকান অঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং খেলাত ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রূপে ভাগলপুর সার্কেল-এ কিছুকাল কাজ করেন। এই দুই ভিন্ন বৃত্তির অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে 'অভিযাত্রিক' ও 'আরণ্যক' গ্রন্থে।''[৯৪] তাই এটা মানতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাস তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল।

এই উপন্যাসটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেকালে তো বটেই, একালেও স্বকীয়তার দাবী রাখে। এই ধরনের উপন্যাস শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও খুব কম লেখা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাসের অনুপস্থিতির দিকে লক্ষ রেখেই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই ; ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।''[৯৫] বর্তমান বিহারের ভাগলপুর এবং তৎসংলগ্ন বনভূমি অঞ্চল ও সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যা বিভূতিভূষণের মনে যে প্রভাব ফেলেছিল, তারই ফলশ্রুতি হল এই উপন্যাস। এখানে ঔপন্যাসিক সত্যচরণ নামক একজনের আত্মকথনের মাধ্যমে যেন নিজের অতীত স্মৃতিচারণায় ডুবে গেছেন। সত্যচরণই সমগ্র উপন্যাসের কথক। কলকাতায় কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেই নিজের অতীতের কর্মজীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে এই উপন্যাসের অবতারণা করেছে। এখানে আনুপূর্বিক কোনো কাহিনি নেই; কিন্তু একটার পর একটা টুকরো টুকরো ঘটনার সাহায্যে ভাগলপুরের অদূরের আজমাবাদ, ইস্‌মাইলপুর, ফুলকিয়া, নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া থেকে মহালিখা পাহাড় ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তদেশ পর্যন্ত অঞ্চলগুলির অরণ্যপ্রকৃতি এবং মানুষজনের জীবন্ত ছবি উঠে এসেছে। সত্যচরণের আত্মকথা থেকেই জানা যায় যে, সে একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে নদীর চর থেকে জেগে ওঠা বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘা জমির প্রজাবিলি করার জন্য ঐ অঞ্চলে যায়। সে যখন সেখানে যায়, তখন অঞ্চলটি ছোট বড় নানা উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন ধরনের পশু পাখিদের বসবাসের কারণে বনভূমি হয়ে উঠেছিল। প্রায় জনমানবহীন এই অঞ্চলটিতে রাতের বেলা তো বটেই, দিনের বেলাতেই পথ চলতে ভয় করত। তবে পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই সে ঐ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত জমি প্রজাবিলি করে

এলাকাটিকে জনবহুল করে তোলে। প্রকৃতিপ্রেমী সত্যচরণ বনভূমিকে ভালোবাসলেও তার হাতেই সেখানকার বনভূমি বিনষ্ট হয়। কীভাবে এই সময়কালের মধ্যে ঐ অঞ্চলে অবস্থান করে তার দ্বারা এই বনভূমি বিনষ্ট হয়েছিল, সে সব নানা ঘটনার বিবরণই সত্যচরণ নিজের আত্মকথনে বিবৃত করেছে। ফলে উপন্যাসটিতে সেই অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা টুকরো টুকরো ঘটনা, কাহিনি এবং অসংখ্য চরিত্র স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি প্রকৃতিপ্রেমিক ঔপন্যাসিক সময় ও সুযোগ পেলেই সত্যচরণের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসার পরিচয় দিয়ে অনেকবার প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় উদ্যোগী হয়েছেন। ফলে সমস্ত কিছুর মিশ্রণে 'আরণ্যক' উপন্যাসটিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যে, উপন্যাসটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় ঢুকে পড়ে।

এই উপন্যাসে কার্যকারণ পরম্পরাসূত্রে গ্রথিত আনুপূর্বিক কোন কাহিনি নেই — যা আছে তা হল কথক সত্যচরণের অভিজ্ঞতাজাত বিভিন্ন ঘটনার টুকরো টুকরো ছবি। এজন্য 'আরণ্যক'কে উপন্যাস বলা যায় কি না তা নিয়েই পণ্ডিত-সমালোচক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অনেকে একে 'দিনলিপি' বা 'প্রতিবেদন' অথবা 'ভ্রমণ কাহিনি' বলতে চান। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে — '' . . . 'আরণ্যক' সেই কল্পলোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে — উপন্যাস।''[৯৬] তবুও 'আরণ্যক'-এর উপন্যাস হওয়া, না হওয়া নিয়ে সমলোচক মহলে প্রশ্ন থেকেই গেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন — '' . . . উপন্যাস বলতে সাধারণত যা বুঝে থাকি — সমাজ মধ্যগত মানুষের জীবনের একটা যথাসম্ভব সামগ্রিক চেহারা, তা আমরা আরণ্যকে পাই না। আরণ্যকে পাই কয়েকটি কাটা কাটা সুন্দর ছবি। উপন্যাস চলমান জীবনের রূপ — কার্যকারণ-প্রবাহে বাহিত চলমান রূপ। আরণ্যক যেন কম বেশি স্থিরচিত্রের অ্যালবাম।''[৯৭] তবে এই সমালোচনা যুক্তির ধোপে টেকে না। কারণ অনেক বিদগ্ধ সমালোচকই 'আরণ্যক'কে উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। এদের মধ্যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পড়েন। তিনি 'আরণ্যক' সংক্রান্ত আলোচনায় খুব সংক্ষেপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন — ''আরণ্যক উপন্যাস। অবশ্যই উপন্যাস।''[৯৮] তবে সেই সঙ্গে এর শ্রেণীবিচারের

ক্ষেত্রে তিনিও সংশয়ে পড়েছেন — '' . . . তার আগে এটাকে কোনো সামাজিক উপন্যাসের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না।''[৯৯] শুধু তিনি একা নন; তাঁর মত অনেকেই এর শ্রেণী নির্ণয় করতে বসে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এজন্য উপন্যাসটির আলোচনায় আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ আসে। অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের গোচরে এই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণ থাকার বিষয়টি এসেছে — ''অরণ্য জীবনের সমাজ-সংস্কৃতির একটা সমগ্র রূপের আভাসও 'আরণ্যকে' আছে। বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, রীতি-নীতি, মানবিক সম্পর্কের আকর্ষণ ও ঘৃণা, প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা ও প্রকাশ্য শোষণ, দারিদ্র্য ও অসহায়তা, আরণ্যক সমাজের শ্রেণিগত পরিচয় — জমিদার, জোতদার, মহাজন, প্রজা, ভূমিহীন ও যাযাবর শ্রেণি চাষি-মজুরদের সঙ্গে বাঘ ভালুক হাতি নীলগাই হায়নার আনাগোনা, লৌকিক সংস্কার ও অলৌকিক অপদেবতা বা জিন্-এর সঙ্গে মিশে থাকা ও পার্থিব প্রাকৃতিক রূপ ও ভয়ঙ্কর সৃষ্টি ছাড়া রূপের রহস্যময়তা — সব মিলে-মিশে 'আরণ্যক' এক প্রাকৃতিক মহাকাব্য। . . . আরণ্যকে সংস্কৃতির এই সার্বিক রূপটি জীবন্ত আঞ্চলিক সত্তা হিসেবে একালের পাঠককেও আকৃষ্ট করতে বাধ্য।''[১০০]

আগেই বলা হয়েছে যে, এই উপন্যাসে পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত কোন আনুপূর্বিক কাহিনি নেই; এখানে যা আছে, তা হল উপন্যাসের কথক সত্যচরণের অভিজ্ঞতাজাত বিভিন্ন টুকরো টুকরো ঘটনা বা কাহিনির বিবরণ। তবে এই টুকরো টুকরো ঘটনা বা কাহিনিগুলি একত্রে জুড়ে দিলে আমরা যে সামগ্রিক চিত্রটি পাই তা হল, ভাগলপুরের অদূরে আজমাবাদ, ইস্মাইলপুর, ফুলকিয়া, নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া থেকে মহালিখা পাহাড় ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তদেশ পর্যন্ত অঞ্চলগুলির অরণ্যপ্রকৃতি এবং মানুষজনের জীবন্ত ছবি। এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটিকে প্রেক্ষাপট করেই ঔপন্যাসিক তাঁর কথক সত্যচরণের কথনে সমগ্র উপন্যাসটিকে উপস্থাপন করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপন্যাসের এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটি দীর্ঘদিন থেকেই মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। উপন্যাসটির সর্বত্র এই বিচ্ছিন্নতার চিত্র আছে। এজন্য কলকাতার সভ্য সমাজে লালিত-পালিত সত্যচরণ কার্যোপলক্ষে সেখানে গেলেও প্রথমদিকে কিছুতেই ঐ

অঞ্চলটিকে হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছিল না। পরে অবশ্য সে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলটিকে ভালোবেসে ফেলে এবং তার জন্য আলাদা টান অনুভব করে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ, কারণ অঞ্চলটিকে ভালোবাসার পাশাপাশি সত্যচরণ সেখানকার অরণ্য প্রকৃতিকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তার হাতেই সেই অরণ্য প্রকৃতি বিনষ্ট হয় — সে-ই ঐ অঞ্চলে অরণ্য উচ্ছেদ করে প্রজা বসিয়ে তাকে জনবসতিপূর্ণ করে তোলে। এভাবে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক পটভূমি বিকাশ লাভ করেছে। অবশ্য মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত যে কোনো উপন্যাসই আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় স্থান পায় না — এর সঙ্গে ঐ উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের জীবনচর্যা অর্থাৎ তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন-জীবিকা, সংস্কার-বিশ্বাস, লোকাচার-লোকবিশ্বাস-লোককথা-লোকসংস্কৃতি, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশিষ্ট ভাষারীতি প্রভৃতির সংমিশ্রণে একটা 'আঞ্চলিক রঙ্' ফুটিয়ে তুলতে হয়।

'আরণ্যক' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণের দিকে নজর দিলে সবার আগে সত্যচরণের কথাই মনে আসে, কারণ সে-ই এই উপন্যাসের কথক। তবে সত্যচরণ যে 'আরণ্যক'-এর নায়ক নয়, এটা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে — ''আরণ্যক উপন্যাসে দেখেছি, বেশিটাই স্থিরচিত্র, সেখানে প্রতিবেশই প্রধান, উত্তর বিহারের অরণ্যভূমিই যেন নায়ক, সত্যচরণ শুধু দর্শক।''[১০১] উপন্যাসে গৃহীত অরণ্য প্রকৃতি এখানে নায়কের স্থান দখল করেছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অরণ্য প্রকৃতিকে নায়িকা হিসেবে মেনে নিয়ে তাকে রাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সেখানকার মানুষজনকে তার সভাসদ্ বলে মন্তব্য করেছেন — ''এই আরণ্য রাজসভার সভাসদ্গুলি নামে ও কার্যে, ব্যবহারে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রতিবেশের সহিত একসুরে বাধা — উদার, অনাসক্ত নিস্পৃহতার ভাবমণ্ডলবেষ্টিত। কবি বেঙ্কটেশ্বর, অধ্যাপক মটুকনাথ, উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্, সৌন্দর্যপিয়াসী যুগলপ্রসাদ, সাঁওতাল-রাজ দোবরু পান্না ও তাঁহার প্রপৌত্রী, নিজ সরল পবিত্র হৃদয়ের খাঁটি আভিজাত্যে গৌরবময়ী তরুণী ভানুমতী, স্বভাবশিল্পী, নৃত্যবিশারদ ধাতুরিয়া — সকলের উপরেই আরণ্য

মহিমার রাজচ্ছত্র প্রসারিত। অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত জনসাধারণও — রাজুপাঁড়ে, জয়পাল কুমার, কুন্তা রাজপুতানী, গনোরী তেওয়ারী, নকছেদী-তুলসী-মঞ্চী, গিরিধারীলাল প্রভৃতি — বনস্পতির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ঝোপজঙ্গলের মত — এই আরণ্য পরিমণ্ডলের সহিত চমৎকার মিশিয়া গিয়াছে। এমন কী বাঙালি ডাক্তার রাখালবাবুর বিধবা স্ত্রী, বিহার-প্রবাসী দরিদ্র বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ধ্রুবা, জবা — ইহারাও বাঙালি সমাজের বহু শতাব্দীর সাধনালব্ধ সংস্কার হারাইয়া এই অরণ্য সমাজের আভিজাত্যগৌরবহীন, শ্রমকর্কশ জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াছে।''[১০২] এখানে তিনি যাদের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির ভূমিপুত্র নয় — বহিরাগত; কাজের সূত্রে বা জমি পাবার লোভে সেই অরণ্য ভূমিতে এসে হাজির হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে এরা কেউ-ই সত্যচরণের মত বহিরাগত নয়, অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যসমাজের প্রতিনিধি নয়। এদের আচার-আচরণ ও জীবনযাপন পদ্ধতি অনেকটাই সেই অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না ও ধনঝরি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত তার রাজধানীর বাসিন্দারা, যাদের মধ্যে তরুণ যুবক জগরু এবং যুবতী রাজকন্যা ভানুমতীও ছিল। উপন্যাসে রাজা, রাজপরিবার, রাজধানী প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও এই সাঁওতালদের ঔপন্যাসিক হতদরিদ্র রূপেই চিত্রিত করেছেন। এরাই সেই অঞ্চলের ভূমিপুত্র। তাই সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''দোবরু পান্না অরণ্যভূমির আত্মা, 'আরণ্যক' উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক। দোবরু পান্না মর্যাদার প্রতীক।''[১০৩] সুতরাং এই উপন্যাসে এক সত্যচরণ বাদে সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই কমবেশি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

এই উপন্যাসে মূলত হিন্দু সংস্কৃতির বিবরণ আছে। ভাগলপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের হিন্দুধর্মের জাতপাত নির্ভর সমাজের ছবি এখানে স্থান পেয়েছে। এই সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক এখানে যে কয়েকটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল রাজপুত, ভূমিহার ব্রাহ্মণ, গঙ্গোতা প্রভৃতি। এছাড়াও এখানে আদিম অনার্য সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা আছে। এদের মধ্যে রাজপুতরাই সবথেকে ক্ষমতাশালী। এই উপন্যাসে দু'জন দুর্ধর্ষ রাজপুতের কার্যকলাপের উল্লেখ আছে —

নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিং। এছাড়াও কুন্তার স্বামী দেবী সিং-এর কথা পরোক্ষে এসেছে। এরা কারণে-অকারণে নিম্নবর্ণের গঙ্গোতা প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচার ও শোষণ চালায়, জমির উৎপন্ন ফসল গায়ের জোরে দখল করে নেয়, সর্বদা পায়ের নিচে রাখতে চায়; আর ধন সম্পদের গরমে উগ্র ও বন্য আভিজাত্যে মেতে থাকে। রাজু পাঁড়ে বা মটুকনাথের মত ভূমিহার ব্রাহ্মণদের এখানে গরীব মানুষ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। তবে এরাও ধর্মীয় কারণে নিম্নবর্ণের গঙ্গোতাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। অবশ্য এদের ধর্মীয় জীবনের বিস্তারিত পরিচয় এখানে নেই। তবে গঙ্গোতাসহ নিম্নবর্ণের প্রজাদের জীবন চর্যার বিস্তারিত ছবি এই উপন্যাসে আছে। এরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করলেও তাদের দুঃখের শেষ নেই। উচ্চবর্ণের জমিদার-মহাজনরা কারণে-অকারণে এদের উপর অত্যাচার করে, বঞ্চিত করে, ঠকায়। তীর্থক্ষেত্রেও এদের অধিকার দেওয়া হয় না। তাই মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে গঙ্গোতা যুবতী মঞ্চীকে ব্রাহ্মণ পাণ্ডার কাছে শুনতে হয় — ''গাঙ্গোতীনকে আমরা নাইতে দিই নে কুণ্ডের জলে, চলে যা।''[১০৪] এরপরেও জেদ করলে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয় এবং 'টেনে-হিঁচড়ে মারতে মারতে' সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই জাতপাতের কারণেই অসুস্থ বৃদ্ধ গিরিধারীলালের সেবার্থে উচ্চবর্ণের কেউ এগিয়ে আসে না।

এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রেক্ষিতে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐ অঞ্চলের নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণের উল্লেখও আছে। এখানে প্রধান দু'টি উৎসবের উল্লেখ আছে — দোল উৎসব এবং ছটপূজা। দোল উৎসবে কথক সত্যচরণ রাসবিহারি সিং রাজপুতের বাড়ি আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে বন্য প্রাচুর্য দেখে এসেছিল। ছট পূজা সে অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব। কথক ও রাজু পাঁড়ে এক ছটপূজার রাত্রে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সদ্য গড়ে ওঠা জনবসতিটির অনেক বাড়িতেই গিয়েছিল। ঐ অঞ্চলে হনুমানজীর পূজাও ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তাই সদ্য গড়ে ওঠা লোকালয়টির বিভিন্ন স্থানে হনুমানজীর মূর্তি বসতে দেখা যায়। আর আছে বুনো মহিষের দেবতা 'টাঁড়বারো'। এসবের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক সত্যচরণের জবানীতে সাঁওতালদের ধনঝরি পাহাড়ে আয়োজিত রাস উৎসবেরও সুন্দর বিবরণ এই উপন্যাসে দিয়েছেন। ফসল উঠার পর সেই অঞ্চলটিতে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এজন্য সদ্য গড়ে ওঠা সেই লোকালয়টিতে মেলা বসে। ঐ মেলায় নানা

ধরনের বিক্রেতার আবির্ভাব ঘটে। ক্রেতা মূলত ফসল কাটুনে মজুরের দল। নাচ-গানের আসর সেখানে বসে। এই সূত্রেই প্রৌঢ় দশরথের আবির্ভাব ঘটে, যে ননীচোরা নাটুয়া গেয়ে দর্শকদের বিনোদন করে নিজের জীবিকা অর্জন করে। নাচিয়ে বালক ধাতুরিয়ার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে প্রচলিত নাচের বিবরণ পাওয়া যায়। তার কাছ থেকেই জানা যায় যে, ওখানে 'ছক্করবাজি' নাচের খুব কদর। কবি বেষ্কটেশ্বরের মাধ্যমে এখানকার সাহিত্যচর্চার বিবরণও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও সে অঞ্চলের লোককথা-লোকবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত পরী, জিন প্রভৃতি অশুভ শক্তির কথাও এখানে আছে। বোমাইবুরুর জঙ্গলে এক মহিষ পালক বাপ-ছেলের করুণ কাহিনির মধ্যে দিয়ে জিনের অলৌকিক কাহিনিও এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। ফলে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষগুলির বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও সে সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান, লোককথা, লোকাচার, লোকসংস্কৃতির মত বিষয়গুলি এক আঞ্চলিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে উঠে এসেছে।

উপন্যাসটিতে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের খাদ্যতালিকা তথা খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ, শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থার বিবরণও উঠে এসেছে। নুন দিয়ে মকাই সিদ্ধ 'ঘাটো' ছিল সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষগুলির প্রধান খাবার। এছাড়াও চিনা ঘাসের দানা সিদ্ধ, বাথুয়া ও অন্যান্য শাক সেই অঞ্চলের সাধারণ গঙ্গোতা সম্প্রদায়ের মানুষগুলির খাদ্যতালিকায় থাকতে দেখা যায়। উচ্চশ্রেণির লোকেরা মকাই বা কলাইয়ের ছাতুর তাল বানিয়ে খায়। এদের বিলাসিতা বলতে ছিল খাবার পরে সুপুরি কেটে মুখে দেওয়া। এজন্য বাসনপত্রেরও তেমন বাড়বাড়ন্তের উল্লেখ এই উপন্যাসে নেই। মাটির হাড়িতে মকাই সিদ্ধ 'ঘাটো' রান্না করে পাতায় করে লবণ দিয়ে তা গরম গরম পরিবেশন করা হয়। থান কাপড়ের খুঁটে বা কোনো পাত্রে ছাতু মেখে ক্ষুধানিবারণ করেই এরা সন্তুষ্ট হয়। কালেভদ্রে ভাতের সঙ্গে এদের দেখা হয়। এজন্য সত্যচরণ লবটুলিয়ায় গেলে তার আসার খবর শুনে অনেকেই বিনা নিমন্ত্রণে শুধু ভাত খাবার জন্য বহুদূর থেকে এসে কাছারি বাড়িতে দু'দিন ধরে অপেক্ষা করে। এ সম্পর্কে পাটোয়ারী সত্যচরণকে জানিয়েছে — ''হুজুর, এরা বড় গরীব; ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান বিবেচনা করে। আপনি আসচেন, ভাত

খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে।''[১০৫] অবশ্য বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রিতের খাদ্যতালিকায় অনেক কিছুই থাকে। নন্দলাল ওঝার বাড়িতে কথক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গেলে সেখানে তাকে যেভাবে আপ্যায়ন করা হয় তার বর্ণনায় কথক বলেছে — ''প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা — সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতির কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া।''[১০৬] রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়িতে দোলের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়েও সত্যচরণ অনুরূপ খাদ্যতালিকার পরিচয় পায়। ছটপূজা উপলক্ষে সে অঞ্চলের একধরনের পিঠের উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে — ''শালপাতায় কয়েকখানি আটা ও গুড়ের পিঠে আসিল — এক-একখানি পিঠে এক ইঞ্চি পুরু ইটের মত শক্ত, ছুঁড়িয়া মারিলে মানুষ মরিয়া না গেলেও দস্তুর মত জখম হয়। অথচ প্রত্যেকখানা পিঠে ছাঁচে ফেলা চন্দ্রপুলির মত বেশ লতাপাতা কাটা। ছাঁচে ফেলিবার পরে তবে ঘিয়ে ভাজা হইয়াছে।''[১০৭] কুন্তা ছটপূজা উপলক্ষে সত্যচরণের জন্য এনেছিল — ''থালায় কয়েকখানি পিষ্টক, কিছু চিনি, দুটি কলা, একখণ্ড ঝুনা নারিকেল, একটা কলম্বা লেবু।''[১০৮]

সে অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। এদের চাহিদাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাই সত্যচরণের কাছারীর সিপাহী যখন তার কাছে একটি লোহার কড়া চায়, তখন এই চাওয়ার পিছনে যুক্তি দেয় — ''একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধা হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। . . . অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।''[১০৯] এখানকার মানুষগুলির পোশাক-আশাকে শৌখিনতা ছিল না বললেই চলে। লজ্জা নিবারণের জন্য এরা ঠিকমত পোশাক-আশাক জোটাতে পারে না — গ্রীষ্মকালে পুরুষদের উর্ধ্বাঙ্গ প্রায় আবরণহীন থাকে, নিম্নাঙ্গে এরা থান কাপড়ের খাটো ধুতি পরে। মেয়েরা শতছিন্ন দেহাতি কাপড় দিয়ে কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ করে। শীতকালে চাদর বা মেরজাই জাতীয় কিছু পরে এরা ভয়ঙ্কর শীতের মোকাবিলা করে। রাতের বেলা বাসস্থানের

পাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। অনেকেই মাথা বাদে শরীরের বাকি অংশ খোলা আকাশের নিচে শস্যের ভুসির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে শীত নিবারণ করে। বাসস্থান বলতে এই শ্রমজীবী মানুষগুলির তেমন কিছু ছিল না। এরা শুকনো কাশডাটা এবং সাবাই ঘাসের ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি করে পরিবার নিয়ে বসবাস করে। ঐ অঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষার চল ছিল না বললেই চলে। মটুকনাথ পাঁড়ে টোল খুললে সেখানে যে কয়েকজন ছাত্র জোটে, প্রায় সবাই খাবার লোভেই জোটে। অবশ্য রাজু পাঁড়ের মুখ থেকে শোনা যায় যে, সে শিক্ষালাভার্থে গুরুগৃহে গিয়েছিল। তবে গুরুকন্যার প্রেমে পড়ার কারণে তার আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থার হালও ছিল খুব খারাপ। মাঝে মাঝেই মহামারীর আক্রমণে প্রচুর লোক প্রাণ হারাত। রাজু পাঁড়ের টোটকা, আর কথকের হোমিওপ্যাথির চিকিৎসাই ছিল সাধারণ মানুষগুলির ভরসা। উপযুক্ত পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করানোও এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ডাক্তার রাখালবাবু দীর্ঘদিন সে অঞ্চলে ডাক্তারি করলেও বিশেষ কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি করতে পারেন নি এবং তার মৃত্যুর পর স্ত্রীকে রাতের অন্ধকারে লোকের ক্ষেতে মকাই কুড়োতে বের হতে দেখা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে দ্বিধা করা উচিত নয়। তবে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, তার অনেক কিছুই এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। এরমধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষগুলির নিষ্প্রভ উপস্থিতি — এরা কেউই পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক চরিত্ররূপে উপস্থাপিত হয় নি, সবাই প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে হাজির হয়ে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে গেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সঠিক মন্তব্যই করেছেন — ''আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসে বিভূতিভূষণ আঞ্চলিক উপন্যাসের সীমাবন্ধনে অনেকটা ধরা দিয়েছেন। এটি পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস নয় এই কারণে যে এখানে প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণ। আঞ্চলিক উপন্যাসে ভূ-প্রকৃতি মানুষের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে, মানবে প্রকৃতিতে এক অখণ্ড সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একথা ঠিক আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা, বিশিষ্ট চরিত্র। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু প্রকৃতিই প্রথম ও

শেষ কথা। এখানে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, চেতনাশক্তিসম্পন্ন। এখানে প্রকৃতি তার মহান ভয়াল ও সুন্দর গাম্ভীর্য নিয়ে উপস্থিত। এখানে প্রকৃতিই সব-কিছু। এই বিশাল প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের সঙ্কুচিত দ্বিধাজড়িত উপস্থিতি। আরণ্য প্রকৃতির সুগম্ভীর মহিমার কাছে মানুষ এখানে নিষ্প্রভ, গৌণ।''[১১০] তবে এটাও ঠিক যে, আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্ররা উপন্যাসে বর্ণিত অঞ্চলটির ঘেরাটোপেই নিজেদের আবদ্ধ রাখে। এই উপন্যাসেরও বেশির ভাগ চরিত্র নিজেদের পরিচয় উপন্যাসে গৃহীত অরণ্য প্রকৃতির ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। হয়তো একারণেই অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য তত্ত্ব বিষয়ক 'সাহিত্য প্রকরণ' গ্রন্থে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় একটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসটির আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি উপন্যাসটি প্রসঙ্গে লিখেছেন — '' . . . আরো একটি জিনিস লক্ষ করার দরকার আছে, অন্তত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসেবে তার শ্রেণীবিভাগ সঠিক কিনা তা বুঝবার জন্য। একটি বিশেষ অঞ্চলই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি কিনা, বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই উপন্যাসটি নিয়ন্ত্রিত করেছে কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। এমন হতে পারে, যে-কোন অঞ্চলেই এমন একটি ঔপন্যাসিক আখ্যান সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, আবার এমনও হতে পারে যে সেই বিশেষ অঞ্চল ছাড়া উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অঞ্চলটির অনিবার্যতা প্রমাণিত হয় এবং উপন্যাসটি আঞ্চলিক বিশেষণে ভূষিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের নাম করতে পারি। দোবরু পান্না, ভানুমতী, যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী, গণু মাহাতো, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে প্রভৃতি বিচিত্র উজ্জ্বল চরিত্র একেবারে নিষ্প্রভ এবং তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে এদের ভাগলপুরের সেই বিশেষ অঞ্চল থেকে বার করে আনলে। এ থেকেই বোঝা যায়, সেই আরণ্য প্রকৃতিই এই উপন্যাসের নিয়ামক শক্তি।''[১১১]

অনেকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসটিকে গ্রহণ করলেও কেউ-ই একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেন নি। আমাদের আলোচনাতেও বারবার উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণগুলির কথা উঠে এসেছে। তবে এটাও ঠিক যে, শুধু এই আঞ্চলিক লক্ষণগুলিই

‘আরণ্যক’ উপান্যাসটির মূলকথা নয়। বাংলা উপন্যাস তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটির একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে গেলে হয়তো উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উঠে আসে, তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার ঘেরাটোপ অতিক্রম করে প্রকৃতিপ্রেমী বাঙালিকে এক রহস্যময় রোমান্টিক অনুভূতির অলৌকিক জগতে পৌঁছে দেয়। এর আঞ্চলিকতা সেই জগতেরই একটি অংশমাত্র। এজন্য বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের নিরিখে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটির শ্রেণি নির্ণয় করতে গেলে একে আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস বলেই ক্ষান্ত থাকতে হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)–কে বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তিনি নিজের জন্মস্থল বীরভূম জেলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে পটভূমি করে বেশ কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন, যেগুলিতে আঞ্চলিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর এইরকম উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথমেই **‘ধাত্রীদেবতা’** (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটির নাম করতে হয়। এই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন — ‘‘বঙ্গশ্রী পত্রিকায় (১৯৩৪) ‘জমিদারের মেয়ে’ নামে ছোট আকারে প্রথম প্রকাশিত। চার বছর পরে শনিবারের চিঠিতে ধাত্রীদেবতা নামে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশকে কেন্দ্র করে দেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের নানা আন্দোলন ও পরিবর্তন এই উপন্যাসের উপজীব্য। ব্যক্তিগত আদর্শবাদ, পারিবারিক সংঘাত ও বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সহিত ব্যক্তি–জীবনের সমন্বয় এই কাহিনীকে এক বিশালতা দিয়েছে।’’[১১২] এই উপন্যাসটি আসলে শিবনাথ নামক একটি চরিত্রের বাল্য–কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের শ্যামল গৌরবে পৌঁছানোর কাহিনি। শিবনাথের জীবন পরিক্রমার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনের কৈশোর ও যৌবনের অনেক ঘটনার মিল থাকায় এই উপন্যাসটিকে তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা হয়। এই উপন্যাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও তৎপরবর্তীকালের রাজনীতির প্রসঙ্গ থাকায় অনেকে উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাসও বলতে চান। আবার রাঢ় অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটিতে

উক্ত অঞ্চল এবং ভারতবর্ষের রাজনীতি সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে, উপন্যাসটি মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি লাভ করেছে বলে অনেকে মত দেন। তবে উপন্যাসটিতে তারাশঙ্করের আত্মকথা, রাজনীতির প্রসঙ্গ বা মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিলাভ যাই থাকুক না কেন, সমস্ত কিছুই পরিবেশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল বীরভূমের এক বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবনকথার প্রেক্ষাপটে। উপন্যাসটির কিছু ঘটনা কলকাতায় ঘটলেও এর অনেকটা স্থান জুড়ে ঐ বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্যপ্রকৃতি থেকে শুরু সেখানকার মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যা স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাসের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলটির উপস্থিতি তেমনভাবে লক্ষ করা যায় না। এজন্য 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত আলোচকের আলোচনায় অবধারিতভাবে এর আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে কাহিনি অংশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ময়ূরাক্ষী সংলগ্ন লাঘাটা-বন্দর নামক রাঢ়বঙ্গের একটি গ্রামাঞ্চলের পটভূমিকায় উপন্যাসের নায়ক শিবনাথকে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিবনাথ শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় মা জ্যোতির্ময়ী দেবী ও পিসিমা শৈলজাদেবীর অভিভাবকত্বে মানুষ হয়। আদতে জ্যোতির্ময়ী দেবীর সন্তান হলেও শিবনাথের উপর পিসিমা শৈলজাদেবীর দাবীই যেন বেশি। একই রাত্রে স্বামী ও সন্তান হারিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ননদের এই দাবীকে শিবনাথের মাও প্রশ্রয় দেন। পিসিমা শিবনাথকে একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদার বানাতে চান। শিবনাথের মা শিবনাথকে নিয়ে পিসিমার সমস্ত দাবী মেনে নিলেও এই ইচ্ছাটির সঙ্গে সহমত হতে পারেন না; তিনি চান যে, তার ছেলে পড়াশুনো করে একজন সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে এবং তাকে সবাই একজন বড় মানুষের মা বলে চিনবে।। এজন্য তিনি শিবনাথকে যেমন দেশবিদেশের নানাধরনের বইপত্র পড়ার কথা বলেন, তেমনি প্রচুর উৎসাহ দিয়ে দেশসেবার, দেশের মানুষের মুক্তি প্রদানের স্বপ্নও দেখান। শিবনাথের বেড়ে ওঠার সময় তার জীবনে আরও দু'জন ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন — গোঁসাইবাবা ও রামরতন মাস্টার। প্রথমজন অর্থাৎ গোঁসাইবাবা শিবানাথের বাবার বন্ধু ছিলেন এবং ইংরেজ সেনাবিভাগে কাজ করার সুবাদে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়েছিলেন। তিনি সময় ও সুযোগ পেলেই শিবনাথকে তার অভিজ্ঞতাজাত

দেশবিদেশের যুদ্ধক্ষেত্রের নানা গল্প শোনান। আর দ্বিতীয়জন অর্থাৎ রামরতন মাস্টার ছিলেন শিবনাথের গৃহশিক্ষক, ইনি শিবনাথকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, ক্ষমতালোভী জমিদার বানানোর চেয়ে একজন উদার, বিবেকবান মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষাদানের প্রতিই বেশি মনোযোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় ঐ অঞ্চলের নব্য ধনী ব্যবসায়ী রামকিঙ্করবাবুর মাতৃহারা বোনঝি নান্তি ওরফে গৌরীর সঙ্গে শিবনাথের বিয়ে হয়। উপন্যাসে গৌরীর সঙ্গে শিবনাথের তেমন বনিবনা হতে দেখা যায় না — সে শিবনাথকে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ব্যবসা করে সুখী জীবনযাপনের জন্য চাপ দিলেও শিবনাথ গ্রাম ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারে না। উপন্যাসে শিবনাথের কিছু সময় পড়াশোনার জন্য কলকাতায় কাটলেও বেশির ভাগ সময় গ্রামেই কেটেছে। তার গ্রামজীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এখানে ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী রাঢ় বঙ্গের গ্রামজীবনের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। পূর্বেই বলেছি যে, এই উপন্যাসে শিবনাথের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর নিজেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই উপন্যাসে শিবনাথের রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী গ্রামজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চল সংক্রান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেছেন।

শিবনাথের সঙ্গে বিয়ের পর ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে নান্তি ওরফে গৌরীর পক্ষে জমিদার বাড়ির আদব-কায়দা মেনে নিতে অসুবিধা হয়। বিশেষ করে শিবনাথের পিসিমার আদেশ-উপদেশকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ সে শিবনাথের বাড়ি ছেড়ে গ্রামেই মামারবাড়িতে গিয়ে তার দিদিমার কাছে আশ্রয় নেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে শিবনাথদের অঞ্চলটিতে গ্রীষ্মকালে কলেরা রোগ মহামারীর রূপ নেয়। তখন গ্রামের অনেক অবস্থাশালী পরিবারের সঙ্গে গৌরীসহ শিবনাথের শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও গ্রামত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে শিবনাথের উপরেও গ্রামত্যাগের চাপ আসলেও শিবনাথ যায় না — গ্রামে থেকে অসহায় গ্রাম্য দরিদ্র মানুষগুলির সেবাকার্যে নিযুক্ত হয়। মায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত শিবনাথ এভাবেই প্রথম দরিদ্র-আর্তের সেবায় সরাসরি নামে। এদিকে গভর্ণমেন্ট মহামারী পীড়িত গ্রামের দুঃস্থ মানুষগুলির চিকিৎসার্থে সুশীল ও পূর্ণ নামক মেডিক্যাল কলেজের দুই উজ্জ্বল ছাত্রকে পাঠায়। সেবাকার্য করার সূত্রেই এদের সঙ্গে শিবনাথের

বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গ্রাম থেকে মহামারী বিদায় নিলে সুশীল ও পূর্ণ কলকাতায় ফিরে যায়। এদিকে শিবনাথ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে এবং উচ্চশিক্ষার লাভের জন্য কলকাতায় পড়তে আসে। পুরোনো বন্ধুত্বের সুবাদে এখানে সে সুশীল ও পূর্ণের আরও কাছাকাছি আসে। তারা ততদিনে ইংরেজবিরোধী একটি সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠেছে। শিবনাথও এদের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়ে সেই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সাঁওতাল পরগণায় এক সাধক বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর শিবনাথ সশস্ত্র বিপ্লববাদের পথ ত্যাগ করে।

এরপর মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শিবনাথ গ্রামে ফিরে আসে। সে সময় তার মা মারা যান। মায়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্ত্রী গৌরীও ফিরে আসে। শ্রাদ্ধের পর পিসিমা শিবনাথ ও গৌরীর হাতে সংসারের ভার ন্যস্ত করে কাশীবাসী হন। সংসার হাতে পেয়ে জমিদার সন্তান শিবনাথ প্রজাশোষণ করে অর্থোপার্জনের পরিবর্তে প্রজাদের হিতসাধনের দিকে নজর দেয়। এদিকে মা ও মাস্টারমশাই-এর আদর্শে মানবসেবার ব্রত গ্রহণ করা জমিদার সন্তান শিবনাথের সঙ্গে সংসার করতে ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে গৌরীর নানা দিক থেকে সমস্যা হয়; বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মতান্তর দেখা দিলে সে পুনরায় মামার বাড়ি দিদিমার আশ্রয়ে চলে যায়। এদিকে স্ত্রী বাড়ি ত্যাগ করার পর শিবনাথও বাড়ি ছাড়ে এবং ময়ূরাক্ষীতীরস্থ বিল্বগ্রামে জমি নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে। প্রজাদের হিতসাধনের জন্য সে নানারূপ পরিকল্পনাও শুরু করে। এতে বেশ কয়েকবছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে কলকাতায় তার স্ত্রী গৌরী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। এ সময় গান্ধীজী অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলে শিবনাথ সেই আন্দোলনের শরিক হয় এবং তার অঞ্চলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে সেখানকার জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটানোর জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। তবে এই আন্দোলনে যোগদানের কারণে অবধারিতভাবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং সে কারাবরণ করে। শিবনাথ কারাবরণ করলে প্রথমে কলকাতা থেকে শিশুসন্তানসহ গৌরী এবং তারপর কাশী থেকে পিসিমাও ফিরে আসে। এরা সবাই শিবনাথকে দেখতে কারাগারে যায়। সেখানেই শিবনাথ তার পুত্রকে প্রথম দেখে। এখানে পিসিমা শৈলজাদেবীর আড়ালে দেশমাতৃকাকে শিবনাথের ধাত্রীদেবতা হিসেবে বন্দনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

এই উপন্যাসটিতে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের মতো উপন্যাসের বেশ কয়েকটি প্রকরণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে এসবের ভেতরেই উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার নানা উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে 'পিপাসার্ত বীরভূম'-এর পরিচয় আছে বলে মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে রাঢ় অঞ্চলের গৈরিক মৃত্তিকার বর্ণনা দিয়ে — ''বাংলা দেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবী বেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিকবর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে বনফুল আর খৈরিকাঁটার গুল্ম; বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মত ঊর্দ্ধলোকে প্রসারিত।''[১১৩] এরপরেই ঔপন্যাসিক বীরভূম জেলার নদ-নদীর কথা উল্লেখ করে লিখেছেন — ''বীরভূমের দক্ষিণ অংশে বক্রেশ্বর ও কোপাই দুইটি নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।''[১১৪] উপন্যাসটির শেষে আছে পিসিমার আড়ালে দেশমাতা তথা বাস্তুভূমির প্রতি নায়ক শিবনাথের জবানীতে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের ঐকান্তিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন — ''সমস্ত জীবের দাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু, সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি, তোমাকে যে সে বাস্তুর বংশের কল্যাণ করতেই হবে। এই তো তোমার ধর্ম। তুমিই তো আমার বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।''[১১৫]

এখানে ঔপন্যাসিক যেমন বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই, কুয়ে প্রভৃতি নদ-নদীর বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি সেই অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের গভীর সম্পর্কটির কথাও বলেছেন। এই অঞ্চলটিতে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত পরিবেশে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়, খরার সময় লাল কাঁকড়ের প্রান্তর ধূ ধূ করে, প্রজারা প্রাণপণ চেষ্টা করেও খাজনা দিতে পারে না, ঘরে ঘরে শুরু হয় কলেরা, দেখা দেয়

মহামারী। এই উপন্যাসে এভাবেই আঞ্চলিক সীমাসঙ্গতির নিরিখে স্থানীয় প্রকৃতির সমস্ত চিত্রই ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন। এর পাশাপাশি ঐ অঞ্চলের মানুষজনের জীবনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। ফলে এখানে রাঢ় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদীর বর্ণনার পাশাপাশি মানুষজনের জীবন-জীবিকা, সংস্কার-বিশ্বাস, লোকাচার-লোককথার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, বিশেষ ভাষারীতি প্রভৃতির গভীর ও ব্যাপক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, যা উপন্যাসটি প্রকাশের আগে পর্যন্ত বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য উপন্যাসটিতে আংশিকভাবে কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের কথা, ছাত্রদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কথাও এসেছে এবং উপন্যাসটির শেষে নায়ক শিবনাথের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক একটি বৃহত্তর আদর্শে উপনীত হতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক গৃহীত অঞ্চলটির নিরিখে দুই কালের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে জমিদার-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয়িত রূপকে প্রকাশ করেছেন, যেখানে অবধারিতভাবে প্রবেশ করেছে পুঁজিনির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পাশাপাশি এখানে সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও আছে। ফলে উপন্যাসটিতে জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের পাশাপাশি সমকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে প্রচুর চরিত্রের আগমন ঘটেছে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে শিবনাথ, তার মা জ্যোতির্ময়ী দেবী, পিসিমা শৈলজা দেবী, স্ত্রী নান্তি ওরফে গৌরী, শ্যালক কমলেশ, মামাশ্বশুর রামকিঙ্কর বাবু, রামকিঙ্কর বাবুর মা অর্থাৎ গৌরীর দিদিমা, শিবনাথদের গ্রামের ভদ্রলোকেরা উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষ এবং হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। শিবনাথের মাস্টারমশাই রামরতনবাবু, সুশীল, পূর্ণ, কলকাতার মেসের ছেলেরা, সাঁওতাল পরগণার সাধক বিপ্লবীটি, দারোগা প্রমুখেরা সবাই উচ্চবর্ণের না হলেও ভদ্র সমাজের প্রতিনিধি। আর জমিদার বাড়ির বিশ্বস্ত অনুচর শম্ভু, নায়েব রাখাল সিং, কেষ্ট সিং, সতীশ চাকর, গোমস্তা কুড়ারাম মিশ্র, পঞ্চানন মোড়ল, শ্যামু, বড়চুলের ছেলেটি, পাগলটি, ফ্যালা ডোম, তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যরা, নিত্য ঝি, রতন, শম্ভুর মা, দুর্গা ঠাকুরাণী, গ্রামের অন্যান্য প্রজাসাধারণ এবং অক্ষয় তান্ত্রিকসহ রক্ষেকালীর পূজায় উপস্থিত মানুষজনেরা বেশির ভাগই নিম্নবর্ণের মানুষ এবং উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি থেকেই সম্পূর্ণ আঞ্চলিক

বৈশিষ্ট্যসহ উঠে এসেছে। গোঁসাইজী অর্থাৎ শিবনাথের বাবার বন্ধু ব্রিটিশের সেনাবিভাগে কাজ করা রামজী সাধুও এদের মধ্যে পড়ে। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরোধের কথা নিয়ে এলেও তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন শিবনাথের মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক দর্শনে পৌঁছানোর দিকে।

এর ফাঁকেই ঐ অঞ্চলের মানুষগুলির জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়টি সামান্য হলেও এসেছে। শিবনাথের পরিবার সামন্ততান্ত্রিক পরিবার হওয়ায় জীবন ও জীবিকার বিষয়ে এই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিবনাথের জমিদারীর প্রজাদের এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের কৃষিকাজই ছিল প্রধান জীবিকা। এইজন্য খরার ফসল নষ্ট হওয়া, জমিদারের পুকুরের জল ছেড়ে দিয়ে সেই ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করা, ধান বিক্রি, নায়েব-গোমস্তার কার্যকলাপ, প্রজাদের থেকে খাজনা আদায়, জমিদার পরিদর্শনে গেলে নজর দেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিতে না পারলে জমিদারী নীলামে ওঠা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে এসেছে। জমিদারী নীলামে ওঠবার প্রাক্কালে শিবনাথ তার জমিদারী এলাকা পরিদর্শনে গেলে সেই এলাকার মোড়ল পঞ্চানন প্রথমে তার বৌমার গয়না শিবনাথকে বের করে দেয়। শিবনাথ তা নিতে অস্বীকার করে বাড়ি রওনা দিলে পঞ্চানন গ্রাম থেকে জমিদারের জন্য কিছু নজর আনে — ''পঞ্চানন মাথা তুলিল না, বরং আর একটু হেঁট করিয়া একখানি মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, হুজুর আপনি পায়ের ধূলো দিলেন, আর শুধু শুধু — ,দয়া করে এই — ,সামান্য পাঁচ টাকাও ভরাতে পারলাম না হুজুর, সমস্ত গাঁ ঝেটিয়ে দু পয়সা চার পয়সা করে আপনার নজর — ''[১১৬] শিবনাথের শ্বশুরবাড়ির পরিবার অর্থাৎ রামকিঙ্করবাবুর পরিবার ছিল ব্যবসায়ী পরিবার। উপন্যাসে এদের ধন গৌরবের বিষয়টি দেখানো হলেও বিস্তারিত কার্যকলাপের পরিচয় নেই। শিবনাথের স্ত্রী গৌরী শিবনাথকে ব্যবসা করার কথা বলেছিল। সে একবার শিবনাথকে বলে — ''দাদা আমাকে বলে গেছে, মামাদের আপিসে তুমি চাকরি কর, তুমি লিখলেই দিবে। আপিসে চাকরি করে ব্যবসা শিখে পরে তুমি নিজে ব্যবসা করবে। কিংবা এখনই যদি ব্যবসা কর, মামারা টাকা দিবে, তারপর তুমি শোধ দিও।''[১১৭] তবে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ

অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার যেরূপ বিস্তারিত পরিচয় থাকে, এই উপন্যাসে তা অনেকাংশেই অনুপস্থিত।

এই উপন্যাসের মানুষজনেরা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বেশির ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা হিন্দুধর্মের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হলেও নিম্নবর্ণের কিছু মানুষজনের পরিচয়ও এখানে আছে। তবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঔপন্যাসিক এখানে গৃহীত অঞ্চলটির লৌকিক বিশ্বাস ও লৌকিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে এই উপন্যাসে আঞ্চলিক সংস্কার-বিশ্বাস, কিংবদন্তী, লোককল্পনা, লোকসঙ্গীত, অলৌকিক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির পরিচয় আছে। সমগ্র বীরভূম জুড়ে যখন ভয়ঙ্কর খরা, তীব্র অনাবৃষ্টি চলেছে, ঘরে ঘরে কলেরা মহামারীর রূপ নিয়েছে, তখন এই অঞ্চলটির সাধারণ মানুষ এর হাত থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে রক্ষেকালী পূজার আয়োজন করেছে — ''ঢাক বাজিতেছে। সদর রাস্তায় ঢাক বাজাইয়া কেহ বোধহয় কিছু ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে . . . রক্ষেকালীর পূজো হবে; পরন্তু অমাবস্যায় চাঁদা লাগবে, চলবে সব। দেবাংশি দোরে মালসা পেতে দিবে, সর্ষে পোড়া ছড়িয়ে দেবে।''[১১৮] সেখানকার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে রূপকথার মত আশ্চর্য সব গল্প। তাদের বিশ্বাস রক্ষেকালীর পূজা করলে দেবী এসে ঝেঁটিয়ে কলেরাকে দূর করে দেবে। দুর্গা ঠাকুরণীর মুখে শোনা যায় এই জাতীয় একটি গল্প — ''মা আসবেন, এসে এক রেতে তেড়ে বার করবেন গাঁ থেকে . . . গাঁয়ে একমাস কলেরা, শেষে যেদিন রক্ষেকালীর পূজা হল, সেদিন রেতে পথে পথে সে কী কান্না মা! তারপর এই ভোরবেলাতে এই কালো বিভীষণ চেহারার এক মেয়ে এক চেটাই বগলে গাঁ থেকে বেরিয়ে গেলো।''[১১৯] অমাবস্যা তিথিতে শ্মশানে পাঁঠাবলিসহ মহাসমারোহে এই রক্ষেকালীর পূজা হয়, সেদিন সকাল থেকেই ঢাক, ঢোল, সানাই বাজতে থাকে, গ্রামের প্রত্যেক বাড়ির গৃহিণী অথবা প্রবীনতমা স্ত্রীলোক — একজন নিরম্বু উপবাস করে থাকেন, যারা পূজা ও বলি হয়ে গেলে জলগ্রহণ করেন। গ্রামসুদ্ধ এক রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হয়। পূজাস্থল অর্থাৎ শ্মশানের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''এখানে ওখানে দল বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে ভক্তের দল, গোল হইয়া বসিয়া স্খলিতকণ্ঠে চিৎকার করিতেছে, মধ্যে মদের বোতল। কোথাও চলিতেছে গাঁজা। শ্মশানের মধ্যস্থলে একটা

মাটির বেদীর উপর কালী প্রতিমা, পুরোহিত সম্মুখে বসিয়া একটি জবার অঞ্জলি লইয়া বোধ হয় ধ্যানস্থ। . . . এই হল উপযুক্ত পূজামণ্ডপ। শ্মশানের মাঝখানে, ওপরে অনাবৃত আকাশ, চারিদিকে শেয়াল কুকুরের চিৎকার; এ না হলে মানায় না।''[১২০] রক্ষেকালীর পূজা ছাড়াও এই উপন্যাসে 'লুণ্ঠন ষষ্ঠী'র গল্প এবং শিবনাথের মামাশ্বশুর রামকিঙ্করের বাড়ির দোল উৎসবের প্রসঙ্গের কথা আছে।

ঐ অঞ্চলের নিম্নবর্ণের মানুষগুলির মধ্যে ভূতের আতঙ্ক তীব্র ছিল, তা ফ্যালা ডোমের মৃত্যুর পর তার কলেরা রোগাক্রান্ত মৃতপ্রায় বৌটির মধ্যেও দেখা যায়। সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে ফ্যালার মৃত আত্মার ভয়ে ঘরে যেতে রাজি হতে না চেয়ে শিবনাথকে বলেছে — ''ওগো না গো, ঘরের ভেতর আঁদার কোণে যদি সে বসে থাকে?''[১২১] শিবনাথ তাকে দেবতার নাম, ভগবানের নাম করার কথা বললেও তার বিশ্বাস 'চন্ডীমায়ের একটুকুন পুষ্প' এনে দিলে ভূত আসবে না। শেষপর্যন্ত শিবনাথ কাগজে পেন্সিল দিয়ে রামনাম লিখে তার শিয়রে রাখলে সে ভয়মুক্ত হয়।

উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের বাসগৃহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাসের বিস্তারিত বিবরণ নেই। হয়তো উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেরা উচ্চবর্ণের হওয়ার কারণে তারাশঙ্কর এসবের বর্ণনায় যান নি। উপন্যাসটি সাধু বাংলা গদ্যে রচনা করলেও তিনি চরিত্রদের মুখে চলিত ভাষার সংলাপ বসিয়েছেন। এরমধ্যে প্রধান চরিত্রগুলিসহ শিক্ষিত, ভদ্র, শহুরে মানুষগুলি মান্যচলিত বাংলায় কথাবার্তা বলেছে। আর ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য মানুষগুলি, যারা উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র হিসেবে জায়গা পেয়েছে, যেমন জমিদার বাড়ির বিশ্বস্ত অনুচর শম্ভু ও তার মা, জমিদারী সীমানায় বসবাসকারী সাধারণ ডোম, বাগ্‌দী, বাউরী প্রজারা এবং জমিদার বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকারা সবাই রাঢ়ী উপভাষার সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপে কথা বলেছে। যেমন শম্ভু বলেছে — ''ওরা আর আসবে না বাবু। সন্‌জে হয়ে এলো, চলেন, বাড়ি যাই। সেই কখন আইচেন, বলেন দেখি।''[১২২] সে আরও বলেছে — ''যাক, শালারা চলে যাক, তেড়ে আসবে, ছিঁড়ে ফেলাবে আমাদিকে, বাঘের জাত তো।''[১২৩] আবার শম্ভুর মা বলেছে — ''ওগো বাবু, ভয়ে কাঁপুনি আসছে গো; বলতে যে লারছি। কাল

রেতে আবার ছজনার হইছে গো।''[১২৪] এইভাবে চরিত্রদের মুখের ভাষা-সংলাপের ক্ষেত্রেও এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এভাবে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল বীরভূমের নানা আঞ্চলিক উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে সেখানকার আঞ্চলিক ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, ঋতুবৈচিত্র্য থেকে শুরু করে সেখানকার মানুষজন, তাদের জীবন-জীবিকা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, লোকরুচি, লোককথা, আঞ্চলিক উপভাষা প্রভৃতি সবকিছুই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এই উপন্যাসে আঞ্চলিকতার একটা বাহ্যিক পরিকাঠামো রয়েছে। উপন্যাসটির মূলে রয়েছে শিবনাথের তথা ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের গভীর দেশপ্রেম, বিশিষ্ট রাজনৈতিক জীবনদর্শন। তাই জলহীন মাঠ দেখে তারাশঙ্করের দ্বিতীয় সত্তা শিবনাথের মনে হয়েছে — ''মৃত্তিকাময়ী মা — সুজলা সুফলা, মলয়জ শীতলা তৃষ্ণায় চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইতেছেন।''[১২৫] স্ত্রী গৌরী তাকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যাওয়ার পরামর্শ দিলে সে গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছে — ''জান গৌরী, মাঠে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, মনে হল মাটি যেন কথা কইছে। জল শুকিয়ে মাঠের জমি চৌচির হয়ে যাচ্ছে। মানুষ যেমন তেষ্টায় হা হা করে, মাঠের মাটির মধ্যে তেমনি শব্দ অবিরাম উঠছে। . . . এ মাটি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।''[১২৬] এই উপন্যাসে মাটির ভিতরে শিবনাথ উপলব্ধি করেছে দেশ ও জননীকে। সে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস স্থাপন করে দেশ গঠনে এবং জনজাগরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, প্রকাশ্যে জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জনগণকে জাগ্রত করে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান করতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেছে। এজন্য এই উপন্যাসে অঞ্চলভিত্তিক জীবনকথা বহুল অংশে পরিবেশিত হলেও উপন্যাসটি কখনোই আঞ্চলিক উপন্যাসের সীমানায় আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। এখানে উপন্যাসের প্রয়োজনে অঞ্চল এসেছে, যা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য পুরণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটিকে কেউ-ই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মত দেন নি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে উপন্যাসটির আলোচনার শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, উপন্যাসটি একটি ব্যক্তি

কেন্দ্রিক উপন্যাস — ''ধাত্রীদেবতা'য় জমিদারের ছেলে শিবনাথের শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত পরিণতির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।''[১২৭] অবশ্য শিবনাথের এই পরিণতির কাহিনি অনেকটাই রাঢ়ভূমি বীরভূমের একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে এই আলোচনার শেষে তিনি যে উক্তি করেছেন তাতে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার লক্ষণকে স্বীকার করেছেন বলেই মনে হয় — ''কলেরার আক্রমণে গ্রামবাসীদের ত্রস্ত, অসহায় ভাব, ইতর শ্রেণীর মধ্যে, পারিবারিক বন্ধন-ছেদের, সনাতন ধর্মসংস্কারের নিকট ব্যাকুল, অন্ধ আত্মসমর্পণ, উত্তেজিত কল্পনার সম্মুখে নানা অর্ধ-অবাস্তব বিভীষিকার ছায়ামূর্তি-পরিগ্রহ — এই সমস্ত মিলিয়া এক ভীতিশিহরণস্পন্দিত, শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে। অমাবস্যারাত্রে রক্ষাকালী পূজার বর্ণনায়, অনাবৃষ্টিতে শুষ্যমান শস্যক্ষেত্রের সোঁ সোঁ ধ্বনিতে এক অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির ভীষণ আভাস ছায়াপাত করিয়াছে। সর্বশুদ্ধ উপন্যাসটি আদর্শপ্রবণতার আতিশয্য সত্ত্বেও — বা উহারই জন্য — করুণ-গভীর আবেদনে মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে।''[১২৮] এই উক্তিটিতে তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা বিষয়ের উল্লেখ করে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর পাঠকসমাজের প্রচুর অজানা বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন, যেগুলি একমাত্র উপন্যাসে গৃহীত রাঢ়বঙ্গের ঐ অঞ্চলটিরই পরিচয় বহন করে। এজন্য সমালোচকরা 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা না করলেও বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতার আলোচনায় 'ধাত্রীদেবতা'কে নিয়ে কিছু বলার সাহস হয়। তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস প্রভৃতি পরিচয়কে সামনে রেখে একে বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলা না গেলেও একটি আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করাই যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'কালিন্দী'** উপন্যাসটি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি সম্পর্কে 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন — ''দুই বিবদমান জমিদার বাড়ির কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। নদীর বুকে একটি চরকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান ঘটল।

সামন্ততান্ত্রিক জীবনের কতকগুলি উপাদানের প্রতি তারাশঙ্করের মমতা এবং জমিদার ও শিল্পপতির দ্বন্দ্বে জমিদারের পরাজয়ের জন্য বেদনাবোধ উপন্যাসে স্পষ্ট। তবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তারাশঙ্কর সচেতন।''[১২৯] তারাশঙ্করের বেশির ভাগ উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসটির পটভূমিও পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে রাঢ়বঙ্গের বীরভূম জেলা প্রাধান্য পেলেও 'কালিন্দী'তে আছে পুরুলিয়া জেলার কথা। এই জেলার রায়হাট অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণী নদী, যার স্থানীয় নাম কালিন্দী। তবে এই অঞ্চলের লোকেরা কালিন্দীকে 'কালী নদী' নামে ডাকে। এই কালী নদীর বুকে সদ্য জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবি ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে এঁকেছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি এখানে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা জমিদার নিয়ন্ত্রিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি রূপকে যেমন তুলে এনেছেন, সেইসঙ্গে ঐ ব্যবস্থা ও আধুনিক পুঁজি নির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধকেও এখানে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি উপন্যাসের শেষে নায়ক অহীন্দ্রের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দরিদ্র সাধারণ মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু রাজনৈতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সমকালীন ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ছবিও স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর উপন্যাসটির এবং এর লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। তবে যে যাই বলুক, এটা ঠিক যে তারাশঙ্কর কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরটির প্রেক্ষিতে তাকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যার বিবরণ তুলে ধরে এখানে আঞ্চলিক বাতাবরণ তৈরি করেছেন। তাই উপন্যাসটিতে ঐ চরটি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের প্রকৃতি থেকে শুরু করে সেই অঞ্চলের মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যার নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষগুলির জীবনধারারও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

উপন্যাসটির কাহিনি গড়ে উঠেছে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদীর উপর সদ্য জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসে এই নদীটি যে জায়গাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার দু'পাশে রয়েছে দু'টি গ্রাম — রায়হাট ও চক আফজলপুর। তবে এখানে মূলত রায়হাটের জীবনচিত্রের কথাই পরিবেশিত হয়েছে। রায়-বংশ এবং

চক্রবর্তী-বংশ — এই দু'টি বংশ ঐ অঞ্চলের জমিদার। এর মধ্যে রায়-বংশ বহু প্রাচীনকাল থেকেই সেই অঞ্চলের জমিদার — সে জন্য উপন্যাসে তাদের ১০৫ জন শরিকের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি শরিকের কর্তা হলেন ইন্দ্র রায়, যিনি ঐ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর ও কূটকৌশলী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ হল চক্রবর্তী-বংশ, যে বংশের কর্তা হলেন রামেশ্বর চক্রবর্তী। ইনি এককালে ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ হলেও পুরো উপন্যাসে একজন বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত। ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বর চক্রবর্তীর মধ্যে শ্যালক-ভগ্নিপতির সম্পর্ক হলেও রামেশ্বরের বাড়ি থেকে ইন্দ্রের বোনের অন্তর্ধানের পর থেকে সেই সম্পর্কে চিড় ধরে। রামেশ্বর বিকৃত মস্তিস্ক হওয়ায় এই উপন্যাসে নায়েব যোগেশ মজুমদারের সাহায্যে রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতিকে দুই নাবালক পুত্র মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রকে নিয়ে তাদের পক্ষের জমিদারী সামলাতে দেখা যায়। এরমধ্যে ছোট ছেলেটি অর্থাৎ অহীন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী। উপন্যাসে উল্লিখিত চরটি চক আফজলপুরের যে অংশে চক্রবর্তীদের জমিদারি ছিল সেদিকে জেগে ওঠায় তাতে চক্রবর্তীদের বেশি দাবী গড়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও ইন্দ্র রায় চরটির প্রতি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ননী পাল নামে এক ব্যক্তিকে চরের কিছুটা অংশ আইনত দান করেন। চর পেয়ে ননী পাল চক্রবর্তীদের অপমান করতে গিয়ে ইন্দ্র রায়ের বোন অর্থাৎ মহীন্দ্রের বিমাতা রাধারাণী সম্পর্কে কুকথা বলে। এতে বিমাতার সম্মান বাঁচাতে মহীন্দ্র তাকে খুন করে এবং বিচারে তার দ্বীপান্তর হয়। এরপরেই ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে চক্রবর্তীদের সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠে। এতসব ঘটনার মাঝেই চরটিতে সাঁওতাল প্রজার আগমন ঘটে। এদের মোড়ল কমল মাঝি। এই সাঁওতালরা চরের জঙ্গল কেটে কিছু চাষোপযোগী জমি তৈরি করে সেখানে নানা ধরনের ফসল, শাক-সব্জি চাষাবাদ করে, চরের উপর নিজেদের বসত বাড়ি বানায়। একদিন অহীন্দ্র চর দেখতে গেলে এই সাঁওতালরা তাকে তাদের 'রাঙাঠাকুর' মনে করে সম্মান দেয় এবং সেই চর বিলি-ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করে। এই রাঙাঠাকুর অর্থাৎ সোমেশ্বর চক্রবর্তী আসলে অহীন্দ্রের ঠাকুরদা, যিনি একসময় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালদের হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। যাই হোক, অহীন্দ্র নিজেদের জন্য চরের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অংশটি রেখে বাকিটা সাঁওতালদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা করে দেয়,

অবশ্য এই বিলি-ব্যবস্থায় রংলাল, নবীনের মতো তার গ্রামের মানুষগুলিও কিছু জমি পায়। তখন সাঁওতালরা ঐ চরটির নতুন নামকরণ করে 'রাঙাঠাকুরের চর'।

এদিকে তারই বোনের সম্মান রক্ষার্থে রামেশ্বরের ছেলে মহীন্দ্র মানুষ খুন করে সাজা পেয়ে দ্বীপান্তরে গেলে ইন্দ্র রায় হয়তো অনুশোচনায় পড়ে চক্রবর্তী-বংশের প্রতি সমস্ত বৈরিতা ত্যাগ করে সদ্য জেগে ওঠা চরটির উপর নিজের দাবী ত্যাগ করেন এবং রামেশ্বরের পরিবার যাতে চরটি ভোগ করতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হন। এর পেছনে ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাদের এই সচেষ্টতা মহীন্দ্রের বিচারের সময় থেকেই শুরু হয়। এর ফলে দীর্ঘদিন পর দু'টি পরিবার কাছাকাছি আসে। এদিকে মহীন্দ্রের মামলার খরচ জোগাতে গিয়ে চক্রবর্তীদের নায়েব যোগেশ মজুমদার কারণে-অকারণে প্রচুর ঋণ করেন, যা পরিশোধ করতে গিয়ে রামেশ্বরের সম্পত্তির সিংহভাগ বিক্রী করতে হয়। অবশ্য এই সম্পত্তি নায়েব যোগেশ মজুমদার বেনামে কিনে ফেলে। আর্থিক টান পড়ায় চরটিতে হাত পড়ে। অহীন্দ্র বিমল মুখার্জ্জী নামক কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ীকে চরটির কিছু অংশ বিলি-ব্যবস্থা করে দেয়। বিমলবাবু সেখানে চিনি কারখানা খোলার তোড়জোড় শুরু করেন। ফলে চরটিকে কেন্দ্র করে নানা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। বিমলবাবু ছলে-বলে-কৌশলে সাঁওতালদের বিলি-ব্যবস্থা করা জমিগুলিরও দখল নেন। এতে সাঁওতালরা কৃষিজীবী থেকে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হতে থাকে এবং একসময় সেই চর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদিকে সেই চরের স্বত্ত্বকে কেন্দ্র করে জমিদারের সঙ্গে শিল্পপতির আইনি লড়াই শুরু হয়। যার একদিকে ছিলেন চক্রবর্তীদের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ জমিদার ইন্দ্র রায়, আর অপরপক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি পুঁজিপতি বিমলবাবু। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মামলার রায়ে শেষপর্যন্ত ইন্দ্র রায়ের পরাজয় ঘটে। এরপর বিমলবাবু জোরকদমে চিনি কারখানার কাজ শুরু করে দেন। ফলে সে অঞ্চলে রাস্তাঘাট, যানবাহন থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যতার অনেক উপকরণের প্রবেশ ঘটতে শুরু করে। এরসঙ্গে ঢোকে আধুনিক সভ্যতার ব্যাভিচারগুলিও। এদিকে মামলা হেরে ইন্দ্র রায় সবকিছু ছেড়ে তার জমিদারী স্বত্ত্ব ত্যাগ করে কাশীবাসী হতে মনস্থ করেন। ইন্দ্র রায় রায়হাট ত্যাগ

করার বাসনা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অঞ্চল থেকে সামন্ততন্ত্র একরকম অবসানের পথে এগিয়ে যায়।

এই উপন্যাসের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে একদিকে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধের প্রসঙ্গ থাকলেও অন্যদিকে অহীন্দ্রের কার্যকলাপের মধ্যে সে সময়কার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গও আছে। মহীন্দ্রের দ্বীপান্তর হওয়ার পর ইন্দ্র রায় চক্রবর্তীদের কাছাকাছি এলে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয় — ইন্দ্র রায় রামেশ্বরের ছোট ছেলে অহীন্দ্রের সঙ্গে নিজের কন্যা উমার বিয়ে দেন। অহীন্দ্র সেই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, মেধাবী তথা উজ্জ্বল ছেলে হিসেবে পরিগণিত হলেও বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই অহীন্দ্রের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। হয়ত সেই অঞ্চল ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করার কারণেই জগতের বিচিত্র সব পরিবর্তন তার চোখে ধরা দিতে থাকে। পাশাপাশি সেই অঞ্চলে বিমলবাবুর কার্যকলাপ, সাঁওতালদের জীবনধারার বিপর্যয় থেকে শুরু করে গরীব অসহায় মানুষগুলির দুরবস্থা, তাকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবাতে শুরু করে। এজন্য সে এক নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। তাই ইন্দ্র রায়ের মেয়ে উমা বিয়ের আগে পর্যন্ত অহীন্দ্রকে যেভাবে পেতে চেয়েছিল, বিয়ের পর আর তাকে সেভাবে পায় না। অহীন্দ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র বিল্পব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিংস কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করে। উপন্যাসের শেষে সে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে। অহীন্দ্রের এই গ্রেপ্তারির সংবাদ শোনার পর তার বাবা রামেশ্বর চক্রবর্তীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঠিক হয়ে যায়। তার মুখ থেকেই জানা যায় যে, তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী অর্থাৎ ইন্দ্র রায়ের বোন রাধারাণীকে আর তার সন্তানকে সে গলা টিপে মেরে বাড়ির কুয়োর মধ্যে পুঁতে দিয়েছিল। তার বিশ্বাস এতে রাধারাণীর অভিশাপে যে পাপ তার লেগেছিল দুই পুত্র – – মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রের কারাবরণে সেটা কেটে গেছে। উপন্যাসের শেষে কালিন্দীর রূপেও পরিবর্তন ঘটেছে। কালিন্দীর বুকে আগে আকাশ, নদীতীরের গাছ–গাছালির ও পাখিদের ছবি ভাসত; আর আজ উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশির ছবি ভাসে।

এই উপন্যাসটি আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্পর্কে খানিকটা বিরূপ মন্তব্য করে বলেছেন — ''পরবর্তী উপন্যাস 'কালিন্দী' (১৯৪০) অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের।''[১৩০] হয়তো উপন্যাসটির কিছু দোষ-ত্রুটি আছে, তবে উপন্যাসটিকে 'নিম্নস্তরের' বলা হয়তো যায় না। যাই হোক, 'কালিন্দী' উপন্যাসটির বেশ কিছু গুণ আছে, যেগুলি পাঠককে মুগ্ধ করে। এই গুণগুলির মধ্যে অন্যতম হল উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক পটভূমির ব্যবহার। ঔপন্যাসিক তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসের মত এই উপন্যাসটিও রাঢ়বঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচনা করেছেন — রাঢ়বঙ্গের ব্রাহ্মণী নদীর দুই তীরে অবস্থিত রায়হাট এবং চক আফজলপুর নামক দু'টি গ্রামের কথা এখানে আছে। সেইসঙ্গে সদ্য জেগে ওঠা একটি চরের কথাও আছে, যার বর্ণনায় বলা হয়েছে — ''গ্রামের কোলেই কালিন্দী নদীর অগভীর জলস্রোত পার হইয়া খানিকটা বালি ও পলিমাটিতে মিশানো তৃণহীন স্থান, তার পরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে — অসংখ্য কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ডের মত ভয়ঙ্কর নানা ধরনের বিষধর সাপ।''[১৩১] এই উপন্যাসে চরটির ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং তাকে কেন্দ্র করে মানুষজনের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ আছে। এই চরটি রায়হাটের জমিদারদের মধ্যে একপক্ষ চক্রবর্তীদের সীমানায় ওঠে। রংলাল পাল, নবীন বাগ্‌দীর মতো চক্রবর্তীদের প্রজারা চরটির প্রতি লোভ ও দাবী করে। এর খবর পেয়ে সাঁওতালরা সেখানে এসে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ-বাসের উপযোগী করে তোলে। চক্রবর্তীদের পক্ষে রামেশ্বর চক্রবর্তীর ছোট ছেলে অহীন্দ্র নিজেদের চাষাবাদের জন্য কিছু অংশ রেখে বাকিটা সাঁওতালদের ও নিজের প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেয়। সাঁওতাল প্রজারা অহীন্দ্রের পিতামহ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সোমেশ্বর চক্রবর্তীর নামে এই চরটির নাম দেয় 'রাঙাঠাকুরের চর'। অবশ্য কেউই জমির উপর নিজের সত্তা ধরে রাখতে পারে না — কলকাতার ব্যবসায়ী বিমল মুখার্জি সেখানে চিনির কল বসায়। উপন্যাসটির অল্প কিছু ঘটনা কলকাতাসহ বাইরে ঘটলেও বেশিরভাগ ঘটনা এই 'রাঙাঠাকুরের চর', রায়হাটে গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ঘটেছে। ঔপন্যাসিক এখানে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক

প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ আঞ্চলিক সীমা সংহতির প্রশ্নে আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণকেই বহন করে।

'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে দুই জমিদার বংশ — রায়-বংশের ইন্দ্র রায়, হেমাঙ্গিনী, অমল, উমা ও অন্যান্য শরিকের কিছু লোকজন এবং চক্রবর্তী-বংশের রামেশ্বর, সুনীতি, মহীন্দ্র, অহীন্দ্র প্রমুখের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই দুই বংশের মানুষজন ছাড়াও এই উপন্যাসে যেমন আছে ব্যবসায়ী বিমল মুখার্জি, চক্রবর্তীদের নায়েব যোগেশ মজুমদার, অচিন্ত্য বাবু, দোকান দার শ্রীবাস পাল ও তার ছেলে গণেশ প্রমুখদের মত সুবিধাবাদী ভদ্রশ্রেণির মানুষ, তেমনি আছে রংলাল, ননী পালের মত চাষিরা। এদের পাশাপাশি আছে দুই উপজাতি সম্প্রদায় বাগ্‌দী ও সাঁওতালরা। ঔপন্যাসিক বাগ্‌দীদের জীবন কথা দু'একটি আঁচড়ে শেষ করেছেন। এরা লেঠেল, জমিদারের হয়ে লাঠিয়াল বৃত্তি এদের জীবিকা। তাই জমিদারের প্রয়োজন হলে এরা যখন তখন লাঠি হাতে বেরিয়ে আসে। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবনকথাই মুখ্য। তারাশঙ্করের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'কালিন্দী'র বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাঁওতালদের সম্পর্কে বলেছেন — ''বীরভূমের গ্রামীণ অর্থনীতি বাংলার আর পাঁচটা জেলার মত কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের সাধারণ ভাগচাষিকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় সাঁওতালদের সঙ্গে — যেটাও এ অঞ্চলেরই নিজস্ব ব্যাপার। অল্প মজুরিতে কঠিন শ্রমের সাহায্যে এরা বীরভূমের কাঁকুরে বিমুখতাকে ব্যর্থ করে দেয়। একদিকে ধ্বংসমুখী সামন্ততন্ত্র এবং অপরদিকে সাঁওতাল কৃষকদের ঘর তুলতে গিয়ে যাযাবরত্ব ত্যাগের বাসনায় ইতিহাসের একটা পর্যায় স্পষ্ট।''[১৩২] এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবন ও জীবিকার অনেকটাই বিস্তারিত ছবি আছে। উপন্যাসে বিমলবাবু এবং অচিন্ত্যবাবু বাইরের লোক। বাকিরা প্রায় সবাই ঐ অঞ্চলের লোকজন। দুই জমিদার-বংশের উচ্চবর্ণের মানুষগুলি ও অন্যান্য সুবিধাভোগী লোকজন এবং বাগ্‌দী ও সাঁওতালরা সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

এখানে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ভদ্র-অভদ্র নানা ধরনের চরিত্র থাকলেও একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, এর প্রধান চরিত্র কালী নদীর উপর সদ্য জেগে ওঠা চরটি, সাঁওতালরা যার নাম দেয় 'রাঙাবাবুর চর', যা শুনে অহীন্দ্র নাম দেয় 'রাঙাঠাকুরের

চর'। সমালোচকেরা ইন্দ্র রায় এবং অহীন্দ্রের মধ্যে কাকে নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায়, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেও সকলের অজান্তে কখন এই চরটি নায়কত্বের দাবী নিয়ে হাজির হয় তা বোঝা যায় না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে চরটির গুরুত্ব বোঝাতে চেয়ে বলেছেন — ''বস্তুতঃ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুইটি — এক, মানুষ রামেশ্বর; ও দ্বিতীয় জড়প্রকৃতি কালিন্দীর চর।''[১৩৩] উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এই চরটির বিবরণ দিয়ে —

''নদীর ও-পারে একটা চর দেখা দিয়াছে।

রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী — ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ও-পারে চর জাগিয়াছে। এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পূর্বে ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি। এখন কালী রায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙন ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।

ওই চরটা লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল। . . . ''[১৩৪]

আর উপন্যাসটি শেষ হয়েছে এর অন্যতম চরিত্র রামেশ্বরের দৃষ্টিতে চরটির বর্ণনায় — ''ওই দূরে — নতুন ওঠা সর্বনাশা চরটার কোল ঘেঁষিয়া শীর্ণা কালিন্দীর বারোমেসে অগভীর অপরিসর জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। মন্থর তাহার গতি এখন। কালের ভগ্নী কালিন্দী! কালিন্দীর জলস্রোতের মধ্যে নূতন চরটার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। . . . আগে যেখানে কালিন্দীর জলে শুধু আকাশ ও নদীতীরের গাছ-গাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত, আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত — আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্রোতধারার উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনির্দেশ্য শাসনের মত ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল।''[১৩৫] এই দুই-এর মাঝে উপন্যাসের বিবাদ-বিসম্বাদ, লড়াই-সংঘর্ষ, মামলা-মোকদ্দমা থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত ঘটনা সংঘটনের পেছনে চরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘদিন পর রামেশ্বর চক্রবর্তীর পরিবার এবং ইন্দ্র রায়ের পরিবারের মধ্য সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক তৈরির পিছনেও চরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। চিনির কল স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে কাজকর্ম শুরু হয়েছে

তার পেছনেও আছে এই চরটি। উপন্যাসে প্রাচীন কালের সঙ্গে নবীন কালের বিরোধকে এই চরের প্রেক্ষাপটেই উপস্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটিতে চরটির এইরকম অনিবার্য প্রভাবের দিকে নজর দিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''অবশ্য গ্রামের চাষি প্রজার মধ্যে ইহা, একটা লোলুপতার তুফান বহাইয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে শ্বাপদ-সুলভ হিংস্র দীপ্তিও জ্বালাইয়াছে কাহাকেও কাহাকেও প্রলুব্ধ করিয়া সর্বনাশের রসাতলে পাঠাইয়াছে। যাযাবর সাঁওতাল-সম্প্রদায় অল্পদিনের জন্য ইহার আতিথেয় বক্ষে নীড় রচনা করিয়া আবার ইহার স্নেহ শীতল, অথচ পিচ্ছিল অঙ্ক হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে — চর ইহাদিগকে মাতার ন্যায় আহ্বান করিয়া বিমাতার ন্যায় বিসর্জন দিয়াছে। কলওয়ালা মিঃ মুখার্জির লৌহ-শাসনে ইহা নিজ বন্য প্রকৃতি হারাইয়া যান্ত্রিক সভ্যতার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং যন্ত্রোচিত নির্মমতার সহিত পূর্বতন প্রভুর সর্বনাশ-সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উপন্যাস মধ্যে কালিন্দীর চর যে একটি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।''[১৩৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরটিই কাহিনিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। এজন্য উপন্যাসটি থেকে চরটিসহ ঐ অঞ্চলটিকে কোনভাবেই সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না, চরটিকে সরিয়ে নিলে 'কালিন্দী' উপন্যাসটি আর উপন্যাস থাকে না। এটা আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠারই লক্ষণ।

এসবের পাশাপাশি উপন্যাসটিতে সেই অঞ্চলের মানুষদের জীবন-জীবিকারও পরিচয় আছে। এখানে প্রথমদিকে জমিদার নিয়ন্ত্রিত কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিচয় আছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বিমলবাবুর প্রবেশের পর চিনির কল স্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কৃষিসভ্যতা ছেড়ে শিল্পসভ্যতার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সে সময় কৃষকেরা শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। ঐ অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই কৃষিজীবী রংলালের মুখে শোনা যায় — ''কালী তো আমাদের সাধারণ নদী লয় দাদাবাবু, উনি হলেন সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী।''[১৩৭] এই কালী নদীর বুকে জেগে ওঠা 'রাঙাঠাকুরের চর'টিকে কেন্দ্র করেই ঐ অঞ্চলের মানুষগুলির জীবিকার বর্ণনা দেওয়া

আছে। সাঁওতালরা প্রথম এই চরটিকে চাষ-বাসের উপযোগী করে তোলে। সেখানে তারা ধান, গম, ভুট্টা, আখসহ নানা মরসুমী সব্জি চাষাবাদ করে -- ''ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চষিয়া খুঁড়িয়া নিড়ান দিয়া তাহারা ভুট্টা, সন, অড়হর বুনিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; জমির ধারে সারিবন্দী চারা, তাহাতে শিম, বরবটি, খেঁড়ো, কাঁকুড়ের অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধানের জমিগুলি চাষ দিয়া একেবারে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়িঘরের চালে নূতন খড় চাপানো হইয়া গিয়াছে, কাঁচা সোনার রঙের নূতন খড়ের বিছানি অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে।''[১৩৮] এরা বর্ষার সময় মহাজনের কাছে খোরাকি ধান নেয়, তারপর মনের আনন্দে চাষ চষে এবং ফসল উঠলে সুদসহ ধার শোধ দেয়। আবার এরা নিজেদের কাজের ফাঁকে জমিদারের জমিতেও চাষাবাদের কাজে বেগার খাটে। অবশ্য বিমলবাবুর খপ্পরে পড়ে এদের আর কৃষক থাকা হয় না, কেউ কেউ কলের শ্রমিক হয়ে যায়, বাকিরা সে অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে বাসগৃহ, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু কিছু বিবরণ আছে। এরা খড়ের চালার ছোট ছোট ঘর-বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে। প্রত্যেকের বাড়িতে এক টুকরো উঠোন থাকে। তবে সবকিছুই তাদের লেপা-মোছা ও নানা কর্মকুশলতার কারণে নিকানো-গুছানো ও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

খাবার-দাবারের ক্ষেত্রে এরা নিজেদের চাষকরা খাদ্যশস্য ও শাক-সব্জিকেই প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়াও মুরগি পোশাক কারণে মুরগির মাংসের পাশাপাশি চরটির বনাঞ্চল থেকে ধরা ইঁদুর, খরগোসের মাংসও রান্না করে অথবা পুড়িয়ে খায়। উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় তো বটেই অন্যান্য সময়েও দেশি মদ হাঁড়িয়া বা পচানীকে এরা পানীয়ের মধ্যে প্রথমে রাখে। অবশ্য বিমলবাবুর সৌজন্যে বিদেশি মদের সঙ্গেও এদের পরিচয় হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের বিস্তারিত বিবরণ তেমন না থাকলেও ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, সাঁওতাল মেয়েরা সাজ-গোজ করতে অত্যন্ত ভালোবাসে। সাজ-গোজের অলংকার হিসেবে তারা স্থানীয় নানা ধরনের রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুল ব্যবহার করে।

এই উপন্যাসে স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকরুচি, লোককথা প্রভৃতির বিবরণও আছে। উচ্চবর্ণের লোকজনদের ক্ষেত্রে এখানে হিন্দু-সংস্কৃতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জমিদার ইন্দ্র রায়ের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে রাঢ়ের তান্ত্রিক শাক্ত সাধনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অহীন্দ্র-উমার বিয়ে সংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার-বিশ্বাস, লোক-লৌকিকতায় উচ্চবর্ণের হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয় ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। তবে সাঁওতালদের জীবনচর্যার বর্ণনায় তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এক্ষেত্রে একদিকে তিনি যেমন তাদের মোড়ল কমল মাঝির মুখ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি সংক্রান্ত তাদের বিশ্বাস তথা পুরাকথাকে শুনিয়েছে, তেমনি দু'একটি অনুষ্ঠান-পরবের বিবরণও দিয়েছেন। অহীন্দ্রের পড়াশুনার কথা শুনে তার জাত ভাইদের সামনে একবার কমল মাঝি তার কাছে জানতে চায় — ''হ্যাঁ বাবু, এই যি পিথিমীটি, এই যি ধরতি-মায়ী — ইকে কে গড়লে? কি লেখা আছে পুঁথিতে তুদের?''[১৩৯] তার এই প্রশ্নের উত্তরে অহীন্দ্র পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিতে শুরু করলে কমল মাঝি তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে — ''উঁহু, তুকে এখনও অনেক পড়তে হবে। পিথিমীতে আগে ছিল জল। কিছুই ছিল না, শুধুই ছিল জল। তার পরে হ'ল কি জানিস? বলি শোন।''[১৪০] এসব বলে পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত একটা গল্পের অবতারণা করে। বাচন ভঙ্গির কারণে এই গল্পে তার তো বটেই সেখানকার সমস্ত সাঁওতালদের আন্তরিক বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই গল্পটিকে ঐ অঞ্চলের সাঁওতালদের পুরাণকথা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

উপন্যাসে সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে 'বাতুলী' পরবের উল্লেখ আছে। এর ব্যাখ্যায় মোড়ল কমল মাঝি বলেছে — ''নাম বটে 'বাতুলী' পরব। আবার 'কদ্‌লেতা' পরবও বুলছে। 'রোওয়া' পরবও বলে। 'বাইন' পরবও বুলছে। যারা যেমন মনে করে, বুলে।''[১৪১] শুধু তাই নয় এই পরব কোথায় কীভাবে পালিত হবে তার বিবরণও এখানে আছে — ''জাহন সারনে' — আমাদের দেবতার থানে গো পূজো হবে। 'এডিয়াসিম' — আমাদের মোরগকে বলে 'এডিয়াসিম', ওই মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দু-তিন রকম। তারপরে রাঁধা-বাড়া হবে উই দেবতাথানে, লিয়ে খেঁয়েদেয়ে সব নাচগান করব।''[১৪২]

সাঁওতালরা যে আদতে একটি ফূর্তিবাজ গোষ্ঠী তার পরিচয়ও উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এজন্য দেখা যায় কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তারা সময় সুযোগ পেলেই আনন্দে মেতে ওঠে, নাচ-গান করে — পুরুষরা মাদল বাজায় আর মেয়েরা নানা সুরে বিভিন্ন ধরনের গান গায়। উপন্যাসের একটি অংশে অহীন্দ্র সাঁওতালদের জমির বন্দোবস্ত করে দিলে তারা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে — ''নদীর ধারে আসিয়া মাদলের শব্দে ও সাঁওতাল-মেয়েদের গানের সুরে তাহার চিন্তার একটানা ধারাটা ভাঙিয়া গেল। ও-পারের চরে আজ প্রবল সমারোহে উৎসব হইয়াছে, আজিকার দিন তাহাদের একটি পরমকাম্য শুভদিন, তাহাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়াছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগি, একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া নাকি পূজা হইয়াছে, তাহার পর আকণ্ঠ পচুই মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অদ্ভুত জাত।''[১৪৩] 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে সাঁওতালদের এইসমস্ত পরিচয়ের দিকে নজর দিয়েই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''সাঁওতালগোষ্ঠির জীবনযাত্রা ও সমাজবন্ধনের বর্ণনায় অভিনবত্বের চিত্রসৌন্দর্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাহাদের উদ্ভট কল্পনা, সরল আমোদ-প্রমোদ ও বিচিত্র সমাজব্যবস্থা লেখকের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেয়।''[১৪৪]

উপন্যাসটি সাধুভাষায় রচিত। ভদ্র চরিত্রেরা মার্জিত রাঢ়ী ভাষায় অর্থাৎ মান্য চলিত বাংলায় কথা বলেছে। তবে নিম্নতর চরিত্রের সংলাপ রচনায় ঔপন্যাসিক রাঢ়ী উপভাষার স্থানীয় আঞ্চলিক রূপকেই গ্রহণ করেছেন। রংলাল পাল, ননী সাহা, নবীন বাগ্‌দীর মত স্থানীয় নিম্ন বর্ণের এবং নিম্ন বৃত্তির মানুষেরা এই ভাষায় কথা বলেছে। যেমন, রংলাল বলেছে — ''এই তো ক বছর হল গো বাবু মশায়, একটা বাছুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের উপর। বাস্, আর যায় কোথা, ইয়া এক পাহাড়ে চিতি — ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে। আঃ, সে কি বাছুরটার চেঁচানি! বাস্, বার কতক চেঁচানির পরই ধরলে পাক দিয়ে জড়িয়ে। দেখতে দেখতে বাছুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচির মত লম্বা। কিন্তু কারু সাহস হল না যে এগিয়ে যাই।''[১৪৫] সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষগুলিও স্থানীয় আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলেছে। তবে তাদের ভাষায় নিজেদের সম্প্রদায়ের ছাপ স্পষ্টভাবে পড়েছে। যেমন, কমল মাঝি বলেছে —

''হুঁ ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ! হুঁ, ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল।''[১৪৬] চূড়া মাঝি বলেছে -- ''টাকা লইলে কিছু হয় না বাবু, টাকা নাই। খেপে কি করব? আর বাবু খেপে মরেই যদি যাব তো খেপলম কেনে বল্? বুদ্ধি করলম ইবার আমরা।''[১৪৭] যুবতী মেয়ে সারী বলেছে — ''কেনে ঝগরা করবে না কেনে? চ'লে যাবে না কেনে? তু বাবু, বিচার ক'রে দে! বুড়া-বুড়ীর করণ দেখ্।''[১৪৮] এই ভাবে আঞ্চলিক কথ্যরীতির ভাষারীতিকেও তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন। এটা আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তকে পূরণ করে।

এভাবে 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেকগুলি শর্ত পালিত হয়েছে। তবে উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে নি। এই উপন্যাসের সমস্যা যতক্ষণ পর্যন্ত কালিন্দীর চর অর্থাৎ 'রাঙাঠাকুরের চর' এবং তার ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বিমলবাবুর আগমন এবং অহীন্দ্রের কর্মধারা উপন্যাসের পটকেই বদলে দিয়েছে। ফলে উপন্যাসটিতে এক মহাকাব্যোপম বিশাল পটভূমির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উপন্যাসটির নাম 'কালিন্দী'। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে কালিন্দী নদী এবং তার বুকে জেগে ওঠা চরটির কথাই বারবার ব্যঞ্জিত হয়। উপন্যাসটিতে এর সার্বিক গুরুত্বও আছে। এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এগুলি উপন্যাসটির আঞ্চলিক ধর্মের পরিচয়কে অনেকটা উদ্‌ঘাটিতও করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত 'কালিন্দী' উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার গণ্ডীকে অতিক্রম করে গেছে। কারণ বিমলবাবুর আগমনে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির আঞ্চলিকতা ভেঙে যেতে শুরু করেছে -- আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটি মেনে নেওয়া গেলেও অহীন্দ্রের পরিবর্তিত কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক উপন্যাসের পরিপন্থী বলেই মনে হয়। ফলে আঞ্চলিকতার নিরিখে বিচার করলে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস না হয়ে আঞ্চলিকতার লক্ষণধর্মী উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি বিশিষ্ট উপন্যাস হল **'গণদেবতা'** ও **'পঞ্চগ্রাম'**। এর মধ্যে 'গণদেবতা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে। আর 'পঞ্চগ্রাম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে অর্থাৎ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে। এই উপন্যাস দু'টির কাহিনি অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ সংযোগ আছে। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি 'গণদেবতা'র পরিপূরক হওয়ায় এ দু'টিকে একটি উপন্যাস ধরা যেতেই পারে। ঔপন্যাসিক নিজেও সেরকমই ভেবেছিলেন। তাই তিনি প্রথমটির নাম 'চন্ডীমণ্ডপ' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'পঞ্চগ্রাম' রেখে দু'টিকে একসঙ্গে 'গণদেবতা' রাখার কথা বলেছিলেন — ''গণদেবতা' বইখানি 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। এটি তাহার অংশবিশেষ; — 'চন্ডীমণ্ডপ' নামাঙ্কিত অংশ। দ্বিতীয় অংশ 'পঞ্চগ্রাম' নামে বাহির হইতেছে।''[১৪৯] এজন্য পৃথক পৃথক আলোচনায় না গিয়ে অনায়াসেই এই উপন্যাস দু'টির একত্রে আলোচনা করা যায়। অধিকাংশ সমালোচকও সেটাই করেছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাস দু'টির পৃথকভাবে আলোচনা করলেও উপন্যাস দু'টির সম্পর্ককে অস্বীকার করেননি। 'গণদেবতা'র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — ''গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসে পল্লীজীবনের আর একটা সমস্যাসংকুল দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এখানে আধুনিক অবস্থা-পরিবর্তনের প্রভাবে গ্রাম্যসমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কথা আলোচিত হইয়াছে; গ্রাম্যপঞ্চায়েতের আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা, সমাজশৃঙ্খলারক্ষার প্রয়াস বর্তমান যুগের অনুপযোগী প্রতিবেশে কিরূপে প্রতিহত হইয়াছে তাহাই উপন্যাসের বর্ণনার বিষয়।''[১৫০] আর 'পঞ্চগ্রাম'-এর প্রসঙ্গে বলেছেন — ''পঞ্চগ্রাম' (জানুয়ারী, ১৯৪৪) 'গণদেবতা'য় পল্লীসমাজের যে ধারাবাহিক জীবনযাত্রা চিত্রিত হইয়াছে তাহারই অনুবর্তন। এই উপন্যাসে পল্লীজীবনের অভ্যস্ত কক্ষাবর্তন কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনের চাপে সংকটময় পরিণতির উগ্রতর আবেগ ও দ্রুততর গতিবেগ অর্জন করিয়াছে।''[১৫১] সমালোচক শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে এই উপন্যাস দু'টির পৃথকভাবে পরিচয় দিলেও এগুলির সম্পর্কের কথাও বলেছেন। 'গণদেবতা' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল — ''বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও

তার ক্রমিক পরিবর্তনের কাহিনী। কেমন করে গ্রাম-সমাজের প্রাচীন রূপ ভাঙছে, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে বিভাজিত সমাজে বিদ্রোহ-সুর ধ্বনিত হচ্ছে — ন্যায়রত্ন থেকে পৌত্র বিশ্বনাথ, এই তিনপুরুষের জীবনের মধ্য দিয়ে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর বিস্তার চরিত্রগুলির স্পষ্টতা এবং লেখকের মানবতাবোধ সব মিলে উপন্যাসটি এক অসামান্য মহত্ত্ব লাভ করেছে।''[১৫২] আর 'পঞ্চগ্রাম' সম্পর্কে তিনি বলেছেন — ''গণদেবতা উপন্যাসের পরবর্তী অংশ। তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন গ্রামবাংলার সমাজ জীবনের সমগ্রতা। কৃষক সমাজের দুর্বলতা এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ সংহতি, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, জমিদারের কূট রণনীতি সর্বোপরি গ্রামের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক — তার নীচতা, ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও আবেগময় মহত্ত্ব — এই সব মিলিয়ে কাহিনীতে এক মহাকাব্যের বিশালতা।''[১৫৩] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গণদেবতা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন — ''গণদেবতা' (১৯৪২), শুধু তারাশঙ্করের নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগ পরিচায়ক উপন্যাস। একটা দেশ একটা জাতির মোড় ফেরার আশ্চর্য আলেখ্য এই উপন্যাস। আশ্চর্য এই ঔপন্যাসিকের সমাজবোধ, ইতিহাসের ছন্দজ্ঞান।''[১৫৪] 'পঞ্চগ্রাম'কে এর অনুগামী উপন্যাস বলে তাঁর বক্তব্য হল — ''অনুবর্তী উপন্যাস 'পঞ্চগ্রাম'-এ (১৩৫০) তারাশঙ্কর তাঁর পটভূমিকাকে আরো বিস্তৃতি দিয়েছেন। ভৌম অর্থনৈতিক সম্পর্কের জট ও জটিলতাকে আরো প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।''[১৫৫] অবশ্য অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসকে প্রায় সর্বত্র একসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি এই উপন্যাস দু'টির প্রশংসায় এগুলি বাংলা উপন্যাসের মোড় ফিরিয়েছে বলে মনে করেছেন — '' . . . তারাশঙ্কর লিখেছিলেন তাঁর দুই প্রধান উপন্যাস 'গণদেবতা' (১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩)। এ দুটি উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের মোড় ফিরিয়েছে। এই প্রথম গোটা লোকজীবন, গ্রামীণ সমাজ উপন্যাসে রূপ পেল।''[১৫৬]

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' — দু'টি উপন্যাসেরই রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম ও সেখানকার সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ছবি স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন — ''ধাত্রীদেবতা থেকে

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম পর্যন্ত তারাশঙ্করের পটভূমি এবং বিষয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকের বীরভূমের পল্লীজীবন — যেখানে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের আভিজাত্য-বোধের ভগ্নাবশেষ যেমন আছে, তেমনি আছে উঠ্‌তি ব্যবসায়ীদের ও কলকারখানার মালিকদের সঙ্গে মুমূর্ষু জমিদার তন্ত্রের অসম সংগ্রাম। অন্যদিকে আছে গ্রামের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অশিক্ষা।''[১৫৭] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — ''গণদেবতা (১৯৪২) পঞ্চগ্রামে (১৯৪৩) তারাশঙ্কর গোটা জনপদকেই কাহিনীর প্রধান চরিত্ররূপে গড়ে তোলেন। ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী বীরভূম-জনপদের মানুষ এক বিশেষ কালের মধ্যে (১৯২২-২৩) আশা আকাঙ্ক্ষা সংগ্রাম ব্যর্থতা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক জীবনের ভেতর ভেতর যে সংঘর্ষ ঘটছে তাতে গ্রাম্যজীবনের ভিত্তিমূল বিচলিত হয়ে যাচ্ছে। পুরোনো মূল্যবোধের অবসান ও নতুন আদর্শের অভ্যুত্থানের পটে সামাজিক-আর্থনীতির সংঘর্ষ কীভাবে গ্রামের মানুষদের বদলে দিচ্ছে তারই অন্তরঙ্গ কাহিনী এ দুটি উপন্যাস।''[১৫৮] এদের দু'জনেরই বক্তব্য থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, তারাশঙ্করের বেশির ভাগ উপন্যাসের মত এই দু'টি উপন্যাসেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালীন পরবর্তী বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় বিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা জমিদার নির্ভর সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আধুনিক পুঁজি নির্ভর ধনতন্ত্রের বিরোধের প্রসঙ্গ এসেছে। সেই সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতি থেকে শুরু করে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রসঙ্গও এসেছে। 'গণদেবতা'য় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে শিবকালীপুর গ্রামের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যা। আর 'পঞ্চগ্রাম'-এ শিবকালীপুরের কথা তো আছেই, তার পাশাপাশি কঙ্কনা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম ও দেখুড়িয়া — এই চারটি গ্রামের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার কথাও প্রাধান্য পেয়েছে। এভাবে উপন্যাস দু'টিতে এই পাঁচটি গ্রামের জীবনকথা পরিবেশিত হয়েছে। এজন্য এদের পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় আরও বলেছেন — ''ময়ূরাক্ষী বাঁধের ওপারে আধা-শহর, রেলওয়ে জংশন; এপারে শিবকালীপুর গ্রাম, ক্রোশখানেক দূরে কঙ্কনা গ্রাম। এই শিবকালীপুর গ্রামের মানুষদের সুখ দুঃখ প্রতারণা ষড়যন্ত্র ঈর্ষা ভালবাসা আত্মত্যাগ-মেশানো জীবনের কাহিনী গণদেবতা পঞ্চগ্রাম। ১৯২২-৩২ সালের সময়সীমায় বাধা

এই গ্রামজীবনকে অবলম্বন করেই তারাশংকর গোটা সমাজের ভাঙা-গড়ার ছবি এঁকেছেন।''[১৫৯]

তারাশঙ্কর 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটির ভূমিকায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তাঁর 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল — ''সমাজের পটভূমিকায় পল্লীর কথা বলিবার আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে সব কথা বলা সম্ভবপর হয় নাই। এবং এতবড় পুরাতন দেশ ও সমাজের অতি প্রাচীন ইতিহাসের সব কথা আমার জানাও নাই। তাই অকথিত অনেক কিছু থাকিল। তবে যাহার কথকতা করিয়াছি — তাহার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমার দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার।''[১৬০] এই সংক্রান্ত আলোচনায় বলা যায় যে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তারাশঙ্কর জাতীয় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসেন। এরপর কংগ্রেসের সেবামূলক কাজে যোগ দিয়ে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে কংগ্রেসের আঞ্চলিক সংস্থার সংগঠন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সার্বিকভাবে গ্রামের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এইসব কাজের সুবাদেই বাংলার গ্রামজীবনের নানা সমস্যার স্বরূপ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাঁর মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে। ফলে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে দেশের মানুষ এবং তাদের সমাজ সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয়। এই জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস রচনার প্রেরণা জোগায়। পরস্পরের পরিপূরক এই দু'টি উপন্যাসে তিনি বাংলার গ্রাম সমাজের একটি সামগ্রিক রূপ চিত্রণে অগ্রণী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গেও অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য স্মরণ করা যায় — '' . . . গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় তিনি অভিজ্ঞতার শিল্পী, আর অভিজ্ঞতার কোনো ফাঁক বা ত্রুটি নেই। যে পরিবর্তমান জীবনকে তিনি গভীরভাবে দেখেছেন, তাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন।''[১৬১] এদের পূর্বে রচিত তারাশঙ্করের কোনো কোনো ছোটগল্প ও উপন্যাসে গ্রাম্য চাষির সুখ-দুঃখ, জমিদারতন্ত্রের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়, বৈষ্ণব জীবনের বিষাদ ও মাধুর্য-এর মতো বিষয়গুলি এলেও সেগুলিতে গ্রামীণ জীবনকথার পূর্ণাঙ্গরূপ আসেনি। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেই তারাশঙ্কর প্রথম গ্রামীণ জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ চিত্রণ করেন। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ও একথা মেনে নিয়েছেন — ''গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম জনপদ-জীবনের প্রথম সামগ্রিক আলেখ্য। গোটা মানুষ, সজীব

প্রকৃতি আর সমাজ-পরিবর্তনের খরস্রোত চিত্রণে তারাশঙ্করের নৈপুণ্য তাঁকে তাঁর কালের ক্রনিক্লার করে তুলেছে। বাংলা উপন্যাসে এটি নতুন ধারা। সমাজের ভাঙন, শতাব্দী-সঞ্চিত শাসন ও শৃঙ্খলার অবসান, গ্রাম্যসমাজে ধনের প্রাধান্য, উচ্চবর্ণের মহিমার বিলুপ্তি, আর্থনীতিক স্বনির্ভরতার স্থানে কল-কারখানার সস্তা জিনিসের প্রাবল্যে গ্রাম্যশিল্পীর অসহায়তা ও বিদ্রোহ, জমিদার ও ধনী চাষির সঙ্গে গরীব চাষির লড়াই, কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শিবকালীপুর গ্রামের চাষিদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পচ্যুতি, প্রবলের কাছে দুর্বল গরীবের আত্মসমর্পণ, আদর্শবাদী দেবু ঘোষের নেতৃত্বের প্রতি গরীব চাষির অনাস্থা, ময়ূরাক্ষীর বানের মুখে, খরা ও কলেরার আক্রমণে অসহায় গ্রামবাসীর পরাজয় — সব মিলিয়ে গোটা গ্রাম্যজীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, তারই মাঝে গোটা মানুষের অভ্যুদয় বাংলা উপন্যাসের প্রতিমায় নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল।''[১৬২] তিনি আরও বলেছেন — ''গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে তারাশঙ্কর দেখালেন গ্রামীণ সমাজ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে সংরক্ষিত গ্রামীণ সমাজের শাসন ও অবরোধকে ভেঙে দিচ্ছে, কীভাবে আধুনিক নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য মুক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে গ্রামের অবহেলিত মানুষকে সমাজ ভেঙে আসতে প্রলুব্ধ করছে, কীভাবে জীবনের গভীরে প্রোথিত শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি মূল আল্‌গা হচ্ছে, তা এখানে চিত্রিত হয়েছে। দুর্বার সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের তরঙ্গাঘাতে গ্রামীণ সমাজ ধীরে অথচ নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে বদলে যাচ্ছে, তার বিশ্বস্ত ছবি এখানে পাই।''[১৬৩] তাই তারাশঙ্করের অগ্রজ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় যে, বাংলা উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রথম চিত্রিত হয়েছে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' — এই উপন্যাস দু'টিতে।

এগুলিতে একদিকে আছে অসংখ্য বিচিত্র মানুষের শোভাযাত্রা, অপরদিকে আছে রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের একটি বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকায় গ্রাম-বাংলার সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, লোকাচার-লোকবিশ্বাস, পূজা-পালা-পার্বণের বিস্তারিত পরিচয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে দুই কালের প্রেক্ষাপটে বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যে ভাঙন ধরেছিল, তার বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক দলিল হল এই দু'টি উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে এই দু'টি উপন্যাসের পূর্বে যে সমস্ত উপন্যাস রচিত হয়েছে, সেগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলিতে ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দেবনাথ ঘোষ ওরফে দেবু পন্ডিতের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় যে, এই দু'টি উপন্যাসে পৃথক পৃথক ব্যক্তির সুখ-দুঃখ নিয়ে তৈরি হয়েছে 'গণ'; এই 'গণ'ই হলেন দেবতা, যিনি সমাজের রথের রশি টেনে নিয়ে চলেন। এখানে দেবু, অনিরুদ্ধ, পাতু, দুর্গা, হরেন, এরসাদ, শ্রীহরি, পদ্ম, ন্যায়রত্ন, দ্বারিক চৌধুরী, যতীন প্রমুখদের নিয়ে তৈরি হয়ছে যে গণশক্তি — তার নামই 'গণদেবতা'। ঔপন্যাসিক এই দু'টি উপন্যাসে সেই গণদেবতারই গাথা রচনা করেছেন। আর তা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, বিবর্তনের অনিবার্য ধারা মেনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলার গ্রামসমাজের পরিবর্তনকে। সেখানে এতদিনকার ভূমি নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জায়গা নিতে শুরু করে পুঁজি নির্ভর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ফলে গ্রামীণ সমাজ ভেঙে পড়ে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে প্রাচীন রীতিনীতি সম্পর্কে মূল্যবোধ হারাতে থাকে, ধনীর দাপট বাড়ে, গ্রাম্য চন্ডীমন্ডপ, তার গ্রামের ন্যায়নীতি-আইনের রক্ষকের ভূমিকা ত্যাগ করে নব্য জমিদারের কাছারি বাড়িতে পরিণত হয়। নতুন ও পুরোনো জীবনাদর্শের সংঘাতে পুরোনো জীবনাদর্শ পিছু হটে, নব্য ধনিক শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমজীবীদের আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করে। এসব চিত্র সমকালীন বাংলার যে কোনো অঞ্চলের সামগ্রিক গ্রামীণ চিত্র হয়ে উঠেছিল। তবে এই উপন্যাস দু'টিতে তারাশঙ্কর এসব কিছুকেই রাঢ়বঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকায় পরিবেশন করেছেন। তিনি এগুলিতে এই সমস্ত সামাজিক পরিবর্তনগুলির পাশাপাশি ঐ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্ত নানা পালা-পার্বণ, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোককথা, কাহিনি-কিংবদন্তীকেও তুলে এনেছেন। তাই এই উপন্যাস দু'টিতে রাঢ় অঞ্চলের স্থানীয় জনজীবনের একটা সামগ্রিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের এই উপন্যাস দু'টিতে আঞ্চলিকতার নানা দিক উঠে এসেছে। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের মত এগুলিরও পটভূমি রাঢ়বঙ্গের বীরভূম জেলা। তবে এগুলিতে তিনি সমগ্র বীরভূম জেলাকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন নি — বীরভূম জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রেক্ষিতে কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও

দেখুড়িয়া — এই পাঁচটি গ্রামকে গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে 'গণদেবতা'য় মূলত শিবকালীপুর প্রাধান্য পেয়েছে। আর 'পঞ্চগ্রাম'-এ কমবেশি পাঁচটি গ্রামের প্রসঙ্গই এসেছে। 'গণদেবতা'য় এই পাঁচটি গ্রামের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — ''গ্রাম হইতে বাহির হইলে বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল — প্রস্থে চার মাইল; কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানা গ্রামের অবস্থিতি; এবং পাঁচখানা গ্রামের সীমানার মাঠ ময়ূরাক্ষী নদীর ধার পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মাঠখানার দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমে অর্থাৎ তিনদিকে ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরভূমি জুড়িয়া এই মাঠখানার উর্বরতা অদ্ভুত। অংশের নামই হইল 'অমরকুণ্ডর মাঠ' অর্থাৎ মাঠে ফসলের মৃত্যু নাই। . . . শিবকালীপুর নামেমাত্র দুইখানা গ্রাম; শিবপুর ও কালীপুর, দুই গ্রামের বসতির মধ্যে কেবল একটা দীঘির ব্যবধান। কালীপুর গ্রাম খানাই বড়, ওই গ্রামেই লোকসংখ্যা বেশি, শ্রীহরি, দেবু প্রভৃতি সকলেই বাস করে এখানে।''[১৬৪] ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসদ্বয়ে রাঢ়বঙ্গের পাঁচটি গ্রামকেই শুধু গ্রহণ করেন নি, সেইসঙ্গে সুযোগ পেলেই গ্রামগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। যেমন, একজায়গায় যতীনের দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনায় লিখেছেন — ''যতীন জামা গায়ে দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অতিক্রম করিয়া আসিয়া পড়িল মাঠে। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠে। মাঠের প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ, বাঁধের গায়ে কচি সবুজ শরবনের চাপ। তাহারই ভিতর হইতে উঠিয়াছে তালগাছের সারি। মধ্যে মধ্যে পলাশ-পালতে-শিমূল-শিরীষ-তেঁতুলের গাছ। গাছগুলির মাথার উপরে অস্পষ্ট আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের গায়ে জংশন-শহরের কলের চিমনী।''[১৬৫] এইভাবে মাঝেমাঝেই অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতির বর্ণনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধানতম শর্ত আঞ্চলিক সীমা-সংহতির ব্যবহারকে অনেকটাই পূরণ করা হয়েছে।

এই উপন্যাসদ্বয়ে গৃহীত অঞ্চলটির ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রকৃতিতে ঔপন্যাসিক সেই অঞ্চলের নানা বর্ণের, নানা বৃত্তির অসংখ্য চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এই রকম চরিত্রদের উপস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল — ব্রাহ্মণত্বের প্রতিনিধি মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন, মহিমাভ্রষ্ট অথচ আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট

প্রাক্তন জমিদার দ্বারিক চৌধুরী, আভিজাত্যকামী নিষ্ঠুর ছিরু ওরফে শ্রীহরি পাল, অন্তজীর্ণ গ্রামসমাজের শাসনবিরোধী অনিরুদ্ধ কামার, অন্যায়-বিরোধী স্বৈরিণী দুর্গা মুচিনী, অনিরুদ্ধর স্ত্রী পদ্ম কামারনী, রাজবন্দী যতীন, ধনী মুসলমান চাষি দৌলত শেখ, আদর্শবাদী দেবু ঘোষ, ব্রাহ্মণ্য গৌরব-ভ্রষ্ট উপবীতবর্জনকারী ন্যায়রত্ন-পৌত্র বিশ্বনাথ, ইরসাদ, রহম চাচা, জোসেফ নগেন্দ্র রায় — সকলেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। রুক্ষ্ম রাঢ়ভূমি, শ্যামল ধানক্ষেত, ময়ূরাক্ষীর আকস্মিক বান, ঘেঁটুর গান, নবান্ন উৎসবের ঢাকের শব্দ, ঘন আঁধারে ডাকাতের সংকেতধ্বনি — সমস্ত মিলে এক চমৎকার পরিবেশ গড়ে তুলেছে।''[১৬৬] এতসব লোকজনের মধ্যে দেবনাথ ঘোষ ওরফে দেবু পণ্ডিত নায়ক হিসেবে পরিগণিত হয়। তার মধ্যে নায়কোচিত নানা বৈশিষ্ট্য থাকলেও বারবার মনে হয় সে যেন ঐ অঞ্চলটির মধ্যেই আবদ্ধ — উপন্যাসদ্বয়ে গৃহীত অঞ্চলটিকে বাদ দিলে তার ভিন্ন কোনো অস্তিত্ব নেই। এজন্য মনে হয় দেবু পণ্ডিত নয়; রাঢ়বঙ্গের সেই অঞ্চলটির গ্রামসমাজই নায়কের ভূমিকা পালন করেছে। একথা সমালোচকরাও মেনে নিয়েছেন — ''গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের পটভূমি অনেক ব্যাপক বিস্তীর্ণ। এখানে তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছেন। সমাজবোধে উদ্দীপ্ত যুগ-পরিবর্তন সচেতন এক শিল্পীর এখানে দেখা পাই। দেবু ঘোষ এ দুই উপন্যাসের নায়ক বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজই নায়ক। এখানেই তারাশঙ্কর যথার্থ আধুনিক জীবনশিল্পী, যুগের রূপকার, জনপদ-জীবনের আলেখ্যকার।''[১৬৭] তিনি এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামসমাজকেন্দ্রিক উপন্যাস 'পল্লীসমাজ'-এর নায়ক রমেশের সঙ্গে দেবু ঘোষের তুলনায় বলেছেন — ''শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬)-এর নায়ক রমেশ আর তারাশংকরের 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' (১৯৪২-৪৩)-এর নায়ক দেবু ঘোষ, এ দুজনের জীবনদৃষ্টির তুলনামূলক বিচারে অনুধাবন করা যায়, শরৎচন্দ্রে তারাশংকরে তফাৎটা কোথায়। শরৎচন্দ্রে কেবল সহানুভূতি, দরদ; তারাশংকরে আছে সমাজবোধ, যুগ-পরিবর্তন-সচেতনতা, বাস্তব আনুগত্য।''[১৬৮] সুতরাং আঞ্চলিক উপন্যাসে যেমন ব্যক্তি মানুষের চাইতে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটিই সর্বাঙ্গীণ প্রভাব বিস্তার করে নায়কত্বের মর্যাদা লাভ করে, তার পরিচয়ও এই উপন্যাসদ্বয়ে আছে।

এই উপন্যাসদ্বয়ের চরিত্রদের জীবন-জীবিকার পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মূলত জমিদার নিয়ন্ত্রিত কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন। তবে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে যে সময়টিকে গ্রহণ করা হয়েছে, সে সময় বাংলাদেশ থেকে জমিদার নিয়ন্ত্রিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদায় নিচ্ছিল এবং পুঁজি নিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাড়ম্বরে তার স্থান গ্রহণ করছিল। সে সময় ধীরে ধীরে গ্রাম্য চন্ডীমন্ডপীয় সংস্কৃতির স্থান নিচ্ছিল আধুনিক যন্ত্রনির্ভর কলকারখানা। তাই উপন্যাসদ্বয়ে কঙ্কণার জমিদারগণ, ছিরু পাল প্রমুখের জমিদারী কাজকর্মের যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে কৃষক থেকে শুরু করে কামার, কুমোর, নাপিত, মুচি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পেশার ও বৃত্তির কাজকর্মের বিবরণের পাশাপাশি সে অঞ্চলে সদ্য স্থাপিত কলকারখানায় সেখানকার মানুষজনের কাজ গ্রহণ করার কথাও এসেছে। সেইসঙ্গে দেবু পন্ডিত, রাজবন্দী যতীন, ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করার প্রবণতাও দেখা যায়।

এই উপন্যাসদ্বয়ে হিন্দু ও মুসলমান — বাংলার এই দুই প্রধান ধর্মবিশ্বাসের মানুষজনকে ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেছেন। এর মধ্যেও বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দিদের মতো নিম্নবর্ণের নানা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তবে শুধু উল্লেখই নয়, এদের সম্প্রদায়গত নানা কার্যাবলীর উল্লেখও আছে। যেমন, দেখুড়িয়া গ্রামের ভল্লাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে — ‘‘ভল্লা — অর্থাৎ বাগ্‌দীর দল। বাংলাদেশে ভল্লা বাগ্‌দীরা বহু বিখ্যাত শক্তিমান সম্প্রদায়। দৈহিক শক্তিতে, লাঠিয়ালির সুনিপুণ কৌশলে, বিশেষ করিয়া সড়কি চালনায় নিপুণতায় ইহারা এককালে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিল। এখনও দৈহিক শক্তি ও লাঠিয়ালির কৌশলটা পুরুষ পরম্পরায় ইহাদের বজায় আছে। ডাকাতিটা এককালে ইহাদের গৌরবের পেশা ছিল। ইংরেজ আমলে — বাংলা-দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের নব-জাগরণের সময় নব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ-নেতাদের সহযোগিতায় শাসক সম্প্রদায় বাংলার নিম্নজাতির দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই ভল্লাদের বহুল পরিমাণে দমন করিয়াছেন। তবুও ইহারা একেবারে মরে নাই। আজ অবশ্য তাহাদের শক্তির ঐতিহ্য অত্যন্ত গোপনে পোষে; মেয়েদের মত ঘাঘরা-কাঁচুলী পরিয়া রায়বেশের দল

গড়িয়া নাচিয়া বেড়ায়। ক্ষেত্রবিশেষে একটু বেশি পুরস্কার পাইলে দৈহিক শক্তি ও লাঠি খেলায় নিপুণতার কসরৎ দেখায়। সাধারণত এখনও ইহারা চাষি; বাহ্যত অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, কিন্তু মধ্যে মধ্যে — বিশেষ করিয়া এই বর্ষাকালে কঠিন অভাবের সময় তাহাদের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া ওঠে। তখন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কয়েকদিন অভাব অভিযোগের দুঃখ ব্যথার কথা বলিতে বলিতে কখন যে ডাকাতির পরামর্শ আঁটিয়া বসে; সেকথা নিজেরা বুঝিতে পারে না। পরামর্শ পাকিয়া উঠিলে তাহারা একদা বাহির হইয়া পড়ে। ভল্লা বাগ্‌দী ছাড়াও অবশ্য এই ধারার সম্প্রদায় আছে; ডোম আছে, হাড়ি আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই শ্রেণীর দল আছে, আবার সকল সম্প্রদায়ের লোক মিশ্রিত দলও আছে।''[১৬৯] বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও পঞ্চগ্রামের মানুষজন মিলেমিশে পরস্পরের সহাবস্থানেই বাস করত। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে তেমন কোন বিরোধও ছিল না — ''পাঁচখানা গ্রাম — মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা, এই লইয়া এককালে হিন্দু সমাজের পঞ্চগ্রাম গঠিত ছিল। তারপর কবে কেমন করিয়া সমগ্র কুসুমপুর মুসলমানের গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর, হিন্দু সামাজিক বন্ধন হইতে কুসুমপুর দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তবুও একটা নিবিড় বন্ধন ছিল কুসুমপুরের সঙ্গে, এককালে কুসুমপুরের মিঞা সাহেবরাই এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। কুসুমপুরের মিঞাদের প্রদত্ত নাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তরের জমি এ অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণে এবং বহু দেবস্থান আজও ভোগ করিতেছে। আবার কুসুমপুরের প্রান্তে যে মসজিদটি দেখা যায়, সেটির নিম্নাংশ যে এককালে কোনো দেবমন্দির ছিল সেটি দেখিবামাত্র বুঝা যায়। ধর্মকর্ম, পালা-পার্বণ এবং বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে দুই সমাজের মধ্যে লৌকিকতার আদান-প্রদানও ছিল, বিশেষত বিবাহাদি ব্যাপারে দুই পক্ষে সহযোগিতা ছিল নিবিড়। . . . হিন্দুদের পূজা অর্চনায় পূজার ব্যাপার চুকিয়া গেলে মুসলমানেরা প্রতিমা দেখিতে আসিত, বিসর্জনের মিছিলে যোগ দিত, এককালে মিঞাসাহেবদের দলিজার সম্মুখ পর্যন্ত বিসর্জনের মিছিল যাইত, মিঞাসাহেবরা প্রতিমা দেখিতেন, হিন্দুদের জন্য সেখানে তামাকের বন্দোবস্ত থাকিত। মুসলমানের মহরমের মিছিলও হিন্দুদের গ্রামে আসিত, তাজিয়া নামাইয়া তাহারা লাঠি খেলিত, তামাক খাইত।''[১৭০]

হিন্দুধর্মের নানা লোকবিশ্বাস, লোককথা ও লোক-উৎসবের কথাও এই উপন্যাসদ্বয়ে আছে। গৃহীত অঞ্চলের লোক-উৎসব ও পূজা-পার্বণের মধ্যে 'ইতুলক্ষ্মী', 'ঘেঁটু পূজা', 'গাজন', ধর্মপূজা', 'ব্রতলক্ষ্মী', 'পৌষ-উৎসব', 'অম্বুবাচী' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি কমবেশি বাংলার সর্বত্র দেখা গেলেও গৃহীত অঞ্চলটির প্রেক্ষিতে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। যেমন, 'ইতুলক্ষ্মী'র বর্ণনায় বলা হয়েছে — ''অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে 'ইতুলক্ষ্মী' পর্ব আসিয়া গেল। অন্যান্য প্রদেশে — বাংলাদেশের বিশেষ অঞ্চলে কার্তিক-সংক্রান্তি হইতেই ইতু বা মিত্র ব্রত আরম্ভ হয়, শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। রবি শস্যের কল্যাণ কামনা করে সূর্য দেবতার উপাসনা হইতেই নাকি ইহার উদ্ভব। দেবুদের দেশে কিন্তু সমগ্র মাস ধরিয়া সূর্য দেবতার আরাধনার প্রচলন নাই। এদেশে রবি শস্যের চাষেরও বিশেষ প্রসার নাই; ধান-চাষ এখানকার প্রধান কৃষি-কর্ম। ইতুপর্বকে এখানকার ইতুলক্ষ্মী বা ইতু সংক্রান্তি পর্ব বলা হয়। হৈমন্তী ধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার শুভ প্রারম্ভের পর্ব এটি এবং রবিশস্যের আবাহনও বটে। চাষিদের আপন খামারে ইহার অনুষ্ঠান। খামারের ঠিক মধ্যস্থলে শক্ত একটি বাঁশের খুঁটি পুতিয়া সেই খুঁটির তলায় আলপনা দিয়া সেইখানে লক্ষ্মীর পূজার ভোগ হয়। ধান মাড়াইয়ের সময় ওই খুঁটিটির চারদিকেই ধানসুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়া দেওয়া হইবে এবং গরু মহিষগুলি ওই খুঁটাতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃত্তাকারে পোয়ালের উপর পাক দিয়া ফিরিবে। তাহাদের পায়ের খুরের মাড়াইয়ে খড় হইতে ধান ঝাড়াই হইয়া থাকবে।''[১৭১] এই অঞ্চলের ঘন্টাকর্ণ অর্থাৎ ঘেঁটুপুজার বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখেছেন — ''চৈত্র মাসে ঘন্টাকর্ণের পূজা। ঘেঁটু পূজা, — পঞ্জিকার 'ঘন্টাকর্ণ' — বসন্ত রোগ-নিবারক মহাবল ঘন্টাকর্ণের পূজা। এই 'ঘন্টাকর্ণ' — ঘেঁটু গাজনের অঙ্গ। বিষ্ণু বিরোধী শিবভক্ত ঘন্টাকর্ণ ছিল পিশাচ। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রুদ্র দেবতার এবং বিষ্ণু দেবতার উভয়েরই প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। এই একাধারে ভক্ত ও পিশাচ ঘন্টাকর্ণের পূজা করে বাংলার নিম্ন জাতীয়েরা। সমস্ত মাস ধরিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়। চাল ডাল সিধা মাগিয়া মাসান্তে গাজনের সময় উৎসব করে।''[১৭২] চৈত্রমাসের গাজন উৎসব রাঢ় অঞ্চলে এক আশ্চর্য পরিবেশ তৈরি করে। ভোর থেকেই সেই অঞ্চলের আবাল বৃদ্ধ বণিতা এই উৎসবের আমেজে মেতে ওঠে।

রাজবন্দী কলকাতার ছেলে যতীনের কাছে এটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ঔপন্যাসিক তাঁর দৃষ্টিতে গাজনের বর্ণনা দিয়েছেন — ''ঢাকের বাজনার শব্দে ভোরবেলাতেই — ভোর বেলা কেন — তখনও খানিকটা রাত্রি ছিল, যতীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গাজনের ঢাক। পূর্বে চৈত্রের প্রথম দিন হইতেই গাজনের ঢাক বাজিত। . . . সে আশ্চর্য হইয়া গেল, — গ্রামখানায় এই শেষ রাত্রেই জাগরণের সাড়া উঠিয়াছে। ঢেঁকিতে পাড় পড়িতেছে; মেয়েরা ইহারই মধ্যে পথে বাহির হইয়াছে। হাতে জলের ঘটি। চন্ডী-মন্ডপে জল দিতে চলিয়াছে। রাঙাদিদি বড় বড় করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম করিতেছে — এখান হইতে শোনা যাইতেছে। জনকয়েক গাজনের ভক্ত স্নান শেষ করিয়া ফিরিতেছে — তাহারা ধ্বনি দিতেছে — বলো শি — বো — শি — বো — শিবোহে! হর — হর বোম্ — হর — হর বোম্।''[১৭৩] ধর্মপূজা রাঢ় অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট লোক-উৎসব। অনেকের মতে এটি রাঢ়ের ডোম সম্প্রদায়ের জাতীয় পূজাও বটে। এজন্য ধর্মঠাকুরের পূজাপ্রচার সংক্রান্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যকে অনেকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্যও বলতে চান। এই উপন্যাসদ্বয়ে ধর্মপূজার কথাও আছে। তবে অবশ্যই সেটা উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে। ধর্ম আরাধনার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''হরিজন-পল্লী মজলিসের স্থান — ওই ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুল গাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুল গাছটি পত্র পল্লবে পরিধিতে বিশাল; কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্মরাজের অসীম মহিমা! এমন শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন্ গাছকে কে জীবিত দেখিয়াছে? গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃতর মাটির ঘোড়া; মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়; বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন।''[১৭৪] বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের বধূদের কাছে লক্ষ্মীর ব্রতপালন একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে গণ্য হয়। এই উপন্যাসদ্বয়েও লক্ষ্মীব্রত পালনের কথা আছে। অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রী পদ্মর এই লক্ষ্মীর ব্রত পালনের বিবরণে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''ব্রত কথাটি মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক বাঁধিয়া পরিতুষ্ট মনেই পদ্ম লক্ষ্মীর আয়োজন করিল। ঘর-দুয়ার, খামার হইতে গোয়াল পর্যন্ত আলপনা আঁকিয়া এবার সে যেন

একটু বেশি বিচিত্রিত করিয়া তুলিল, দুয়ার হইতে আঙিনার মধ্যস্থল পর্যন্ত আলপনায় আঁকিল চরণ-চিহ্ন। ঐ চরণ-চিহ্নে পা ফেলিয়া লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন। ঘরের মধ্যস্থলে সিংহাসনের সম্মুখে আঁকিল প্রকাণ্ড এক পদ্ম। অপরূপ তাহার কারুকার্য। মা আসিয়া বিশ্রাম করিবেন। শাঁখ ধুইল, ধূপ বাহির করিল, প্রদীপ মার্জনা করিল, সিন্দুর রাখিল, কাজল পরিল। এদিনের আয়োজন শেষ করিয়া গুড়ে নারিকেলে, গুড়ে তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবে, দুধ জ্বাল দিয়া ক্ষীর হইবে। কত কাজ, কত কাজ।''[১৭৫] রাঢ়ের কৃষিভিত্তিক জীবনে এসব অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। সেখানে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে পৌষেরও আরাধনা করা হয় — ''তাহার ঘরে সোনার পৌষ চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে পূজা করিয়া বাঁধিতে হইবে। 'না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ — না যেয়ো ছাড়িয়ে।' পনেরো মাস পরে তো সে ফিরিয়া আসিবে। তখন তাহাকে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া কটোরা ভরিয়া অন্ন সাজাইয়া দিতে হইবে।''[১৭৬] এই উপন্যাসদ্বয়ে সেই অঞ্চলটির প্রেক্ষিতে বর্ষাকালে ধান রোপনের প্রাক্কালের লোক-উৎসব 'অম্বুবাচী'র বিবরণও আছে। 'অম্বুবাচী' যেন উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষদের কাছে খুশির বার্তা বয়ে আনে। তারা নানারকম উৎসব-অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে — ''আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। সাত তারিখে অম্বুবাচী পড়িল। ধরিত্রী নাকি এই দিনটিতে ঋতুমতী হইয়া থাকেন।. . . অম্বুবাচীর তিনদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল। -- অম্বুবাচীতে চাষিদের মধ্যে কুস্তি-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। চলতি ভাষায় ইহাকে বলে 'আমুতির লড়াই'। এখানকার মধ্যে কুসুমপুর ও আলেপুরেই সমারোহ সর্বাপেক্ষা বেশি। এই দুইখানি মুসলমানের গ্রাম। অম্বুবাচীর লড়াই হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সমারোহের বস্তু। চাষের পূর্বে চাষিরা বোধ হয় শক্তি পরীক্ষা করে। এই অঞ্চলের মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া। বিভিন্ন স্থান হইতে নামকরা শক্তিমান চাষিরা — যাহারা এখানে কুস্তিগীর বলিয়া খ্যাত, তাহারা যোগ দেয়। ভরতপুরে যে বিজয়ী হয়, সে-ই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে।''[১৭৭] এই উপন্যাসদ্বয়ে এইরকম অসংখ্য ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর উপন্যাসের গৃহীত পাঁচটি গ্রামের মানুষজনের লোক-সংস্কৃতি, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোককথার পরিচয় দিয়েছেন।

এই উপন্যাসদ্বয়ে কিছু ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত গানেরও ব্যবহার করেছেন। যেমন, ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু পূজা উপলক্ষে সতীশ বাউরির দল গেয়েছে —

''এক ঘেঁটু তার সাত বেটা।
সাত বেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত।
মহান্ত ভাই রে,
ফুল তুলতে যাই রে,
যত ফুল পাই রে,
আমার ঘেঁটুকে সাজাই রে!''[১৭৮]

তাদের গানে স্থানীয় বিশেষ ঘটনার কথাও উঠে এসেছে —

''হায় এ জল কোথা ছিল।
জলে জলে বাংলা মুলুক ভে-সে গেল।[১৭৯]

শুধু তাই নয়, বহুদিন আগে রেললাইন পাতার সময়কার গানও এরা নিজেদের সঙ্গীতচর্চার অন্তর্ভুক্ত করেছে —

সাহেব রাস্তা বাঁধালে;
ছ'মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।''[১৮০]

এমনকি দেবু পণ্ডিতকে পুলিশে ধরলে এই গায়কের দল সেই ঘটনা অবলম্বনেও গান রচনা করেছে — ''দেবু ঘোষে বাঁধল এসে পুলিশ দারোগা,
বলে, কানুনগোর কাছে হাত জোড় করগা।
দেবু ঘোষ হেসে বলে 'না'।। . . .''[১৮১]

'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে পদ্মের ভাবনায় সেই অঞ্চলে প্রচলিত বেঙা-বেঙির গানের কথাও এসেছে। এইসমস্ত গানকে ঐ অঞ্চলের মানুষ নারী-পুরুষের ভাব-ভালোবাসার সঙ্গে একাত্ম করে ভাবে। এসব গানে বেঙির জবানীতে বলা হয় —

''যেও না যেও না বেঙা — আমাদিগে ছেড়ে,
মুই নারী অভাগিনী ভাসি যে পাথারে —

ও হায় কচি কাচা নিয়ে!''[১৮২]

কিন্তু বেঙা কোনো কিছুই শোনেনা, সে গম্ভীর গলায় বেঙিকে শাসন করে বলে —

''মর্—মর্—একি জ্বালা—পিছে ডাকিস্ কেনে?
কেতাখ করেছ আমায় — ছেলেপিলে এনে—
মরতে কেন করলাম বিয়ে!''[১৮৩]

এই সঙ্গীত যেন, রাঢ়ের বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা সঙ্গীত। অনিরুদ্ধ–পদ্মর সম্পর্কটি এ অবস্থাতেই পৌঁছেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই উপন্যাসদ্বয়ে গৃহীত অঞ্চলটির লোকসংস্কৃতি, লোক–বিশ্বাস, লোককথা, লোকাচারের পাশাপাশি লোকসঙ্গীতও স্থান পেয়েছে।

এই উপন্যাস দু'টিতে চরিত্রদের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকার বিবরণে রাঢ়ের প্রচলিত খাবার–দাবারের উল্লেখই আছে। পাশাপাশি এরা পোশাক–পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক রাঢ়বঙ্গের পোশাকরীতিকে গ্রহণ করেছেন। তবে সম্প্রদায় ভেদে খাদ্যতালিকা ও পোশাক–পরিচ্ছদের বিবরণ বদলে গেছে। তারাশঙ্কর উপন্যাস দু'টি সাধু গদ্যরীতিতে রচনা করেছেন। তবে চরিত্রদের মুখের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে তিনি দু'রকম রীতি গ্রহণ করেছেন — দেবু পণ্ডিত, ন্যায়রত্ন, দ্বারিক চৌধুরী, জগন ডাক্তার, যতীন, বিশ্বনাথ, কঙ্কনার বাবুগণ প্রমুখদের মত ভদ্র এবং উচ্চবর্ণের চরিত্রদের এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের মুখে তিনি রাঢ়ী উপভাষার মান্যচলিত রূপটি ব্যবহার করেছেন। আর পঞ্চগ্রামের অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ ছুতোর, পাতু বায়েন, রাম ভল্লা, তিনকড়ি, সতীশ, রামহরি, ছিদাম, ভূপাল, দৌলত শেখ, ইরসাদ, রহম, বিলু, পদ্ম, দুর্গা, দুর্গার মা, পাতুর স্ত্রী, রাঙাদিদি, শ্রীহরির স্ত্রীর মত অজস্র স্থানীয় নারী–পুরুষদের মুখে তিনি রাঢ়বঙ্গ বীরভূমে প্রচলিত আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষার সংলাপ দিয়েছেন। শ্রীহরি এবং হরেন ঘোষালের সংলাপ এই উপন্যাস দু'টির বিশেষ দিক। শ্রীহরি ছিরু পাল রূপে আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষায় কথা বললেও যখনই নিজেকে সে শ্রীহরি ঘোষ রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তখন মান্যচলিত রাঢ়ীতে কথা বলেছে। আর হরেন ঘোষাল একটু উত্তেজিত হলেই বাংলার সঙ্গে সঙ্গে দু'একটি ইংরেজি শব্দ জুড়ে দিয়ে কথা বলেছে। যেমন —

১। ''Doctor, look, one চালা!—একটা ছোট ঘরের চাল ভাসিয়া চলিয়াছে। — There — there — ওই একটা — ওই একটা। ওই আর একটা। By God — a big গাছের গুঁড়ি।''[১৮৪]

২। ''হোয়াট্ ইজ্ দ্যাট টু ইউ? সে খবরে তোমাদের কি দরকার! সেল্‌ফিশ পিপ্‌ল সব!''[১৮৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই দুই উপন্যাসে খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকার বর্ণনা, চরিত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ, স্থানীয় নারী-পুরুষের সংলাপের মত বিষয়গুলিতেও ঔপন্যাসিক আঞ্চলিকতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এজন্য দু'টি উপন্যাসেই রাঢ়বঙ্গের গ্রামজীবনের চিত্র উঠে এসেছে। এই বিষয়টি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে। তিনি 'গণদেবতা'র আলোচনাকালে লিখেছেন — ''. . . কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় স্বার্থসংঘাতে ক্ষুব্ধ, অনিয়ন্ত্রিত, দ্রুত-রসাতলগামী পল্লীসমাজের চিত্র খুব বাস্তবানুযায়ী হইয়াছে।''[১৮৬] আর 'পঞ্চগ্রাম' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য — ''তারাশঙ্করের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব সমগ্র সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রণে। 'গণদেবতা'তে সমাজবন্ধন কেমন করিয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সামাজিক দলাদলির ক্রূরতা ও দুর্নীতিতে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'পঞ্চগ্রাম'-এ ধ্বংসোন্মুখ সমাজ যে কয়েকটি অসাধারণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে ইহার অন্তর্জীর্ণতা ও যুগধর্মের সহিত ব্যবধান আরও নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।''[১৮৭] হয়তো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এই দু'টি উপন্যাসেও কিছু ভুল-ত্রুটি পাওয়া যাবে, কিন্তু সব দিক থেকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে বসলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস দু'টি আঞ্চলিকতার নিরিখে অনেকটাই সফলতার পথে এগিয়ে গেছে। তাই এই উপন্যাস দু'টিকে সম্পূর্ণ সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস না বলা গেলেও অবশ্যই এগুলিকে আঞ্চলিকতার লক্ষণসম্পন্ন উপন্যাস বলতে হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **'কবি'**। বেশির ভাগ সমালোচক এই উপন্যাসটিকে প্রসংশায় ভরে দিয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের একটি 'মনোরম সৃষ্টি' বলে করে মন্তব্য

করেছেন — ''কবি' (মার্চ, ১৯৪২) তারাশঙ্করের আর একটি মনোরম সৃষ্টি। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রামায়ণ-মাহাভারত-পুরাণের প্রভাব কেমন করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, আপামর জনসাধারণের মনে সৌন্দর্যবোধ ও সরলতার সঞ্চার করিয়াছে, বাংলার কবিয়াল-সম্প্রদায়ই তাহার চমৎকার প্রমাণ। গ্রন্থে এইরূপ একটি নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে কবিত্বশক্তিস্ফুরণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।''[১৮৮] অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ 'কবি' উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মন্তব্য করেছেন — ''ডোম সম্প্রদায়ের একজন যুবকের কবিরূপে প্রতিষ্ঠা এবং দুটি নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক এই উপন্যাসের কথাবস্তু। আখ্যানের নিপুণ বিন্যাস, চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং গানের সহজ কথার সঙ্গে জড়িত সংরাগ ও বেদনা সব মিলে এই উপন্যাসটি তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।''[১৮৯] এই দু'জনের কথাতেই উপন্যাসটিতে বাংলার নিম্নবর্ণের একজন যুবকের কবিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এসেছে। এই উপন্যাসটি অবশ্য সেই যুবক অর্থাৎ নিতাই কবিয়ালের জীবন কাহিনি অবলম্বনেই রচিত। তবে ঔপন্যাসিক নিতাই কবিয়ালের জীবন কাহিনিটি পরিবেশন করেছেন রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের আঞ্চলিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে।

'কবি' উপন্যাসটি প্রথমে 'প্রবাসী'র কার্তিক, ১৩৪৭ সংখ্যায় একটি ছোটগল্প রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে 'বসন' অর্থাৎ বসন্ত চরিত্রটি ছিল না। পরে এর সঙ্গে বসন্ত চরিত্রটি যোগ করে উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়। উপন্যাসরূপে প্রকাশের সময় এটি পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হয় এবং ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রথম উপন্যাসরূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর উপন্যাসটি বিখ্যাত কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারকে উৎসর্গ করে উৎসর্গপত্রে লেখেন — ''সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার শ্রদ্ধাভাজনেষু।''[১৯০] মোহিতলালকেও 'কবি' উপন্যাসটি নানাভাবে মুগ্ধ করেছিল। তিনি নানা সময়ে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একসময় তো 'কবি'কে নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও লেখেন। এই প্রবন্ধে তাঁর মুগ্ধতার পেছনে উপন্যাসটির যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল 'কবি'-র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। মোহিতলালের মতে 'কবি' উপন্যাসে বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের একেবারে 'মাটির গন্ধ' লেগে

আছে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই অঞ্চলটি অবশ্যই তারাশঙ্করের অত্যন্ত প্রিয় জন্মভূমি রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের গ্রামাঞ্চল। মোহিতলাল ছাড়াও বহু সমালোচক তারাশঙ্করের এই উপন্যাসটির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। এই উপন্যাসে নিতাই কবিয়াল নামে একটি চরিত্র সৃষ্টি করে তারাশঙ্কর তার জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়ে রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের গ্রামীণ অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বিশেষ করে সেই অঞ্চলের লোকসঙ্গীত, লোককথা, লোকবিশ্বাস তথা লোকসাহিত্যকে উপস্থাপন করেছেন।

এটা তো ঠিকই যে, তারাশঙ্করের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের কোনো কথাসাহিত্যিক তাঁর মত করে নিজেদের গল্প-উপন্যাসে গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, মানুষজন ও তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোককথা, লোকবিশ্বাস, লোকসঙ্গীতের মত বিষয়গুলিকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে তুলে আনেন নি। 'কবি' উপন্যাসে তিনি পশ্চিমবাংলার রাঢ়ভূমি বীরভূমের একটি অখ্যাত গ্রামের পটভূমিকায় সে অঞ্চলে অন্ত্যজ বলে পরিচিত ডোমবংশজাত নিতাই কবিয়ালের বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে নিতাই-এর জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রাঢ়বঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত কবিগান, ঝুমুর গান, তরজা, খেউড়ের মতো লোকসঙ্গীতের গ্রামীণ পরিবেশটি মূর্ত করে তুলেছেন। ঐ অঞ্চলের হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দির মতো তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নশ্রেণির মানুষগুলির অশিক্ষার কারণজাত আপাত রুক্ষতা, কাঠিন্যের আড়ালেও যে শিক্ষা ও সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ, সরলতা, সৌন্দর্যবোধ, কবিপ্রাণতা প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান, তার বাস্তবচিত্র তিনি এই উপন্যাসে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সেইসঙ্গে সেখানকার রুক্ষ লালমাটিতে যে আবহমান কাল ধরে লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের উৎস লুকিয়ে আছে তার প্রমাণও রেখেছেন। উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়াল, ঠাকুরঝি, বসন প্রমুখদের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে তাদের জীবনের যে ঘাত প্রতিঘাতের ছবি তিনি এখানে এঁকেছেন, তাতে ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতি এবং সেখানকার মানুষদের জীবনচর্যা প্রাধান্য পেয়ে 'কবি' উপন্যাসটির একটি আঞ্চলিক পটভূমিকা রচিত হয়েছে।

উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, নায়ক নিতাইচরণ নিচুজাতের ডোমবংশের ছেলে। তবে শহরাঞ্চলে ডোম বলতে যাদের বোঝানো হয়, নিতাইয়ের পূর্বপুরুষেরা ঠিক সে জাতের নয়, — তারা লেঠেলের জাত এবং নবাবের আমলে পল্টনে থেকে এরা বীরত্বের খ্যাতি কুড়িয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তারা যুদ্ধ ব্যবসা ছেড়ে ডাকাতি শুরু করে। নিতাইয়ের বাবা ছিল সিঁদেল চোর, ঠাকুর্দা ছিল ঠ্যাঙাড়ে – – যে নিজের জামাইকে হত্যা করেছিল, মামা ছিল ডাকাত; আর মা-র বাবা ছিল খুনি। এই রকম কীর্তিমান বংশের ছেলে হল নিতাই। তার চেহারা দীর্ঘ, কালো দেহে কঠিন সবল পেশী বর্তমান থাকলেও চোখে সকরুণ বিনয় সর্বদা লেগে থাকে। সে পারিবারিক পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম দিকে কবিদলের আসরে বসে থাকত, দোয়ারদের দলে মিশত, কাঁসি বাজানো আর দোয়ারের কাজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখত। পরে বংশানুক্রমিক পেশায় না গিয়ে নিজেই সে অঞ্চলের বিখ্যাত কবিয়াল হয়ে ওঠে। অবশ্য নিতাই সহজে একজন কবিয়াল হতে পারে নি , শৈশবে জমিদারের কাছে কাপড় পাওয়ার লোভে বীরবংশী ডোমের ছেলেদের সঙ্গে নিতাই নৈশ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বছর তিনেক পড়াশুনা করে। এখানে সে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প মুখস্থ করে, যেগুলি কবি হওয়ার সময় তার ভীষণ কাজে লাগে। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নিতাইয়ের কাছে পরিবারের তরফ থেকে ডাকাতিতে ঢোকার আহ্বান এলেও বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই কবিগানের প্রতি তার মন যায়। এজন্য অবশ্য বাড়িতে তার স্থান হয় না — সে বাড়ি ত্যাগ করে রেল স্টেশনের পয়েন্টম্যান বন্ধু রাজা মুচির কাছে ওঠে। এই স্টেশনে দুধ দিতে আসে পাশের গ্রামের রাজার পঞ্চদশী বিবাহিতা কিশোরী শ্যালিকা ঠাকুরঝি, যার সঙ্গে পরে নিতাই-এর একটা আন্তরিক হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

রাজার কাছে থাকার সময় নিতাই স্টেশনে মোট বওয়ার কাজ করে। তবে তার মনে কবিত্বের সুপ্ত স্বপ্ন লেগেই থাকে। এজন্য সময় সুযোগ পেলেই সে স্টেশনেই গান গেয়ে ওঠে — এক্ষেত্রে কখনও প্রচলিত গান গায়, আবার কখনও বা নিজেই গান তৈরি করে নেয়। আর যেখানেই কবিগানের আসর বসার সংবাদ পায়, সেখানেই গিয়ে হাজির হয়। এসব আসরে অনেক সময় সে দোয়ারের কাজও পায়। এরূপ চলতে চলতে এক কবিগানের আসরে হঠাৎই একদিন নিতাই কবি হিসেবে

প্রতিষ্ঠা পায়। এতে চেনাশোনা লোকজনের নিতাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়, বন্ধু রাজাও অত্যন্ত খুশি হয়। তবে সব থেকে বেশি খুশি হয় ঠাকুরঝি। এইসময় নিতাইয়ের বাড়ির লোকও তাকে বাড়িতে এসে থাকতে বলে। কিন্তু নিতাই বাড়িতে না গিয়ে আরও বেশি করে কবিযশপ্রার্থী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তখন সে ঠাকুরঝির সঙ্গে একটা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্পও করে। ফলে হৃদয়ে ঠাকুরঝির জন্য একটা আলাদা টান অনুভব করে। তবে নিতাইয়ের নৈতিকতা তাকে বিবাহিতা ঠাকুরঝির সঙ্গে মিলিত হওয়ার সম্মতি দেয় না।

এরপরেই উপন্যাসে এসে হাজির হয় এক ঝুমুরের দল। এই দলটির প্রধান আকর্ষণ বসন অর্থাৎ বসন্ত নামের একটি মেয়ে। এটি একটি ভ্রাম্যমান দল। এরা যেমন আসর বসিয়ে গান করে, তেমনি এই দলের মেয়েরা দেহ ব্যবসাও করে। এইদলের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া হল বসন, যে নিতাইকেও আকর্ষণ করে। বসনকে পেয়ে স্বভাবরসিক নিতাই ভাবে — এতদিনে সে একটি রসিকতার যোগ্য পাত্রী পেয়েছে। একদিকে গানের প্রতি আগ্রহ, অপরদিকে বসনের প্রতি টান — এই দ্বিবিধ কারণ থেকেই নিতাই এই ঝুমুরের দলটির সঙ্গে যোগ দেয়। এইসময় নিতাই গান গায়, আর বসন সেই গানের তালে তালে নেচে দর্শক মনোরঞ্জন করে। এতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বসনের সঙ্গে নিতাই-এর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে নিতাই-এর জীবন থেকে ঠাকুরঝি অনেকটা দূরে সরে যায়। এদিকে গ্রামাঞ্চলে অশ্লীলতা কবিগানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হলেও নিতাই প্রথম থেকেই এ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। তার অশ্লীল বিষয়ের চেয়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, জীবজন্তু প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিই আগ্রহ ছিল বেশি। কিন্তু একদিন কবির লড়াই-এ বিপক্ষ দলের অশ্লীল গালিগালাজের কাছে নিতাই-এর ঝুমুরের দল পরাস্ত হলে বসনের কাছে পুরস্কার হিসেবে একটি চড় তার কপালে জোটে। এতে প্রবল অপমানিত হয়ে নিতাই আকণ্ঠ মদ খেয়ে তার বীরবংশী রক্তের উগ্রতায় চরম অশ্লীলতায় কবিগানের আসর মাত করে এসে বসনকে জড়িয়ে ধরে। বসনের ঘরেই সেদিন সে রাত কাটায়। এরপর থেকে বসন ও দলের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে নিতাই অনেকটা সহজ হয়ে উঠলেও সম্বিৎ ফিরে এলে তার নিজের প্রতিই ঘৃণা জন্মায় এবং নিতাই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে বসন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং

নিতাইয়ের প্রতি অতৃপ্ত প্রেমকে সঙ্গে নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। বসনের মৃত্যুর পর তাদের দল ভেঙে যায় এবং হয়তো প্রায়শ্চিত্ত করার বাসনাতেই নিতাই সবকিছু ছেড়ে কাশী রওনা দেয়। তবে কাশীতে থেকেও সে শান্তি পায় না, বারবার তার দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা, ঠাকুরঝির কথা মনে আসে। এসবের প্রতি টান থেকেই শেষপর্যন্ত সে ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসে বন্ধু রাজার কাছে জানতে পারে যে, নিতাই ঝুমুরের দলে যোগ দেওয়ার পর ঠাকুরঝি পাগল হয়ে যায় এবং এ থেকেই তার মৃত্যু হয়। এসব শুনে সে গেয়ে ওঠে —

''এই খেদ আমার মনে —
ভালবেসে মিটল না এ সাধ, কুলাল না জীবনে।
হায় — জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে।''[১৯১]

গানের মাধ্যমে নিতাইয়ের এই প্রশ্নের উত্থাপনের মধ্য দিয়েই তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি' উপন্যাসটি শেষ করেছেন।

এইভাবে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তাঁর নায়ক নিতাই কবিয়ালের জীবনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের আঞ্চলিক পরিবেশের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এটা ঠিকই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর অনেকটা জুড়ে গ্রাম-বাংলার মানুষ কবিগানকেই বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের রুক্ষ্মভূমিই ছিল এই কবিগান ও কবিওয়ালাদের প্রধান ধাত্রীভূমি। বীরভূমের মাটিতে একদিকে যেমন বৈষ্ণব-বাউলরা আখড়া জমিয়েছিল, তেমনি সেখানেই কবিগান, ঝুমুরগান, টপ্পা, খেউড় প্রভৃতিও বিকশিত হয়েছিল। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বীরভূমের গ্রামাঞ্চলকেই গ্রহণ করেছেন। তবে অন্যান্য আঞ্চলিক উপন্যাসের মত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার প্রকৃতিকেই এর মূল উপজীব্য করেন নি; উপন্যাসটির প্রেক্ষিতে বোধহয় সেটা সম্ভব ছিলও না। উপন্যাসটির অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে একটি ছোট রেলস্টেশনে। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে ডোমসন্তান নিতাইচরণ সেই স্টেশনে বন্ধু রাজার কাছে ওঠে। সেখানেই ঠাকুরঝির সঙ্গে তার হৃদয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই

স্টেশনে থেকেই সে ‘কবিয়াল’ স্বীকৃতি পায় এবং ঝুমুর গানের দলটির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেই দলে যোগদান করে। এরপর অবশ্য সে ভ্রাম্যমান ঝুমুর দলটির সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অনুষ্ঠান করে এবং সেই দলের প্রধান আকর্ষণ বসনের মৃত্যুর পর দল ছেড়ে কাশী রওনা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত দেশের টানে নিতাই সেই স্টেশনেই ফিরে আসে। সুতরাং ‘কবি’ উপন্যাসটি কখনোই আঞ্চলিক সীমা-সংহতির কবল থেকে মুক্ত হতে পারে নি। হয়তো উপন্যাসটির এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিয়েই মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন যে, উপন্যাসটিতে বাংলার একটা অঞ্চলের একেবারে মাটির গন্ধ লেগে আছে।

এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের উদ্দেশ্য ছিল নিতাই কবিয়ালের জীবনকে চিত্রিত করা। তিনি এখানে নিতাইকে রাঢ়বঙ্গের অন্যতম পরিচিত সম্প্রদায় ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে নিয়ে এসেছেন। এই সম্প্রদায়টির পরিচয় প্রদানের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — ‘‘যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের ডোমবংশ, তবে শহর অঞ্চলে — ডোম বলিতে যে স্তরকে বোঝায়, ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল — প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ডোমেরা বিখ্যাত। ইহাদের উপাধি — বীরবংশী। নবাব পল্টনেও নাকি বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিশের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম-পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত।’’[১৯২] তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে নিতাইয়ের জীবনকে বিকশিত করতে গিয়ে অনেক মানুষকেই নিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ তথাকথিত সভ্যসমাজের মানুষ হলেও বেশির ভাগই রাঢ়ের স্থানীয় প্রকৃতির মানুষ। নিতাই ছাড়াও এই উপন্যাসে আমরা যে সমস্ত চরিত্রের সম্মুখীন হই তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — নিতাইয়ের পরিবারের লোকজন, নিতাইয়ের বন্ধু রাজা, তার স্ত্রী ও ছেলে, ঠাকুরঝি, স্টেশনে বিভিন্ন পেশায় থাকা নানা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষজন, মহান্ত, বিভিন্ন কবিগানের আসরে উপস্থিত কবিয়াল, তাদের দোয়ার এবং অন্যান্য সঙ্গী-সাথীগণ, বসনসহ ভ্রাম্যমান ঝুমুর গানের দলটির সদস্যগণ প্রমুখ। নিতাই তো বটেই, রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে এইরকম মানুষজন আগের শতকেও পর্যন্ত দেখা

যেত, এমনকী কোথাও কোথাও আজও এদের অস্তিত্ব আছে। ঔপন্যাসিক এখানে ঝুমুর গানের মেয়েদের সম্পর্কে লিখেছেন — ''ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোনো শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালা গানের মধ্যে দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে।''[১৯৩] তাঁর এই বক্তব্য যে সর্বাঙ্গীণ সত্য, তা বীরভূমের ঝুমুর দলগুলির ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করলেই জানা যায়। তিনি এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের বাস্তব জীবন থেকেই গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'আমার সাহিত্যজীবন' রচনায় 'কবি' উপন্যাসের 'পরিচারিকা'য় জানিয়েছেন যে, নিতাই তাঁর পরিচিত সতীশ ডোম, তার সঙ্গে লেখকের আলাপও ছিল; ঠাকুরঝি ভিন গাঁ থেকে দুধ বেচতে আসা এক মুচি বউ। বসন এক ঝুমুর দলের মেয়ে, যাকে তিনি নিজে হাতে শুশ্রূষা করেছিলেন কলেরা রোগাক্রান্ত হলে; রাজন চরিত্রের মূল ছিল রাজা মিঞা নামের এক পয়েন্টম্যান, জাতিতে মুসলমান। এই চরিত্ররা প্রায় সবাই 'কবি' উপন্যাসটিতে তাদের রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সহযোগেই হাজির হয়েছে।

আঞ্চলিক উপন্যাসে বেশির ভাগ সময় ব্যক্তিচরিত্রকে ছাপিয়ে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি নায়কত্বের সীমায় উত্তীর্ণ হয়। অবশ্য 'কবি' উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের এ সুযোগ তেমন ছিল না। তবে এখানে নিতাই কবিয়াল অত্যন্ত সার্থকভাবে রাঢ় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই বিষয়টি সমালোচকদেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাই সম্পর্কে বলেছেন — ''নিতাই-এর চরিত্রে তাহার হীনজাতি ও বিনয়কুণ্ঠিত আচরণের মধ্য দিয়া চরিত্রগৌরব এবং কবির মানস আভিজাত্য ও অতৃপ্তি চমৎকার ফুটিয়াছে।''[১৯৪] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাই সম্পর্কে বলেছেন — ''ডোমজীবনের অন্ধকার পটে নিতাইয়ের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাহিনীই 'কবি' উপন্যাসের প্রধান কথা। নিজ সমাজের কাছে তার ব্যক্তি জীবনের সামাজিক দান একটি পরম স্বকীয়তায় মূল্যবান হয়ে উঠুক, এই সুপরিচ্ছন্ন নৈতিক জিজ্ঞাসায় কবির নায়ক নিতাই বিশিষ্ট।''[১৯৫]

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় নিতাই কবিয়ালের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়ের ঝুমুর গানের নায়িকাদের প্রতিনিধি বসন্ত ওরফে বসনেরও প্রশংসা করে বলেছেন — ''কবি' উপন্যাসের নায়িকা বসন্ত — বসন। ঝুমুর গানের দলের নর্তকী-নায়িকা বসন। উঠে এসেছিল সমাজের নিচুতলা থেকে। তার না ছিল শাস্ত্রজ্ঞান, না ছিল অধ্যাত্মব্যাকুলতা, না ছিল মুক্তিবাসনা। লোভে ঈর্ষায় ভালোবাসায় জীবনমোহে বসন ছিল বন্দী, ঝুমুর গানের দলে এসেছিল নিতাই কবিয়াল। জাত-ব্যবসা ছেড়ে হল ঝুমুর দলের গায়ক। বসন্ত ভালোবাসল নিতাই কবিয়ালকে। ভালোবেসে স্বৈরিণী মদ্যপায়ী নর্তকী বসন্ত হয়ে উঠল প্রেমিকা। বসন্তের এই আশ্চর্য রূপায়ণ, নিতাই কবিয়ালের এই জন্মান্তর — 'কবি' উপন্যাসের মূল কথা।''[১৯৬] একথা ঠিকই যে, ঔপন্যাসিক যতটা দরদের সঙ্গে নিতাই কবিয়াল ও বসনকে চিত্রিত করেছেন, তাতে এদের সর্বাঙ্গে রাঢ়ের মাটির গন্ধ লেগে আছে। রাঢ়ভূমি বীরভূম ছাড়া এরূপ চরিত্রের কল্পনাই করা যায় না। তাই নিতাই এবং বসন দু'জনেই সার্থক আঞ্চলিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। তবে শুধু এরা নয়, এদের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য মানুষগুলি নিজেদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ রূপেই বজায় রেখেছে।

এই উপন্যাসে সেই অর্থে একটি অঞ্চলের সামগ্রিক চিত্র না থাকায় কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের মত একটি অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক জীবন-জীবিকার ছবি নেই। তবে এখানে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষজনের উল্লেখ আছে। যেমন, উপন্যাসের শুরুতেই নিতাইয়ের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর ডোম সম্প্রদায়ের বীরবংশীদের দুর্ধর্ষতার উল্লেখ করেছেন। এখানে মূলত কবিগান, খেউড়, ঝুমুর প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচয় আছে। কবিগান যে বাংলার অশিক্ষিত, অন্ত্যজ মানুষদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়, তা জানাতে ঔপন্যাসিক ভোলেন নি — ''বাংলার অশিক্ষিত সম্প্রদায় কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে প্রীতি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি।''[১৯৭] আবার ঝুমুর গানের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — ''ভ্রাম্যমান দল। নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেসাতি করিয়া বেড়ায় — গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। কবে কোন্ পর্বে, কোন্ পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হইবে সেও ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ,

পদব্রজে, গরুরগাড়িতে, ট্রেনে, নৌকায় — মালদহ পর্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভে বাড়ি ফেরে।''[১৯৮] এই ঝুমুর গানের মেয়েরা আবার দেহব্যবসায়িনী। ঔপন্যাসিক এই দলের শ্রেষ্ঠ মেয়ে বসন সম্পর্কে লিখেছেন — ''বসন্ত দাঁড়াইল। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী; পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয় — লজ্জা তাহাদের থাকে না, থাকিলে চলে না। পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধুলায় হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে।''[১৯৯] এভাবে তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে বৃত্তি করা যাযাবর শ্রেণীর মানুষগুলির কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-হতাশার কথা বিবৃত করেছেন।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের সাধারণ নিয়ম মেনে বিশিষ্ট কোনো ধর্মবিশ্বাসের কথাও বলেন নি। তবে এখানে হিন্দু ধর্মের ডোম সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। কবিয়ালরা, ঝুমুর গানের শিল্পীরা সাধারণত ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় তাদের সেই অর্থে বিশেষভাবে ধর্মাচরণ করারও তেমন সুযোগ থাকে না। এজন্য আঞ্চলিক লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকরুচি, লোককথার বিস্তৃত পরিচয় আশা করাও এই উপন্যাসের কাছে বৃথা। তবে কবিগান বা ঝুমুর গানের আসরের দৌলতে বেশ কিছু মেলার উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে। যেমন, একটি মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''রাসপূর্ণিমায় আলেপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতারে লোক যায় আসে। চতুর্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও দুই মাইল দূরবর্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায় ঝলমল করিতেছে। . . . কেবল আলো — আলো আর আলো, সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্য সম্ভারভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক — লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর — যাত্রা, কবি পাঁচালি, ঝুমুর। চারিপাশে কাতারে কাতারে দর্শক।''[২০০] 'কবি' উপন্যাসটিতে এইরকম আরও কিছু মেলা এবং কবিগান ও ঝুমুরের দলের আসরের উল্লেখ আছে।

এই উপন্যাস সেইভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকার বিবরণ নেই। তবে কবিয়াল ও তাদের সঙ্গীসাথীরা এবং ঝুমুর দলের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যে মদ্যপান করত তার পরিচয় আছে। এখানে মূলত

ভবঘুরে শ্রেণীর যাযাবর প্রকৃতির লোকশিল্পীদের জীবনচিত্র বর্ণিত হওয়ায় তাদের বাসস্থানেরও তেমনভাবে উল্লেখ নেই। তবে ঔপন্যাসিক ঝুমুর শিল্পীদের অস্থায়ী আস্তানার বিবরণ দিয়েছেন — ''আসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিতাই ঝুমুর দলের আস্তানায় বসন্তের খুপরির দুয়ারে দাঁড়াইল। খড়ের আগড়টা আধখোলা অবস্থায় রহিয়াছে। ভিতরে একটা লণ্ঠন মৃদুশিখায় জ্বলিতেছে।''[২০১] ঔপন্যাসিক একটি বিশেষ অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা এবং বাসস্থানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার তেমন সুযোগ না পেলেও কবিয়ালগণ ও তাদের সঙ্গীসাথী এবং ঝুমুর শিল্পীদের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পেয়ে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যা থেকে কবিয়াল এবং তাদের দোয়ারসহ অন্যান্য সঙ্গীদের স্পষ্ট ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। পাশাপাশি এই পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ঝুমুর শিল্পীরাও আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটি লেখক বাংলা সাধু গদ্যতেই রচনা করেছেন। উপন্যাসের নায়ক নিতাই, ঠাকুরঝি, বসনের মতো প্রধান চরিত্ররা এবং উপন্যাসের ভদ্র চরিত্ররা রাঢ়ী উপভাষার মান্যচলিত রূপে কথা বললেও তাদের উচ্চারণে সেই অঞ্চলের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। নিতাইয়ের পরিবারের লোকজন, রাজনের স্ত্রী, স্টেশনের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজন, কবিয়ালদের বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীসাথীরা, ঝুমুরের দলের অন্যান্য সদস্যরা তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাঢ়ী উপভাষার আঞ্চলিক রূপেই কথা বলেছে। তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও এই কথ্য রাঢ়ী উপভাষায় ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনের কারণেই এই গৌণ চরিত্রগুলি স্বল্প উপস্থিতিতেও অত্যন্ত জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়। নিতাইয়ের আশ্রয়দাতা বন্ধু রাজা ওরফে রাজনের ভুল হিন্দিমিশ্রিত সংলাপগুলি উপন্যাসটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাই বলা যায় যে, চরিত্রদের মুখের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য মেনে চলেছেন। তবে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের চেয়েও স্থানীয় লোকসঙ্গীতের ব্যবহার উপন্যাসটিকে একটি অন্য মাত্রা দান করেছে। তারাশঙ্কর নিতাইসহ অন্যান্য কবিয়ালদের মুখে যে সমস্ত লোকসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁকে একজন লোকসঙ্গীতের বিদগ্ধ স্রষ্টা বললেও কম বলা হয়। এই রকম কিছু সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত হল —

১। ''সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হায় রে!
যে মেলাতে গান থামে না
রাতের আঁধার নাই রে।
ও রসময় ভাই রে!''[২০২]

২। ''সংসারে যে সহ্য করে সে-ই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম কোন ধর্ম নয়।।''[২০৩]

৩। ''আমি ভালবেসে এই বুঝেছি—
সুখের সার সে চোখের জল রে।''[২০৪]

৪। ''কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।''[২০৫]

৫। ''আহা—ভালবেসে—এ বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস—আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদম তলে রে।. . .''[২০৬]

৬। ''ও আমার মনের মানুষ গো!
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর!
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশান,
আমার হেথা টানে নিরন্তর।''[২০৭]

৭। ''বলতে তুমি ব'লো নাকো, (আমার) মনের কথা থাকুক মনে।
(তুমি) দূরে থাকো সুখে থাকো আমিই পুড়ি মন-আগুনে।''[২০৮]

৮। ''করিল কে ভুল—হায় রে!
মন মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।
করিল কে ভুল। হায় রে!''[২০৯]

৯। ''ধর্ম কথায় যখন মন ওঠেনা—বসে না—তখন দিতে হয় গাল।
ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল!
যখন ঠান্ডা জলে গলে না ডাল —
তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জাল!''[২১০]

১০। ''তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি!
তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহ জানি নাকি?[২১১]

১১। ''এই খেদ আমার মনে —
ভালবেসে মিটল না এ সাধ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়—জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে।''[২১২]

এইরকম অজস্র গান এই উপন্যাসে আছে। এই গানগুলির ক্ষেত্রে তিনি যেমন সেই অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে প্রচলিত কিছু বৈষ্ণব পদ, শাক্ত পদ, বাউল সঙ্গীত, নিধুবাবুর টপ্পা, খেউড়কে গ্রহণ করেছেন, তেমনি নিজেও অনেক গানের চরণ রচনা করেছেন। নায়ক নিতাই কবিয়াল অনেক সময় সংলাপের বদলে দু'-এক কলি গানের মধ্য দিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেছে। স্বাভাবিক ভাবে সেক্ষেত্রে গানের বক্তব্য স্বল্প হয়েছে; তবে সেগুলি নিতাইকে তো বটেই ঐ অঞ্চলের কবিয়ালদের চিনতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে ‘কবি’ উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। তবে বাংলা কথাসাহিত্যের বিচারে ‘কবি’ উপন্যাসকে শুধু আঞ্চলিকতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয় — সমগ্র বাংলা সাহিত্যের নিরিখে এই উপন্যাসটির যে একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে, তা সব সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন। উপন্যাসটির এই স্বাতন্ত্রের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এর নায়ক নিতাই কবিয়াল। বাংলা উপন্যাসে এর পূর্বে নিতাইয়ের মত নায়ক খুব একটা বেশি দেখা যায় নি। এ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ‘‘নিতাই কবি, সমস্ত সত্যিকারের কবির মত, স্বাভাবিক সুরুচি ও সুকুমার অনুভূতির অধিকারী — জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, ভাবের প্রতি উচ্ছ্বাস তাহার মনে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে, গীতি-গুঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। তাহার মনের এই দ্রুত, অবাধ সংবেদনশীলতা ও উদাস, উদার নির্লিপ্ততা তাহাকে প্রকৃত কবির সগোত্রীয় করিয়াছে।’’[২১৩] তবে নিতাই-এর কবিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়ের ছবিও যে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা জানাতেও তিনি ভোলেন নি — ‘‘এই কবিত্ববিকাশের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যে উত্তেজনাময় সুন্দরে-কুৎসিতে মিশ্রিত প্রতিবেশ ইহার সূতিকাগৃহ, তাহার চমৎকার ছবি দেওয়া হইয়াছে। অশিক্ষিত, ইতর শ্রোতৃবৃন্দের অশ্লীল রুচি ও যৌনলালসামিশ্র ভক্তি কবিয়ালদের কাব্যানুশীলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা; এই বিকৃত ছাঁচেই তাহাদের সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি। ঝুমুরের দলের যে ছবি লেখক আঁকিয়াছেন তাহা যেমনি বাস্তব তেমনি চিত্তাকর্ষক; ইহার বীভৎস কদাচারের মধ্যে সত্যিকারের শিল্পানুরাগ ও খানিকটা নিয়মানুবর্তিতা ও আদর্শবাদ আছে।’’[২১৪] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ‘কবি’ উপন্যাসের আলোচনায় নিতাইকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন — ‘‘কবি’-র মূল কথা নিতাইয়ের আত্মাবিষ্কার, ডোম-জীবনের অন্ধকার পট, বসনের মাসির দলের ডোরাকাটা জীবন — এরই মাঝখান দিয়ে নিতাইকে চলতে হয়েছে। চিনতে হয়েছে নিতাইকে।’’[২১৫] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তারাশঙ্করের ‘রসকলি’ গল্পটির পাশাপাশি ‘কবি’ উপন্যাসটিকে লোকজীবনানুগত্যের পরিচায়ক বলে মন্তব্য করেছেন – – ‘‘লোকসংস্কৃতির ভিত্তিতে রচিত ‘রসকলি’ গল্প আর ‘কবি’ উপন্যাস

তারাশংকরের লোকজীবনানুগত্যের উৎকৃষ্ট শিল্প-পরিচয়।''[২১৬] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁর আলোচনার লক্ষ্যও হল নিতাই কবিয়াল। আমাদের আলোচনাতেও বারবার বলা হয়েছে যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবি' উপন্যাসে নিতাইয়ের মাধ্যমে রাঢ়ের সমগ্র কবিয়ালদের জীবনকে চিত্রিত করেতে চেয়েছেন। নিতাই সেই অঞ্চলের একজন কবিয়ালদের প্রতিনিধি। তার মধ্য দিয়ে একজন সত্যিকারের রাঢ় অঞ্চলের মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই প্রথাগত আঞ্চলিক উপন্যাসের মত 'কবি' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট না হলেও এর শ্রেণি নির্ণয় করলে উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে মেনে নেওয়াই যায়।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'উপনিবেশ'** উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। নিম্নবঙ্গের পটভূমিকায় তিনখণ্ডে রচিত এই উপন্যাসটিকে অনেকেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মত দিয়ে থাকেন। এই উপন্যাসটি তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতেও উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে — ''নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস উপনিবেশ। কারো কারো মতে সর্বশ্রেষ্ঠ এই কারণে যে এই উপন্যাস তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মানে উন্নীত করেছে।''[২১৭] এই উপন্যাসাটির শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে এই উপন্যাসটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন — ''নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রথম উপন্যাসই তাঁহার অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। শব্দপ্রয়োগের তীক্ষ্ণ সংকেতময়তা ও চিত্রধর্মিতায়, বর্ণনার আবেগময় গতিবেগ, প্রতিবেশরচনার কুশলতায় ও অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন সর্বত্র।''[২১৮] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'-এর প্রশস্তি এখানেই শেষ হয় নি, এই উপন্যাসটির আলোচনাকালে তিনি ঔপন্যাসিকের নূতন জীবনদৃষ্টিরও খোঁজ পেয়েছেন — ''উপনিবেশ' — তিন খণ্ড (১৯৪৪) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা এবং ইহাতেই তাঁহার নূতন জীবনদৃষ্টি নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই

উপন্যাসত্রয়ীতে তিনি বাঙালির রক্তে আদিম বন্য প্রাণোচ্ছলতার দুর্বার আবেগটি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।''[২১৯] এই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশও এর শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি স্বীকার করে নিয়েছেন — ''নিম্নবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষ, আদিম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির লড়াই-এর কাহিনী। বিচিত্র চরিত্র, আবেগের প্রাবল্য এবং প্রকৃতির হিংস্রতার এক নিপুণ মিশ্রণে রচিত উপন্যাস। অনেকের মতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা।''[২২০] উপন্যাসটি সম্পর্কে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল — ''বিষয়ের নবীনতায় উপস্থাপনায় ইতিহাস চেতনায় জীবনবোধে 'উপনিবেশ' বিশিষ্ট সৃষ্টি।''[২২১] সুতরাং 'উপনিবেশ' যে ঔপন্যাসিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা এ সংক্রান্ত সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে উপন্যাসটির অনেক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই এর আঞ্চলিকতার দিকটি। এখানে ঔপন্যাসিক পটভূমি হিসেবে নিম্নবঙ্গের তেঁতুলিয়া নদী তীরস্থ চর ইস্‌মাইল নামক একটি দ্বীপকে বেছে নিয়ে সেখানকার জীবনচিত্রণে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে এই উপন্যাসে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র একটি অঞ্চল এবং সেখানকর জীবনচর্যার ছবি তুলে ধরার প্রসঙ্গ এসেছে। সেই সঙ্গে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার নানা লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছে। আঞ্চলিকতার এই লক্ষণগুলি অনুসন্ধানের পূর্বে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

'উপনিবেশ' উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, ঔপন্যাসিক এখানে বাংলার সুদূর ভৌগোলিক সীমান্তে অবস্থিত নিম্নবঙ্গের সুন্দরবনের আরণ্যক অঞ্চলকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেখানকার আরণ্যক সীমানায় সমুদ্রের পটভূমিকায় তেঁতুলিয়া নদীর মোহনায় জেগে ওঠা চর ইস্‌মাইল নামক একটি চরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির অধিকাংশ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই চর ইস্‌মাইলে নানা ধরনের মানুষের সহাবস্থান ঘটে। এখানে বাস করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় আসা 'হার্মাদ' জলদস্যু পর্তুগীজদের কিছু আধুনিক বংশধরগণ, আদিম-অসামাজিক আরাকানী ও মগ রক্তধারার উত্তর পুরুষ কয়েকটি বর্মী নরনারী, চাকুরি ও ব্যবসা সূত্রে যাওয়া কয়েকজন বাঙালি মানুষজন এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি অঞ্চল থেকে

আসা কিছু ভাগ্যান্বেষী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই উপন্যাসে ডি–সুজা, লিসি, জোহান, গঞ্জালেস প্রমুখেরা হল পর্তুগীজ চরিত্র, বর্মী সুন্দরী মা–ফুন ও কিছু বর্মী মানুষজন আরাকানী–মগ রক্তধারার উত্তরপুরুষ, তহশীলদার মণিমোহন, বলরাম কবিরাজ, মুক্তো, হরিদাস পোস্টমাস্টার, গাজী সাহেব, কেরামদ্দি প্রমুখ হল আধুনিক বাঙালি মানুষজন, যারা চাকুরী অথবা ব্যবসা সূত্রে চর ইস্‌মাইলে গিয়ে হাজির হয়েছিল। আর আছে মজাঃফর, কাসেম খাঁর ব্যাটা প্রমুখের মত স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা ভাগ্যান্বেষণে চট্টগ্রাম–নোয়াখালি থেকে চর ইস্‌মাইলে গিয়ে হাজির হয়ে বসতি তৈরি করে রীতিমতো সেখানে বসবাস শুরু করে। এই সমস্ত মানুষদের উপরেই চর ইস্‌মাইলের আদিম বন্য পরিবেশ এক অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এরা আধুনিক যুগের মানুষ হয়েও এমন সব আচরণ করে যা সভ্যসমাজ সহজে অনুমোদন করে না — এদের সমস্ত কার্যকলাপ একমাত্র সেই চর ইস্‌মাইলের আদিম বন্য পরিবেশেই সম্ভব।

উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, একটা সময় চর ইস্‌মাইল ছিল পর্তুগীজদের ঘাঁটি। বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্ব এবং তার অনেক আগে থেকেই পর্তুগীজ ‘হার্মাদ’ জলদস্যুরা নদী বা সমুদ্র পথে লুঠতরাজ করার পাশাপাশি অনেক সময় জাহাজে পাল তুলে বাংলার গ্রামগুলিতেও হানা দিত। এইসমস্ত অপরাধমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করবার জন্য এবং নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে সুন্দরবন অঞ্চলের অনেকগুলি চরে তারা সুরক্ষিত কেল্লা নির্মাণ করেছিল। এই কেল্লাগুলি থেকেই তারা সমস্ত অপরাধমূলক কাজকর্ম চালাত। উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে গৃহীত এই চর ইস্‌মাইলও একসময় ছিল পর্তুগীজদের শক্ত ঘাঁটি। তবে উপন্যাসটিতে যে সময়কালটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন চর ইস্‌মাইলের নোনা জল ও নোনা মাটির দেশে পর্তুগীজ জলদস্যু ‘হার্মাদ’দের দুর্গের ভগ্নাবশেষ, প্রকাণ্ড গীর্জার খানিকটা অবশেষ, বালির মধ্যে পুঁতে যাওয়া একটা কামান প্রাচীন কীর্তিকে বহন করে চললেও তাদের রমরমা অস্তমিত; সে সময় পূর্বপুরুষদের স্মৃতি বহন করে শুধু আট দশ ঘর পর্তুগীজকে চর ইস্‌মাইলে বাস করতে দেখা যায়। তবে এদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাদের বাইরে থেকে দেখে সহজে পর্তুগীজ বলে চেনাও যায় না। চর ইস্‌মাইলে এই পরিবর্তিত পর্তুগীজদের সঙ্গে চট্টগ্রাম আর নোয়াখালি

থেকে আসা একদল দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, কিছু মগ জাতীয় বর্মী এবং একদল জেলে বাস করে। চাকরি ও অন্যান্য জীবিকাসূত্রে সভ্য জগৎ থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই প্রায় আদিম দুর্গম দ্বীপ খণ্ডে কয়েকজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি গিয়ে হাজির হয়, যাদের মধ্যে একজন হল মণিমোহন। 'উপনিবেশ'-এর কাহিনি তিনটি ধারায় বিকশিত হয়েছে — সরকারী কর্মোপলক্ষে সভ্যসমাজ থেকে যাওয়া তহশিলদার মণিমোহনের অভিজ্ঞতার কাহিনি, বলরাম কবিরাজ ভিষকরত্ন, মুক্তো, নুরুল গাজীর কাহিনি এবং পর্তুগীজ নারী লিসিকে কেন্দ্র করে ডি-সিলভা, ডি-সুজা, জোহান ও গঞ্জালেসের কাহিনি।

প্রথম কাহিনিটিতে অর্থাৎ সরকারী তহশীলদার মণিমোহনের অভিজ্ঞতার অংশটিতে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মণিমোহন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এস.সি পাশ করে চর ইস্‌মাইলপুরের খাসমহল কাছারির তহশিলদার হয়ে আসে। একদিন কালুপাড়ায় জেলে মুসলমান ও মগ প্রজাদের থেকে টাকা আদায় করতে এসে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সেখানে তার কাছে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটি উগ্রযৌবনা মগের মেয়েকে বিচারের জন্য আনা হয়। মেয়েটির নাম মা-ফুন। মেয়েটির অপরাধ, সে তার স্বামীর মাথায় ইট মেরেছে। মণিমোহন তাকে দেখে চমকে ওঠে; কারণ চর ইস্‌মাইলের আদিম হিংস্র সুন্দরী রূপটি যেন এই মা-ফুনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘটনাক্রমে এই মা-ফুনের সঙ্গে মণিমোহনের ঘনিষ্ঠতা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে এক প্রচণ্ড ঝড়ের রাত্রে মা-ফুনের ঘরে রাত্রিবাস করার সময় মণিমোহন তার রূপটির আরও বিস্তারিত পরিচয় পায় — সে রাত্রে কামনা-তপ্ত আলিঙ্গনের সময় স্ত্রী রানীর মুখ মনে পড়ায় মণিমোহন মা-ফুনের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়। কিন্তু কোমরে রাখা ছোরার ভয় দেখিয়ে মা-ফুন মণিমোহনকে ছাড়ে না। এতে মণিমোহন বুঝে যায় 'ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়'। ধীরে ধীরে মণিমোহনকে বিদেশিনী মা-ফুনের রূপ আকৃষ্ট করে। সে তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সিভিল ম্যারেজের আইনে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বর্মী মেয়ে মা-ফুন বোঝে এই অসামাজিক প্রেম বা ভালো লাগা চর ইস্‌মাইলে সম্ভব হলেও কলকাতার সভ্যসমাজ তা অনুমোদন করবে না। তাই মণিমোহনের অগোচরেই সে অন্ধকারে বোট থেকে

নেমে জল-জঙ্গল, অন্ধকার ও আরণ্যক-প্রকৃতির কোলে ফিরে যায়। পরবর্তী সময়ে মণিমোহন সুন্দরী স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে সঙ্গে করে হাকিমের পদ নিয়ে চর ইস্‌মাইলে ফিরে আসে। সে সময় একবার মামুদপুরের দারোগার সঙ্গে আগস্ট আন্দোলনের ফেরার আসামীকে ধরতে গেলে মা-ফুনের সঙ্গে তার আবার দেখা হয়। এতে চর ইস্‌মাইলের মোহময় আদিমতায় তার বুক আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে আর মা-ফুনের কাছে যেতে চায় না — সেখান থেকে পালানোর কথা ভাবে। এভাবে এই উপন্যাসে চর ইস্‌মাইলের বাইরের চরিত্র সভ্যজগতের মণিমোহন সেখানকার বন্য পরিবেশে সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না।

এই উপন্যাসে চর ইস্‌মাইলে বসবাসকারী একজন মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্র বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন। তার আদি বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। সে চর ইস্‌মাইলপুরে তার কবিরাজী ব্যবসা ফলাও করে ছড়িয়ে দিয়েছে। দশ বছর আগে বিপত্নীক হওয়া বলরাম তার নারীসঙ্গহীন নিরাত্মীয় জীবনে একদিন হঠাৎ দেশ থেকে মুক্তো নামে মধ্যম মাপের সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে আসে। আপাতভাবে তাকে দেখাশোনা করার জন্য সে মুক্তোকে আনে, তবে সে শারীরিক ও মানসিক ভাবে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেই মুক্তোকে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু মুক্তো প্রৌঢ় বলরাম কবিরাজকে পুরোপুরি মেনে নেয় না। তাই দেখা যায় যে, বলরামকে দেহদান করে তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেও একদিন কী এক অনির্দেশ্য কারণে তাকে পরিত্যাগ করে মুক্তো ধনী ব্যবসায়ী বৃদ্ধ নুরুল গাজীর আশ্রয়ে গিয়ে ওঠে। তবে নুরুল গাজীর কাছেও সে থাকতে পারে না। দীর্ঘদিন বাদে শরীর ও মনের সর্বত্র ক্ষত-লাঞ্ছনা নিয়ে সে পুনরায় বলরাম কবিরাজের কাছে ফিরে আসে। বলরাম কবিরাজও তাকে চর ইস্‌মাইলের সঙ্গীহীন জীবনে বিনা প্রশ্নে পুনরায় গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। এ রকমটা একমাত্র চর ইস্‌মাইলের মত সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকা কোন অঞ্চলেই সম্ভব।

এই উপন্যাসের কাহিনি অংশের তৃতীয় ধারাটি পর্তুগীজ মেয়ে লিসিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। চর ইস্‌মাইলে বসবাসকারী পর্তুগীজ ডি-সিলভার নাতনী লিসিকে বিয়ে করতে চায় বছর চল্লিশের পেট মোটা ডি-সুজা। এদিকে ডি-সিলভার ইচ্ছে বিখ্যাত জলদস্যু সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর তার বন্ধু ডেভিডের পুত্র স্যামুয়েল

গঞ্জালেসের সঙ্গে লিসির বিয়ে দেবে। এতে গঞ্জালেসেরও সম্মতি আছে। কিন্তু লিসি ও জোহান পরস্পরকে ভালোবাসে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। জোহান এই বিয়েকে নিয়ে রঙিন স্বপ্ন বোনে। তবে তার এই স্বপ্ন পূরণ হয় না — ডি-সিলভার চোরাকারবারের অংশীদার এক বর্মীর ধারালো দায়ের কোপে জোহানের জীবনান্ত ঘটায় এই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। জোহানকে মেরে সেই বর্মী লিসিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। নাতনীর এই অন্তর্ধান ডি-সিলভা সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যায়। একদিন সেও চর ইস্‌মাইল ত্যাগ করে — তাকে আর কেউ দেখতে পায় না। এদিকে লিসিকে না পাওয়ায় স্যামুয়েল গঞ্জালেসের মনেও এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতা থেকে তাঁর রক্তে পূর্বপুরুষ অর্থাৎ সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেস ও অন্যান্য 'হার্মাদ'দের উন্মত্ত দুঃসাহসিকতা উঁকি দেয়। সে লিসিকে খুঁজে আনবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয় না। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চর ইস্‌মাইলেও নেমে আসে। ফলে দেখা দেয় নানা বিপর্যয়। বুভুক্ষু মানুষেরা খেতে না পেয়ে ধানের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে মহাজন মজঃফর মিঞার কাছারি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে সময় গঞ্জালেস ভাবে একটি মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করে নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার কোনো দরকার হয় না। ফলে সে আর লিসির সন্ধানে আত্মনিয়োগ না করে নিজেকে কোনোখানে আর বেধে না রেখে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। এরপর থেকে তাকেও আর চর ইস্‌মাইলে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এভাবে উপস্থাপিত 'উপনিবেশ' উপন্যাসটির কাহিনি ধারার মধ্যেই আঞ্চলিকতার নানা লক্ষণ ধরা পড়েছে। তবে সেই লক্ষণগুলি অনুসন্ধানের পূর্বে উপন্যাসটি সম্পর্কে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের মনোভাবটি জেনে নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি। উপন্যাসটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন — ''উপন্যাস লেখার কথা সেই দিনই আমার মনে এসেছিল — যেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম পৃথিবীটা অনেক বড়।''[২২২] এই বড় পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে সভ্যসমাজের জীবনচর্যার ছাপ তেমনভাবে পড়েনি। সেরকমই এই বড় পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত অথচ সভ্যসমাজের অজানা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি সেখানকার অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই

তিনি ‘উপনিবেশ’ রচনায় হাত দেন। তাই এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন সংলগ্ন একটি চরভূমি চর ইস্‌মাইল এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের বিচিত্র জীবনচর্যাকে। এই সম্পর্কে উপন্যাসটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন — ‘‘নিম্ন বাংলার নদী সমুদ্রের দেশে মাটির মতোই সমাজ আর জীবন যেখানে অপরিণত, তার সঙ্গে কী করে যে একদিন মিখেইল শোলোকভের যোগাযোগ ঘটল, তা আজ আর আমার ভালো করে মনে পড়ছে না। কিন্তু ডন কোজাক্‌দের নিয়ে শোলোকভের সেই আশ্চর্য সৃষ্টি — সেখানে ব্যক্তি চরিত্র মুখ্য নয়, আলোড়িত বিলোড়িত একটা বিপুল গোষ্ঠীর প্রাণ-বন্যায় ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে গেছে এবং বিলেতি অর্কেস্ট্রার বহু যন্ত্রে হার্মনির মতো বিচিত্রের অখণ্ডতা যেখানে ধ্বনিত হয়েছে সেই রকম ভাবে একটা সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে আমি প্রলুব্ধ হয়ে উঠলাম। চর ইস্‌মাইলের পটভূমি তার আদিমতার স্বরলিপিতে বহুচরিত্রের যন্ত্রকে ঐকতানে বাজিয়ে তুলল। তাই এই উপন্যাসের, অন্তত প্রথম খণ্ডের মানুষগুলি উপনিবেশেরই সৃষ্টি — তারা উপনিবেশকে গড়ে তোলেনি।’’[২২৩] ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী’ প্রথম খণ্ডের প্রকাশের সময় ভূমিকা অংশে ‘উপনিবেশ’ উপন্যাস সম্পর্কে গ্রন্থটির যুগ্ম-প্রকাশকদ্বয় লিখেছেন — ‘‘উপনিবেশ’ লেখকের প্রধান ক্লাসিক রচনাগুলির অন্যতম। কারও কারও মতে শ্রেষ্ঠতম। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে, বা নিম্নবঙ্গে বললেই ভাল হয়, প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে মাঝে মাঝেই চর দেখা দেয়। কখনও পুরাতন চর মিলিয়ে যায় নদীগর্ভে, কখনও বা কোন চরের জীবদ্দশা দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয়। চর ইসমাইল এই রকমই একটি চর। এই চর, তার বিচিত্র অধিবাসীরা, তাদের বিচিত্রতর জীবনযাত্রা, চার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খ্যাপাটে নদী তেঁতুলিয়া — এদের সকলের কথা নিয়েই এই ‘উপনিবেশ’ উপন্যাস।’’[২২৪] ঔপন্যাসিকের উপন্যাসটি সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য এবং যুগ্ম-প্রকাশকদ্বয়ের কথা থেকেই স্পষ্ট যে ‘উপনিবেশ’ উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানাকারণে বিচ্ছিন্ন কোনো একটি অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়েছে, সমগ্র উপন্যাসে এই অঞ্চলটি চর ইস্‌মাইল নামে বিরাজ করেছে। উপন্যাসটির তিনটি খণ্ড থেকেই এই মূল জনসমাজের মধ্যে থেকেও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটির ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।

ঔপন্যাসিক তাঁর প্রথম উপন্যাসেই পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন নিম্নবঙ্গ সুন্দরবনের আরণ্যক প্রতিবেশে তেঁতুলিয়া নদীর মোহনায় সমুদ্র তীরবর্তী একটি চরকে। উপন্যাসে যার নাম চর ইস্‌মাইল। এই চর ইস্‌মাইল যে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তা অধ্যাপক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় — ''তাঁহার তিন পর্বে সমাপ্ত 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি এই ভূগর্ভলুপ্ত খরতর চেতনাধারাকে, এই আদিম আরণ্য সংস্কারকে, নূতন করিয়া উপলব্ধি করার একটি চমকপ্রদ প্রচেষ্টা। অবশ্য এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সীমান্তে, সুন্দরবনের আরণ্য সর্পিলতার শেষ ফণাশীর্ষে, সমুদ্র গর্ভ হইতে সদ্য-জাগিয়া-ওঠা, কর্দমাক্ত-পিচ্ছিল, জল-স্থল-আকাশের দুর্দম আসঙ্গলিপ্সাপ্রসূত, অপরিণত ভ্রূণ পিণ্ডের ন্যায় অবয়বহীন চর ইসমাইলে। এখানে মানবজীবনের উপর প্রকৃতি-পরিবেশেরই একাধিপত্য — সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস মানবিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্দম ঝটিকালীলার গতিবেগ মানুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সংক্রামিত হয়।''[২২৫] মূল উপন্যাসের মধ্যেও নানাসময়ে চর ইস্‌মাইল তার স্বতন্ত্র প্রকৃতি নিয়ে হাজির হয়েছে। ঔপন্যাসিক এই চরটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন — ''নদী — অশান্ত এবং চঞ্চল। জলের আস্বাদ যেমন আঁশটে, তেমনই নোনা। ভাঁটার সময় আবার সে জলের রঙ নীলাভ হইয়া আসিতে চায়। আর বিচিত্র বর্ণগন্ধ সমন্বিত সেই জল অন্তহীন বিস্তারে চর ইসমাইলকে সমস্ত জগৎ হইতে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে বলিলেই চলে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার সহিত বৎসরের মাত্র ছয় মাস পৃথিবীর সত্যিকারের যোগ-সূত্রটা বজায় থাকে। আশ্বিনের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ — সময় বলিতে ইহাই। যেই নদীর বুকের উপর হইতে কুয়াশার পর্দাটা একটু একটু করিয়া সরিয়া যায় আর চরের গায়ে এখানে ওখানে দু'চারিটি বুনো ফুল ফুটিতে শুরু করে, অমনি পাটির মত শান্ত নদীটির চেহারা যায় বদলাইয়া। হয়তো চৈত্রের এক বিকালে আকাশের ঈশান কোণে কে একবিন্দু কালি ছিটাইয়া দেয় — আর তারপরেই গোঁ গোঁ করিয়া চাপা একটা কান্নার মতো শব্দ নদীর তলা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। ক্রমে সেই শব্দ বাড়িতে থাকে, বাড়িতেই থাকে, — সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেরও আগড় খুলিয়া যায়। সেই তাণ্ডবে একবার পড়িলে এক

গাছের শাল্‌তি নৌকাও প্রাণ লইয়া ফিরতে পারে না। আর ঝড় না উঠিলেই বা কী আসে যায়। তেঁতুলিয়া, মেঘনা, ইল্‌সা কিংবা কালাবদরের মুখে যখন তখন যে এক একটা দমকা উঠিয়া আসিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে।''[২২৬] কখনো কখনো এই চর ইস্‌মাইল শান্তভাবে থাকে, মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে — ''সামনে সকালের নদী শান্ত ও উজ্জ্বল বিস্তারে যেন ঘুমাইয়া আছে। ঝড়ের গর্জন নয় — রাক্ষসী ভৈরবী মূর্তি নয়। জলের মৃদু কলধ্বনি যেন সঙ্গীতের মতো বাজিতেছে। ওপারে দিকচক্রবালে শ্যামল বনরেখার ধু-ধু আভাস দেখা যাইতেছে — মাথার উপর নির্ভাবনায় উড়িয়া চলিয়াছে মাছরাঙা আর গাং শালিখের ঝাঁক।''[২২৭]

এখানে সরকারী চাক্‌রী সুত্রে হাজির হয়ে সভ্যজগতের সন্তান মণিমোহন বুঝতে পারে — এ তার বাংলা নয়; এর প্রকৃতি ভিন্ন, স্বতন্ত্র — ''এখানে আসিয়া মণিমোহন এই সত্যটা সকলের আগে অনুভব করিল যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের প্রশস্ত ধানক্ষেতের বাহিরে পৃথিবীর আর একটা রূপ আছে। সে রূপ মানুষকে নিতান্ত মুগ্ধ করে না — দিকে দিকে রাক্ষসীর মতো করাল জিহ্বা বিস্তৃত করিয়া সে ফুঁসিয়া ওঠে — গর্জন করিয়া ওঠে। সে মূর্তির দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা আতংকে থরথর করিয়া দুলিতে থাকে।''[২২৮] উপন্যাসে পর্তুগীজ স্যামুয়েল গঞ্জালেসের দৃষ্টিতেও চর ইস্‌মাইলের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে — ''সামনে বিল। বর্ষায় তেঁতুলিয়ার জল আসিয়া বিল আর নদীকে একত্রে করিয়া দেয়, তারপর বর্ষার অবসানে ছোট বড় অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন জলখণ্ড লইয়া বিলের সৃষ্টি হয়। মাটির নিবিড় স্পর্শে নোনা জল মিঠা হইয়া উঠিয়াছে, শালুক পাতা আর গাঢ় সবুজ কল্‌মী শাক লক্‌ লক্‌ করিতেছে। . . গঞ্জালেস্‌ একটি ঢিবির উপর আসিয়া বসিল। সাদা সাদা মেঘে সারা আকাশটা ছাইয়া আছে, আর সেই আকাশ একটা গম্বুজের মত বাঁকিয়া দূরে নদীর মধ্যে নামিয়া গেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে, আকাশটা আর কিছু নয় — ওই নদীটাই ওখান দিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, সাদা মেঘগুলি ঢেউয়ের মতো সূর্যের আলোয় জ্বলিয়া উঠিতেছে।''[২২৯] চর ইস্‌মাইলের ভৌগোলিক পরিবেশ, সেখানকার মৃত্তিকা, সেখানকার প্রকৃতি যেমন সভ্যজগতের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মেলে না, তেমনি এখানকার আবহাওয়াও ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে

হাজির হয়। এখানে যখন ঝড় ওঠে তখন রীতিমত তাণ্ডব শুরু হয় — ''সমুদ্রের ওপারে ওই যে বিরাট্ জলসাটা বসিয়াছিল। সেখানে যাহাদের নাচিবার কথা ছিল তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে! একটা দম্‌কা ঝাপটায় পিছনের সমস্ত বাগানটা তারস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল — অনেকগুলি পায়ের নূপুরের ঝঙ্কার আকাশ কাঁপানো একটা শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া সম্মুখে বহিয়া গেল। একরাশ ধুলা-বালি ও শুক্‌নো পাতা আসিয়া চোখে-মুখে উড়িয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য ধুলার একটা ঘূর্ণ্যমান আবরণ ছাড়া সামনে আর কিছুই রহিল না।''[২৩০] চর ইস্‌মাইল তার স্বতন্ত্র প্রকৃতি, রীতি-নীতি নিয়ে নিজের নিয়মেই চলে — ''এখানকার বসন্ত আসে ঝড়ের সঙ্কেত লইয়া। ফাল্গুনের বৈকাল এখানে ভাঁট ফুলের গন্ধে মদির হইয়া ওঠে না, কাল বৈশাখীর তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে দিগন্তে কালো মেঘ ফেনার মত ফাঁপিয়া ওঠে। চঞ্চল-কটাক্ষের মধ্য দিয়া এখানে যে প্রেমের সূচনা হয়, প্রখর কামনার বিপ্লবের আঘাতে তাহার নিশ্চিত পরিণতি ঘটে। পৃথিবীর সমস্ত রীতি-নীতি, সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলার বাহিরে এই চর ইস্‌মাইল।''[২৩১] একসময়ে নদীর মোহনায় সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা নিছক একটি চর থেকে ধীরে ধীরে চর ইস্‌মাইলে জনবসতি গড়ে উঠলেও সভ্য জগতের ছোঁয়া সেখানে খুব বেশি লাগে না। তার সবকিছু নিয়ে চর ইস্‌মাইল সভ্যসমাজের বাইরেই থেকে যায়। এটা ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে জানিয়েছেনও — ''কম করিয়াও এখন প্রায় হাজার দেড়েক মানুষের বসতি। সপ্তাহে একদিন খুব বড় করিয়া হাট বসে, আশেপাশের চরে বালাম ধান আর মহিষের বাথান লইয়াই যারা দিন গুজরান করে, এই একটি দিনে এখানে আসিয়া তাহারা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের অনেক কিছু কেনা-কাটা করিবার সুযোগ পায়। অনেক সময় এখানে আসে বড় বড় মহাজনী নৌকা — আশা করা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু কিছু প্রসার ঘটিলে হয়তো বা আর্-এস্ এন্ কোম্পানী এই পর্যন্ত স্টিমারের একটা লাইন খুলিলেও খুলিতে পারে। কিন্তু এত করিয়াও চর ইস্‌মাইল সভ্য জগতের খুব কাছে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। নদীর নিবিড় ও গভীর স্নেহ ইহাকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া আছে। সে স্নেহের কঠিন বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিয়া সম্পূর্ণভাবে ইহাকে আত্মসাৎ করা মানুষের ক্ষমতার

বাহিরে।''[২৩২] এভাবে এই উপন্যাসের পটভূমিকায় মূল জনসমাজ থেকে ভৌগোলিক এবং প্রকৃতিগত কারণে বিচ্ছিন্ন থাকা একটি অঞ্চলকে তুলে আনা হয়েছে।

উপন্যাসটির চরিত্রদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এখানে ঔপন্যাসিক পর্তুগীজ জলদস্যু 'হার্মাদ'দের ভারতে থেকে যাওয়া কিছু উত্তরপুরুষদের চিত্রিত করেছেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েক ঘর চর ইস্‌মাইলে রীতিমতো ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেছে। ডি-সুজা, ডি-সিলভা, জোহান, গঞ্জালেস, লিসি প্রমুখরা হল এসব মানুষ। একমাত্র গঞ্জালেস বাদে এরা সকলেই চর ইস্‌মাইলে বসবাস করেছে এবং সেটাকেই তাদের বাসস্থান মনে করেছে। তবে সেখানে বসবাস করতে করতে এরা তাদের পর্তুগীজ পরিচয় প্রায় ভুলতে বসেছে — ''এই চর ইসমাইলে এখনো আট দশ ঘর পর্তুগীজ বাস করে। বাহির হইতে চট্‌ করিয়া দেখিলে তাহাদের চেনা কঠিন। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের মুসলমানদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক ঘটিয়া একটি বিচিত্র সঙ্কর জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহারা। পরে লুঙ্গি, কানে গুঁজিয়া রাখে গোলাপী বিড়ি, পিতৃপুরুষের ভাষার শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত চাটিয়া খাইয়াছে বলা চলে। কথায় কথায় কেবল মেরীর নামে শপথ এবং বিবর্ণ একটা ঘর্মসিক্ত কালো কারের সহিত গলায় ঝুলাইয়া রাখা নিকেলের ক্রস্‌ তাহাদের ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দেয়।''[২৩৩] এখানে কিছু আরাকানী মগ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারীরাও বাস করে। উপন্যাসে তাদের বর্মী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আঠারো-উনিশ বর্ষীয়া সুন্দরী মা-ফুন এদের প্রতিনিধি। চর ইস্‌মাইলে থাকতে থাকতে এদের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন হয়েছে। সভ্যজগতের ছেলে মণিমোহন তাদের সম্পর্কে ভেবেছে — ''এখানকার প্রকৃতি অমার্জিত — এখানে মানুষ নদী আর সমুদ্রের সমস্ত রুদ্রতার সহিত মুখোমুখি সংগ্রাম করিয়াই টিকিয়া আছে। ছোট ঘরের সীমানায় ছোট এতটুকু প্রেম কি এখানে মানাইত? সমস্ত নীতি, সমস্ত শৃঙ্খলাকে ভাঙিয়া যে বর্বর যৌবন এখানে মুক্তি পাইয়াছে, স্বামীর মাথা ইঁটের ঘায়ে ভাঙিয়া দিয়াই তাহা পটভূমির মর্যাদা রাখে! জীবনের কোন্‌ রূপটা যে ভালো, আজ যেন সেটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।''[২৩৪] চর ইস্‌মাইলে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি থেকে ভাগ্যান্বেষণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ গিয়ে হাজির হয়। মজঃফর, কাশেমের ব্যাটা প্রমুখের মত মানুষগুলি সেখানকার

জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম হলেও সবাই তা করতে পারে না। তাই কেরামদ্দি ভাবে — ''এই চর ইস্‌মাইল তাহারও নিজের দেশ নয়, এখানকার কাহারো সঙ্গে সে যে নিজের ভাষা বা মনের ছন্দটাকে সমানভাবে মিলাইতে পারে তাহাও নয়।''[২৩৫] পোস্টমাস্টার হরিদাস, মণিমোহনের সহকারী গোপীনাথেরাও এই চরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। মণিমোহন জীবিকা সূত্রে এই চরের সঙ্গে কিছুটা মানিয়ে নিলেও বাইরের মানুষই থেকে গেছে — ''এখানকার যোগ্য নয় মণিমোহন। এই হিংসা আর পশুত্বকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় জাগে, কিন্তু শ্রদ্ধা আসে না। আদিম অমার্জিত যাহা — তাহার মধ্যে বিশালত্ব আছে, কিন্তু রূপ নাই। তাহা আগুন লাগিতে পারে, আলো জ্বালাইতে পারে না।''[২৩৬] হয়তো একারণেই মণিমোহন শেষ পর্যন্ত চর ইসমাইলকে আপন করে নিতে পারে নি, এই চর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে — ''সে পালাইবে। আজ তাহার জীবন বদলাইয়াছে, তাহার যৌবন নাই। চর ইসমাইলকে সে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, মানিয়া নিতে পারে না কাল-বৈশাখীর তরঙ্গ-তাণ্ডবে উন্মত্ত এই ভয়ানক নদীর দিগন্ত-বিস্তারকে, এখানকার বর্বর প্রাণোল্লাসকে।''[২৩৭] অবশ্য বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন কবিরাজ, নুরুল গাজী, মুক্তো প্রমুখেরা বাইরে থেকে এখানে এলেও শেষ পর্যন্ত চরটিকে আপন করে নিয়েছে। সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে মুক্তোর। বলরাম সম্পূর্ণ নারীসঙ্গহীন ও নিরাত্মীয় জীবনে নিজের একাকীত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে মুক্তোকে চর ইস্‌মাইলে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম মুক্তো সেই চরটিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি এবং তাকে সভ্যজগতে ফিরিয়ে আনার জন্য বলরামের কাছে বায়না করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, সে বলরামকে দেহদান করে তার সন্তান গর্ভে ধরেছে, এক সময় বলরামকে ত্যাগ করে ধনী নুরুল গাজীর ঘরে উঠেছে এবং সবশেষে পুনরায় বলরামের কাছে ফিরে এসেছে। বলরামও তাকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেছে। সভ্যসমাজ থেকে দূরে অবস্থিত কোনো জনসমাজের চরিত্রের পক্ষেই এসব সম্ভব। এভাবে মুক্তো শেষপর্যন্ত চর ইস্‌মাইলের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পুরোপুরি সেই অঞ্চলের মানুষ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির তিন খণ্ডে হিন্দু, মুসলিম, পর্তুগীজ, বর্মী মিলে অনেক চরিত্রই আছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে লক্ষ করা যায় এখানে কোনো নায়ক নেই।

মণিমোহনের মধ্যে কিছুটা নায়কোচিত বৈশিষ্ট্য থাকলেও সে এমন কিছু কাজ করেনি যে, তাকে নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায়। পাশাপাশি সে চর ইস্‌মাইলের ভূমিপুত্র নয় -- বাইরে থেকে সেখানে গিয়েছে এবং সেখানকার বিচিত্র জীবনচর্যাকে দেখে আকৃষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত বাইরের মানুষই থেকে গেছে। এজন্য উপন্যাসের নায়ক ঠিক করতে হলে তেঁতুলিয়া মোহনায় তৈরি সেই চর ইস্‌মাইলকেই বাছতে হয়; কারণ সবকিছু ছাপিয়ে উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভূ-খণ্ডটি তার অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী'র যুগ্ম-প্রকাশকদ্বয়ের দৃষ্টিতেও এই বিষয়টি ধরা পড়েছে -- ''এই চরের অধিবাসীদের মধ্যে আছে যেমন স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান, তেমনি আছে আরাকানী মগ, পর্তুগীজদের অবলুপ্তমান বংশধরেরা। আছে কার্যোপলক্ষে শহরের সরকারী কর্মচারীদের সাময়িক উপস্থিতি, তেমনি আছে গাঁজা-আফিমের চোরাই চালানকারীদের গোপন আসা-যাওয়া। . . . 'উপনিবেশ' ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবার কেন্দ্রিক উপন্যাস নয়। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল ও বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মানুষদের নিয়ে এই চরের অধিবাসী সমাজের যে জীবন-প্রবাহ চর ইস্‌মাইলে অহরহ স্পন্দিত, তা-ই এই উপন্যাসের নায়ক বা প্রাণ।''[২৩৮]

উপন্যাসে চর ইস্‌মাইলের অধিবাসীদের জীবন যাপন প্রণালীতেও বিশিষ্টতা আছে। সভ্যসমাজের কড়াকড়ি, চোখরাঙানি, নীতির শাসন এখানে অনুপস্থিত। চরের নিকটবর্তী সমুদ্রের মতই এখানকার জীবন উদ্দামতায় ভরা। সভ্যজগৎ থেকে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন -- ''মিশিবার মতো লোক এখানে নাই। ভদ্রলোক যাহারা আছেন তাহারা পত্নীসঙ্গহীন প্রবাস-জীবন যাপন করে। অবশ্য তাই বলিয়া নারীসঙ্গহীন নয়। তিন শতাব্দী আগে পর্তুগীজদের সঙ্গে যে আরাকানীর দল এখানে আসিয়াছিল, বাংলাদেশের মাটির স্যাঁতসেঁতে স্পর্শ লাগিয়া বংশক্রমে নোনা ধরিয়াছে তাহাদের। সামান্য কিছু ব্যয় করিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে নৈশ-সঙ্গিনী সংগ্রহ করা কঠিন নয়।''[২৩৯] ঔপন্যাসিক এই অঞ্চলটির বিশিষ্টতা সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন -- ''প্রকৃতির আত্মকেন্দ্রিক অসীম স্বতন্ত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম সামজিকতার বন্ধনই এখানে ঢিলা হইয়া গিয়াছে। অনুকূল পৃথিবী ও সমাজের গণ্ডিটির মাঝখানে সেখানে

প্রাচুর্য আছে, চরিত্রহীনতার নিন্দা সেখানেই সম্ভব; কিন্তু স্থানকালপাত্র হিসাবে সমাজের সংজ্ঞাটাই এখানে বদলাইয়া গিয়াছে।''[২৪০] এখানে আইন বা নিয়ম-কানুনের বালাই তেমন নেই — ''এ হচ্ছে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, পৃথিবীর বাইরে। এখানে কোনো আইন-কানুনের বাঁধাবাঁধি নেই — কেউ কিছু জানবে না।''[২৪১] এর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়া আরাকানী যুবতী মা-ফুনের আচরণেও তেমন নীতি নৈতিকতার বালাই দেখা যায় না। সুন্দরী মা-ফুন যেমন অনায়াসেই তার কুৎসিৎ স্বামীর মাথায় ইটের আঘাত করতে পারে, তেমনি নির্দ্বিধায় বাইরের লোক মণিমোহনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। এক্ষেত্রে মণিমোহনের আপত্তিকেও সে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। এক ঝড়ের রাত্রে মা-ফুন মণিমোহনকে নিজের বিছানায় আহ্বান জানায়। প্রথমে মণিমোহন আগ্রহ দেখালেও স্ত্রী রানীর মুখ মনে পড়ায় তাকে ছেড়ে যেতে চাইলেও মা-ফুন তাকে ছাড়ে না — ''চকিত হইয়া সে নিজেকে সেই বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিতে চাহিল — তাহার মনের সামনে রানীর মুখখানা সিনেমার ছবির মতো আসিয়া দেখা দিতেছে। . . . কিন্তু ছাড়াইতে চাহিলেও সে ছাড়াইতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত গর্জনের মধ্য দিয়াও স্পষ্ট শুনিতে পাইল : এখন তুমি আমার — আমার। জোর করে আমাকে ছাড়াতে পারবে, কিন্তু আমার কোমরের ছোরাখানাকে ছাড়াতে পারবে না।

ভয়ে তাহার সমস্ত দেহ হিম হইয়া গেল।

ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়। উপনিবেশের বন্য ও উদ্দাম কামনার আগুন জ্বলিয়াছে। এ আগুনে জ্বলিয়া সুখ আছে কিনা কে জানে; কিন্তু অন্ধকারে মণিমোহন একখানা জ্বলজ্বলে ছোরা যেন চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছিল।

বাহিরে তখন প্রবল ঝড়ের গর্জন চলিতেছিল। সেই ঝড়ের তাণ্ডব ঘরের মধ্যেও ভাঙিয়া পড়িল।''[২৪২]

অথচ মা-ফুন চরটির বাইরের জীবনে মণিমোহনকে আপন করে নিতে চায় নি। তাই মণিমোহন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সিভিল ম্যারেজ আইনে বিয়ে করতে চাইলে সে বিয়েতে রাজী হয় না। ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বর্মী মেয়ে জড়োসড়ো হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত ঘটনাটাই যেন মন্ত্রবলে ঘটিয়া

চলিয়াছে। মণিমোহনকে তাহার ভালো লাগিয়াছে সত্য — কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে উপনিবেশের এই পটভূমিকা। এই বর্বরতার মাঝখানে সে সভ্য-জগতের আলো লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সভ্য জগতে? যেখানে মণিমোহনকে আর দশজনের মধ্যে একজন, যেখানে বহুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যহীন একটা বুদ্বুদ হইয়া মিলাইয়া যাইবে সে, সেখানে? নিজের বন্য মনকেই কি সে বিশ্বাস করে? রেঙ্গুন-মৌলমিন-পেগু হইতে নিজেকে সে একদিন ছিনাইয়া আনিয়াছিল — আজ আবার উপনিবেশকেও ছাড়াইয়া যাইতে চায়? নূতন জীবনেই কি বাঁধা পড়িবে সে? নদীর মতো সে বহিয়া আসিতেছে, পুরোনো চর ভাঙিয়া নূতন চরকে সে রচনা করিতেছে প্রত্যহ — মণিমোহন কি অনড় হইয়া থাকিবে সেই স্রোতের মুখে।''[২৪৩] এই সমস্ত ভাবনা থেকেই সে মণিমোহনকে ত্যাগ করে।

চর ইস্‌মাইলের জীবনযাত্রার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সাজুয্য রেখে চলে সেখানকার প্রকৃতি। এখানকার ঋতু পরিবর্তনের ধারায় বসন্ত ঋতু খুব সমারোহ নিয়ে হাজির হয় না — ''চর ইসমাইলে বসন্ত আসিয়া গেল। অবশ্য খুব সমারোহ করিয়া নয়। নোনা মাটিতে ফুল ফুটিতে চায় না। আশেপাশে গাঙের জলে টান ধরিয়া যায়, নদীর ঘন গৈরিক বর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিবার উপক্রম করে। নদীর ধারে নরম পলিমাটির উপর ত্রিশূলের মতো ছোট ছোট পদচিহ্ন আঁকিয়া স্নাইপের দল শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে বড় বড় পাখা দুলাইয়া ফুটফুটে শাদা একরাশ পেঁজা তুলার মতো এক এক জোড়া চখা-চখী আসিয়া এখানে ওখানে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবার তেমনি করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে ঈথার-সমুদ্রে শব্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া হাঁসের দল অনির্দেশ অভিমুখে ফিরিয়া যায় — হয়তো কাশ্মীরে, হয়তো মানস-সরোবরে, হয়তো বা আরো দূরে।''[২৪৪] এই বসন্ত চর ইস্‌মাইলের জীবন তরঙ্গেও তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না — ''চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল। . . . এখানকার বসন্ত আসে ঝড়ের সঙ্কেত লইয়া। ফাল্গুনের বৈকাল এখানে ভাঁট ফুলের গন্ধে মদির হইয়া ওঠে না, কালবৈশাখীর তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে দিগন্তে কালো মেঘ ফেনার মতো ফাঁপিয়া ওঠে। চঞ্চল কটাক্ষের মধ্য দিয়া এখানে যে প্রেমের সূচনা হয়, প্রখর কামনার বিপ্লবের আঘাতে তাহার নিশ্চিত পরিণতি ঘটে। পৃথিবীর সমস্ত রীতি-নীতি, সমস্ত শৃঙ্খলার বাহিরে এই

চর ইস্‌মাইল। তাই এখানকার মাটিতে কখনো সোনার ফসল দেখা যায় না; সৃষ্টির বীজ এখানকার গর্ভকোষের সংস্রবে আসিয়া অনাসৃষ্টিতে পল্লবিত হইয়া ওঠে।''[২৪৫] এখানকার মানুষের জীবনের উপরেও এই প্রকৃতির প্রভাব পড়ে। তাই লিসিকে নিয়ে রোমান্টিক মোহাচ্ছন্ন গঞ্জালেসের মধ্যে পূর্বপুরুষের পর্তুগীজ রক্ত উছলে উঠলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সে সহজেই লিসির ভাবনা ত্যাগ করতে পারে — ''কী হইবে একটা মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করিয়া, নিজের সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া? পৃথিবী অনেক বড় — পৃথিবীতে অনেক মেয়ে। একজনকে যদি না পাও, তাহার প্রতিনিধি হিসাবে আরো দশজনকে আয়ত্ত করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনা এমন কিছু কঠিন কথা নয়। . . . নতুন করিয়া জীবন শুরু হইল গঞ্জালেসের। কোনোখানে বাঁধা পড়িয়া নয় — পৃথিবীময় ছড়াইয়া। নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা উল্লাস তাহার মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল — কালো রাত্রির কালো স্রোত দৃষ্টির অগোচরে বিশাল পৃথিবীর মহা আবর্তে তাহাকে লীন করিয়া দিল — আরো অনেক বিদ্রোহী শিশুর মতোই চরইস্‌মাইল আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না কোনোদিন।''[২৪৬] এদিকে বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্নের উপরেও এই বন্য প্রকৃতি প্রভাব ফেলায় নুরুল হাজি ফেরৎ মুক্তোকে পুনরায় গ্রহণ করতেও সে দ্বিধা করে না — ''আজ মুক্তো তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে — আজ আবার তাহাকে তিনি গ্রহণ করিবেন। এই চরইস্‌মাইলে যেখানে সমাজ নাই, মানুষের বাঁধাধরা নিয়মের দোহাই মানিয়া যেখানে জীবন সরলরেখাতেই বহিয়া যায় না — সেখানে মুক্তোকে নতুন করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই; সংশয়ও নাই।''[২৪৭] চর ইস্‌মাইলের জীবনের এই রূপ সভ্যসমাজের সঙ্গে কখনোই মেলে না; তা নিজের বিচিত্র রূপ নিয়ে স্বতন্ত্রই থেকে যায়।

এই চরে একসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের সহাবস্থান দেখা যায়। এখানে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তবে বলরাম কবিরাজের মতো কিছু হিন্দুও সেখানে আছে। পর্তুগীজরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। আর বর্মীদের ধর্ম বৌদ্ধ। এই অঞ্চলের ধর্মীয় দেবদেবীর পরিচয়েও আঞ্চলিকতার ছাপ আছে। ঔপন্যাসিক চর ইস্‌মাইলপুরের কালুপাড়ার হাটখোলার বর্ণনায় লিখেছেন — ''সব জায়গাতেই গ্রামের

হাটখোলায় একটি না একটি বারোয়ারী দেবতার স্থান দেখা যায়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হাটের মাঝখানে বড় গাজী কায়েমি হইয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে শুক্রবার দিন তাঁহার 'শিরণী' হয়। গাজী, দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বন-বিবি, এই চারটি দেবতা বা অর্ধদেবতা মিলিয়া আজও অপ্রতিহত প্রতাপে নিম্ন-বঙ্গ শাসন করিতেছেন; শিব, কালী, পীর সকলকে ছাড়াইয়াই ইঁহাদের সম্মান।''[২৪৮] আরকানী মগজাতীয় বর্মীদের সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন — ''ইহারা বৌদ্ধ — আচার বিচারে মুসলমানদের সঙ্গে খুব যে বেশি তফাৎ আছে তা নয় — তবু নিজেদের হিন্দু বলিয়াই মনে করে।''[২৪৯] তবে চর ইস্‌মাইলে মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ তেমন নেই। এজন্য পর্তুগীজ খ্রিস্টান ডি-সিলভা, বৌদ্ধ বর্মীরা এবং মুসলমান নুরুল গাজীকে একসঙ্গে অনায়াসেই চোরা কারবার করতে দেখা যায়, মুক্তো হিন্দু মেয়ে হিসেবে মূল জনসমাজে অবস্থানের কারণে ধর্মীয় রীতি-নীতি মানলেও চর ইস্‌মাইলে ধাতস্থ হওয়ার পর বলরাম কবিরাজকে ছেড়ে নুরুল গাজীর ঘরে যেতে দ্বিধা করে না। তবে সভ্যসমাজ থেকে যাওয়া মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতার দিকটি এই উপন্যাসেও আছে। তাই মণিমোহনের অধস্তন গোপীনাথ মণিমোহনের মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ও খাওয়া-দাওয়া করার মিথ্যে কথাটি মন থেকে মেনে নিতে পারে না।

এই উপন্যাসে স্থানীয় সংস্কৃতি তথা জীবনচর্যার বিবরণ থাকলেও আলাদাভাবে আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি, লোকাচার, লোককথার বিবরণ তেমন নেই। তবে ধর্মভেদে এখানকার মানুষদের সংস্কৃতি আলাদা। তাই মা-ফুনের বাড়ির বিবরণে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বর্মাদেশ-সুলভ ইহাদের বিচিত্রভাষা এবং বিচিত্রতর রীতি-নীতি প্রতিবেশিদের কাছে অনেকটা অপরিচিত বলিয়াই তাহাদের সংস্রব কম।''[২৫০] এই উপন্যাসে অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে স্থানীয় লোককথার উল্লেখ আছে — পর্তুগীজ স্যামুয়েল গঞ্জালেসের পূর্বপুরুষ সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের জীবনকথা পরিবেশনে এবং নুরুল গাজীর পূর্বপুরুষ সিকন্দর গাজীর সে অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার সংক্রান্ত গল্পে। প্রথমটির ক্ষেত্রে পর্তুগীজ জলদস্যু তথা 'হার্মাদ' সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের দুঃসাহসিক ডাকাতি করতে গিয়ে হিন্দু বাড়ির এক নববধূ সাজে সজ্জিতা মেয়েকে অপহরণের

কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কীভাবে নিম্নবঙ্গে ফকির-দরবেশদের মাধ্যমে মুসলিম ধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল তা বলতে গিয়ে সিকন্দর গাজীর অসমসাহসী ও নিষ্ঠুর কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

উপন্যাসটির পাত্রপাত্রীদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতির বর্ণনায় তেমন অভিনবত্ব নেই। হিন্দু, মুসলিম, পর্তুগীজ, বর্মী — এই উপন্যাসের সবাই বাঙালি খাদ্যরীতি গ্রহণ করেছে। ভাত, সব্জি, মাছ, মাংস প্রভৃতি এখানকার মানুষদের খাদ্যতালিকায় থাকে। বর্মীরা মাটির নিচে মাছ পচিয়ে 'ঙাপ্পি' বানিয়ে খায়। এছাড়াও সভ্যসমাজের মত চা খাওয়ার রীতি-রেওয়াজও সেখানে চালু আছে। তবে চর ইস্মাইলের অধিকাংশ মানুষ গরীব হওয়ায় এদের খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য কম। তাই মণিমোহনের কাছে দ্বীপ থেকে খেয়ে আসার কথা শুনে তার অধস্তন কর্মচারী গোপীনাথ ভাবে — ''এই গ্রামে এমন কোন লোক আছে যে সরকারীবাবুকে খাইতে দিবে! সন্ধ্যার সময় এক এক কাঁসি পান্তা ভাত গিলিয়াই তো ইহারা নিশ্চিন্তে রাত কাটাইয়া দেয়।''[২৫১] স্থানীয় মদ 'তাড়ি' এখানকার প্রায় সবাই পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা খেয়ে কমবেশি মাতলামিও করে। এখানকার পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে লুঙ্গি অপরিহার্য হিসেবে গণ্য হয়। বর্মী নারীরা নিজেদের পরনের ঘাঘ্রার সঙ্গে কোমরে একটি ছোরাও রাখে। এই দ্বীপের বাসভূমিগুলি মূলত টিনের তৈরি। তবে বাইরের মানুষ তহশীলদার মণিমোহন সরকারী খাজনা আদায় করতে গিয়ে নৌকাতেই বসবাস করেছে।

উপন্যাসটির বর্ণনা রীতিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চর ইস্মাইলের বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গতিময় ভাষা ব্যবহার করলেও চরিত্রদের মুখে স্থানীয় ভাষারীতির সংলাপ ব্যবহার করেন নি। হিন্দু, মুসলিম, বর্মী, পর্তুগীজ — সবাই মান্য চলিত গদ্যে কথা বলেছে। মা-ফুন নিজের ভাষা সম্পর্কে মণিমোহনকে বলেছে — ''এমন চমৎকার বাংলা বলতে শিখলুম কোথা থেকে তা তো জিজ্ঞাসা করলে না।''[২৫২] তাই বলা যায় যে, এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রদের ভাষা-সংলাপের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো আঞ্চলিক রূপ সৃষ্টি করেন নি। তবে

মান্যচলিত ভাষাতে হলেও তাদের কথাবার্তার মধ্যে সবসময় বাংলার মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ঐ অঞ্চলটির আলাদা একটা ছাপ পড়েছে।

এভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যসটিতে আঞ্চলিকতার অনেক লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির মূল্যায়নে বলেছেন — ''উপনিবেশ' উহার বিচ্ছিন্ন খন্ডাংশে মহনীয়, ইহার ব্যঞ্জনাশক্তিতে রমণীয়, লেখকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতে প্রত্যাশা-চমকিত, কিন্তু ইহার দ্বৈপায়নতা আর কোন অখন্ড মহাদেশের সহিত আপনাকে সংযুক্ত করিতে পারে নাই।''[২৫৩] এই 'অখন্ড মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত' না হওয়া অবশ্যই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার দিকনির্দেশ করে। এই উপন্যাসটির দিকে লক্ষ রেখেই সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায় এবং 'গঙ্গা'র স্রষ্টা সমরেশ বসুর সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে লিখেছেন — ''শিল্পী-স্বভাবের বিশেষত্বে তারাশঙ্কর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু তিনজনের মধ্যেই গভীর মিল দেখতে পাওয়া যায়।''[২৫৪] তবে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটির মধ্যে মহাকাব্যোপম উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি লক্ষ করেছেন — ''উপনিবেশে'র চর ইসমাইলের কাহিনীতে যে বিষয়ীর সম্ভাবনা তা মহাকাব্যোপম উপন্যাসের প্রতিশ্রুতিতে যুক্ত।''[২৫৫] আর শুদ্ধস্বত্ত্ব বসু 'উপনিবেশ'-এ আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ দেখতে পেলেও উপন্যাসটিতে সমগ্র বাঙালি জীবন চরিত্রের সগোত্র অনেক কিছুর সন্ধান পেয়ে একে বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে মানতে চান নি — ''যদি স্থান বিশেষের কিছু কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, কিছু কিছু সামাজিক রীতিনীতির কথা থাকে, আর বাকি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে — যা সমগ্র বাঙালি জীবন চরিত্রেরই সগোত্র — তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা ঠিক হবে না, যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'। এখানে বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী তাদের নিজস্ব জীবনবোধ নিয়ে উপন্যাসের ঘটনায় অংশ নিয়েছে, নিজেদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে — তাই এটি বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাস হয় নি।''[২৫৬]

আমাদেরও বক্তব্য হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' সম্পূর্ণভাবে সার্থক একটি আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। তবে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে, বিশেষত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭ খ্রিঃ)-র পূর্বে লেখা এই উপন্যাসটির বহু ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির পটভূমি গ্রহণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তবে শুধু পটভূমি হিসেবে বাংলা মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল বা এলাকাকে তিনি গ্রহণ করেন নি, সেই সঙ্গে তিনি ঐ অঞ্চলটির সামগ্রিক জীবনচিত্রও তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং সেই কাজে অনেকটাই সফল হয়েছেন। এই উপন্যাসটি রচিত না করলে চর ইস্‌মাইলের সেই বিচিত্র জীবনের কথা বাঙালি পাঠকের কাছে অজানাই থেকে যেত। তাই 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি পাঠের পর চর ইস্‌মাইলের প্রকৃতি, মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতির মত সমস্ত কিছুই পাঠককে এক আলাদা জগতের স্বাদ এনে দেয়। বলা বাহুল্য, এই আলাদা জগৎ হল আঞ্চলিকতারই জগৎ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'** উপন্যাসটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি যে বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস — এ সম্পর্কে খুব একটা দ্বিমত নেই। উপন্যাসটির আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (আষাঢ়, ১৩৫৪) — তারাশঙ্করের উপন্যাসাবলীর মধ্যে কেবল যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে তাহাই নয়, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।''[২৫৭] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে বলেছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্করের অন্যতর প্রধান সৃষ্টি।''[২৫৮] উপন্যাসটির এই শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে অনেকগুলি কারণ আছে, যেগুলির মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এর আঞ্চলিকতা। 'সংসদ বাংলা সাহিতসঙ্গী' গ্রন্থে এই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন — ''বীরভূমের কাহার সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, লোককথা এই উপন্যাসের মূলাধার। একদিকে এই সম্প্রদায়ের আত্মবিরোধ, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি যেমন কাহিনীর একটি

প্রধান ধারা, আর একটি ধারা হল প্রাচীন সমাজের সঙ্গে নতুন পরিবর্তমান জগতের সংঘাত। স্থানিক বর্ণে এই উপন্যাস উজ্জ্বল, উজ্জ্বল বিচিত্র চরিত্রগুলি। সেই সঙ্গে আছে এক আদিম মানবিক সংরাগ, আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের প্রবৃত্তি, মানুষ ও প্রকৃতির এক নির্মম সম্পর্কের রূপায়ণ। এই উপন্যাসের কাহিনীতে আছে যথার্থই এক বিস্তার।''[২৫৯] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে লিখেছেন — ''একটা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন ও মর্মরহস্য, সমগ্র সমাজবিন্যাসের মূলতত্ত্ব ও অন্তরপ্রেরণা এই যুগান্তকারী উপন্যাসে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয় নাই, ব্যক্তি এখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেও গৌণ; সমাজের পারিপার্শ্বিক চাপ প্রত্যেকের উপরেই গভীর রেখায় মুদ্রিত। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণীয় সমাজ — যে সমাজ বহু শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষায় কর্মে ও চিন্তায়, জীবনাদর্শের সর্বস্বীকৃত ও প্রাণমূল জড়িত প্রভাবে, এক জীবন্ত, অত্যাজ্য সংস্কৃতির আধাররূপে বিকশিত হইয়াছে।''[২৬০]

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের তো বটেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করার পেছনে এর আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপন্যাসটির আলোচনাকালে সমস্ত সমালোচকের বক্তব্যে এর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে এসেছে। এরমধ্যে অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থে উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে — ''তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বীরভূমের একটি অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রকৃতি উপন্যাস-বর্ণিত নিম্নশ্রেণীর কাহারদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ব্যক্তি-বিশেষের নয়, হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের এক সমাজের সংস্কৃতির কথাই এখানে মুখ্য। এখানকার সকল অধিবাসীই এক অদৃশ্য দৈবশক্তির হাতের পুতুলমাত্র। বনোয়ারি করালী সুচাঁদ পাখি নসুবালা কালাবৌ পরম প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে আকাশচারী কালারুদ্র ও কর্তাবাবা যদৃচ্ছ খেলা করেছেন, আর ঐ বিশিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতির প্রতীক চরিত্র হয়ে উঠেছে তারা। প্রেক্ষাপট ও জনগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ যোগে উপন্যাসটি সার্থক।''[২৬১] অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন — ''উপন্যাসটি আমাদের বহুকালের চেনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লেখাটি প্রথম প্রকাশ

পেয়েছিল ১৯৪৬-এর শারদ সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। পরের বছরেই হয় দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৯৫১ সালে প্রকাশ পায় তৃতীয় সংস্করণ। প্রতিটি সংস্করণেই লেখক যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছিলেন উপন্যাসটির। এই উপন্যাস তারাশঙ্করের শিল্পীজীবনের এক তাৎপর্যময় সৃষ্টি। লেখাটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল। তারাশঙ্করের জীবৎকালেই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র নয়টি সংস্করণ হয়। প্রতিটি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন লেখক, এমনকি নবম সংস্করণেও।''[২৬২] উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার বিষয়টি অধ্যাপিকা চক্রবর্তীর এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়। এর জনপ্রিয়তার পেছনে অবশ্যই এর অচেনা পটভূমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ঔপন্যাসিক এখানে পটভূমি হিসেবে একটি অচেনা জগৎকে গ্রহণ করেছেন বলে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন — ''তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) অনেকটাই আমাদের অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত।''[২৬৩] যাই হোক, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করার পূর্বে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

তারাশঙ্কর এই উপন্যাসটি বীরভূমের আর এক কৃতি সন্তান কবিশেখর কালিদাস রায়কে উৎসর্গ করেন। এ বিষয়ে তিনি এর উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়, সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা — সবই আপনার সুপরিচিত। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না।''[২৬৪] ঔপন্যাসিকের এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয় যে, এই উপন্যাসের পটভূমিটি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসটিতে গৃহীত এই প্রকৃতি এবং মানুষের কথা বীরভূমের আঞ্চলিক প্রকৃতির সঙ্গে সুপরিচিত কবি কালিদাস রায়দের মতো মানুষদের কাছে নিতান্ত অপরিচিত নয়। তবে বাংলার বৃহত্তর শিক্ষিত জনমণ্ডলীর কাছে এই প্রকৃতি, সমাজ ও সেখানকার মানুষদের জীবনচর্যা অজ্ঞাত। অবশ্য 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি প্রকাশের পরে পরেই শিক্ষিত সমাজ উপন্যাসটিকে লুফে নেয় এবং এরূপ এক মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞাত স্থানের বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং

মানুষজনের জীবনচর্যার বিস্তারিত পরিচয় পেতে ও তার স্বাদ গ্রহণ করতে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালের অভিজ্ঞতার শিল্পী' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন — পুরাতনকাল ও নতুনকালের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মভূমি রাঢ় অঞ্চলটির যে পরিবর্তন তিনি দেখেছিলেন, তাঁর বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসে তাকেই রূপদান করে গেছেন। একথা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি এই উপন্যাসটি সম্পর্কে নিজের স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মানুষদের পর্যন্ত আমার এইভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। ঐ সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। . . . পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায়, বলে — হেই মাগো! এখন এল্যা? বলি মনে পড়ল আসতে? ছেলেরা ভালো আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হ'ল ক্যানে?''[২৬৫] এই অভিজ্ঞতাজাত কোপাই তীরবর্তী হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটির প্রকৃতি এবং সেখানকার কাহার সম্প্রদায়ের মানুষজনের জীবনচর্যার বিবরণ দুই কালের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন। পুরাতন ও নতুন — এই দুই কালের দ্বন্দ্বে এই উপন্যাসে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রবীণের সকরুণ পরাজয় ঘটেছে এবং নতুনের সদম্ভ অগ্রগতি ঘটেছে — ঔপন্যাসিক এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিকতার রঙে রাঙিয়ে পরিবেশন করেছেন।

বীরভূমের কোপাই নদীর তীরবর্তী 'হাঁসুলী বাঁক'-এর মত আকৃতি গ্রহণ করা বাঁশবাদি গ্রামের পটভূমিকায় ঐ গ্রামে বসবাসকারী তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণী কাহার সম্প্রদায়ের মানুষগুলির জীবনযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, প্রেম-ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আনন্দ-উৎসব, লোককথা-লোকরুচি প্রভৃতির সামগ্রিক চিত্র ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে এঁকেছেন। নতুন কালের আবর্ত-সংঘাতে কীভাবে ঐতিহ্যাশ্রয়ী, আদিম বিশ্বাস পুষ্ট এই কাহার সমাজের অনিবার্য ধ্বংসময় পরিণতি ঘটে, সেটাও এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। আর তা দেখাতে গিয়েই এই উপন্যাসটিতে রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চল-প্রকৃতির ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি সেখানকার

আঞ্চলিক পরিবেশ, তথাকথিত অন্ত্যজ অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য, কোনো একটি চরিত্রের মুখে 'উপকথা'র বর্ণনার আকারে ঐ অধিবাসীদের আবহমান কালের ইতিহাসকে তুলে ধরা এবং দেশের বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ঐ জনগোষ্ঠীর সকরুণ পরিণামের মত বিষয়গুলি আঞ্চলিক জীবনের সামগ্রিক তাৎপর্য নিয়ে এই উপন্যাসটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা কোনো একটি অঞ্চলের প্রেক্ষিতে এইরকম একটি জনজাতির যুগ-যুগান্তরের সামগ্রিক জীবনচর্যার বর্ণনা ও অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরল ঘটনা। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর সেই বিরল ঘটনারই অবতারণা করেছেন।

উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, রাঢ়ভূমি বীরভূমের উপর দিয়ে বয়ে চলা কোপাই নদীর হাঁসুলী বাঁকের মতো আকৃতির একটি উপত্যকায় গড়ে ওঠা বাঁশবাঁদি গ্রামের সঙ্কীর্ণ পরিবেশে নানাবিধ লৌকিক সংস্কার, দৈব বিশ্বাস, উচ্চজাতির মানুষজনের প্রতি আনুগত্য, মদ্যাসক্তি, চৌর্যবৃত্তি, অবৈধ যৌনলালসার মতো বিষয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষিতে অন্ত্যজ কাহার সম্প্রদায়ের মন্থরগতির জীবনপ্রবাহ এগিয়ে চলে। এই গতানুগতিক জীবন প্রবাহে প্রথম বিপর্যয় ডেকে আনে কাহার যুবক করালী। সে প্রথম তাদের পিতৃ-পিতামহের পেশা ত্যাগ করে চন্দনপুরে রেলের গ্যাংম্যানের কাজ নেয়। করালী কাহার সম্প্রদায়ের সন্তান হলেও অতিমাত্রায় খামখেয়ালি প্রকৃতির যুবক। কাহারদের অতীত ইতিহাস, পিতৃপুরুষের আচার-আচরণ, দৈব-বিশ্বাসের মতো কাহার সংস্কৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত কোনো কিছুর প্রতিই তার আস্থা নেই। সে বুদ্ধি আর গায়ের জোরে সব কিছুর সমাধান করতে চায়। সে হল নতুন কালের প্রতিনিধি। এইরকম মানসিকতা ও নানাবিধ আচার-আচরণের কারণে করালীর সঙ্গে কাহার সম্প্রদায়ের মোড়ল বনওয়ারীর সংঘর্ষ বাধে। তবে নিজের কোনো পুত্রসন্তান না থাকার কারণে অথবা করালীর শৌর্যত্বের কারণে বনওয়ারী তাকে অন্যান্য কাহার যুবকদের চেয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে, করালীর প্রতি তার একধরনের প্রচ্ছন্ন মমতাও জন্মায়। এজন্য করালীকে 'কোলগত' করে নেওয়ার মনোগত ইচ্ছাও সে করে। এদিকে করালীও মনে মনে গোষ্ঠীপতি বনওয়ারীকে ভয় ও ভক্তি করে। কিন্তু তাদের বিরোধ এড়ানো যায়

না। করালীর নানা হঠকারী আচরণ কাহার সমাজের আচার-অনুষ্ঠান-অনুশাসনের প্রতিপালক বনওয়ারীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং এর ফলে উভয়ের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর ফলশ্রুতিতে করালী বাঁশবাঁদি গ্রাম ত্যাগ করে চন্দনপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। এই মহাযুদ্ধের ঢেউ সমগ্র ভারতবর্ষের পাশাপাশি কোপাই তীরবর্তী বাঁশবাঁদি গ্রামের কাহার জনগোষ্ঠীর উপরেও এসে লাগে। ফলে বন্যা, ঝড়, অভাব, দারিদ্র্যের মতো প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও যে কাহার সমাজ বাঁশবাঁদির ছায়াচ্ছন্ন আদিমতার মধ্যে এতকাল ধরে সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়ে আসছিল, বহিরাগত শক্তির আঘাতে এবার তাদের অস্তিত্বে টান ধরে — এদের অভাব ও দারিদ্র্য সীমাহীন হয়ে ওঠে। অনেকেই বাঁশবাঁদি ছেড়ে চন্দনপুরের কারখানায় মজুরি খাটতে চলে যায়। এদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে বাঁশবাঁদির বাঁশের ঝাড়, বট-অশ্বত্থ গাছ, কাহারদের রক্ষাকর্তা 'কর্তাঠাকুর'-এর থানের বেলগাছ, বাবাঠাকুরের থান — সমস্ত কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার স্বপ্ন রচনার স্থান আর থাকে না। বনওয়ারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী গোপাখি, নয়নের মা মারা যায়, করালীর বউ পাখি আত্মহত্যা করে, সুচাঁদ বুড়ি চন্দনপুরের রেল স্টেশনে অথবা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গল্প বলে বেড়াতে শুরু করে। অবশেষে একদিন কাহার সমাজের সমাজপতি শূর বীর বনওয়ারীরও মৃত্যু ঘটে। বনওয়ারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আলো-অন্ধকারের আদিম অরণ্যের মত বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা কাহার গোষ্ঠী এবং তাদের সভ্যতা নিজের ঐতিহ্য বিশ্বাস নিয়ে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।

উপন্যাসটি অবশ্য এখানেই শেষ হয় নি। কাহার সংস্কৃতির বিনষ্টিই এর মূলকথা নয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে বরাবরই পুরাতন পিছু হটেছে। এই উপন্যাসেও পুরাতনের প্রতীক বনওয়ারী পিছু হটেছে। কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে আকীর্ণ বনওয়ারীর কাহার-কুল এবং তাদের বাঁশবাঁদি গ্রাম যে একদিন ধ্বংস হবে, তারাশঙ্কর সেই অনিবার্যতার কথা জানতেন। কিন্তু বরাবরের মতো এই উপন্যাসেও তিনি পুরাতনের পতনের জন্য তাঁর দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন নি। এজন্য তিনি কাহারদের এই ধ্বংস, বিনষ্টি, বিলুপ্তির মধ্যেও নব সম্ভাবনার সঙ্কেত

দিয়েছেন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার সবকিছু শেষ হয়েও যেন শেষ হয় নি। তাই উপন্যাসের শেষদিকে দেখা যায় — ''সুচাঁদ গাছতলায় ব'সে ব'লে যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। . . . আঃ হাঁসুলী বাঁক শেষ — আমিও শেষ, কথাও শেষ! আঃ—আঃ! কিন্তু — । বলতে বলতে থেমে যায় সুচাঁদ। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে। ভাবে, শেষ কি হয়? কিছুর শেষ কি কখনও হয়েছে? চন্দ্র সূর্য্যি যত কাল, তার পরেও তো শেষ নাই; তার পরে আছেন যে মহাকাল। বাবা কালারুদ্দের চড়ক পাটায় ঘোরা। সে ঘোরার শেষ নাই। আলো নাই অন্ধকার নাই তবু পাটা ঘোরার শেষ নাই। সেই ঘোরাতেই তো কখনও প্রলয় কখনও সৃষ্টি! আঁধারে সৃষ্টি ডোবে, আবার আলোতে ওঠে। তবে শেষ কি ক'রে হবে? সে ভাবে।''[২৬৬] এইরকম অবস্থায় প্রায় বছর দুয়েক পর নসুবালা ছুটে এসে তার নূপুর জোড়াটা চায়। তখন সুচাঁদ কথা শেষ করে 'সব শেষ লো — সব শেষ!' বললে নসু হেসে ঢলে প'ড়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে — ''আমি কি দেখে এলাম শোন্। দেখে এলাম, বাঁশবাদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে। আর কচি কচি ঘাস। আর দেখে এলাম সে ডাকাবুকোকে।''[২৬৭] — করালী হাঁসুলী বাঁকে ফিরে আসে। নসু জানায় করালী একা লুকিয়ে গিয়ে সবল হাতে গাঁইতি চালিয়ে বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে। ঔপন্যাসিকের মন্তব্য — ''উপকথার কোপাইকে — ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।''[২৬৮]

এই উপন্যাসটির আলোচনাকালে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে — ১. একটি বিশিষ্ট পরিবেশ-ধৃত জনগোষ্ঠীর সামূহিক বিশ্বাস — বিশেষ সেই গোষ্ঠীর সৃষ্টি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বহুকালাগত স্মৃতি; ২. তাদের জীবিকার সার্বিক পরিচয়; ৩. তাদের অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে আর একটি যোগ করা যায় — যা প্রায় প্রধান আঞ্চলিক উপন্যাসেই দেখা যায় — বৃহত্তর দেশকালের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিকতা ভেঙে যাচ্ছে।''[২৬৯] শ্রদ্ধেয় সমালোচকের এই বক্তব্য তো অবশ্যই মানতে হয়, সেই সঙ্গে এটাও বলতে হয় যে, এই উপন্যাসে এগুলির বাইরে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এখানে পটভূমি হিসেবে তো মূল জনসমাজের বাইরের কোনো একটি

অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়েছেই, সেই সঙ্গে সেখানে বসবাসকারী কাহার সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। এই উপন্যাসে সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিত হাঁসুলি বাঁক অঞ্চলটিও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। এজন্য উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা নির্ণয়ের প্রসঙ্গে এগুলির আলোচনা করতেই হয়।

এই উপন্যাসের শুরু থেকে সুযোগ পেলেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসে গৃহীত হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটি যে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন, সেদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করে গেছেন। এজন্য তিনি মাঝে মাঝেই এই অঞ্চলটির আঞ্চলিক প্রকৃতির বিবরণ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। উপন্যাসের শুরুতেই অঞ্চলটির বিবরণে বলেছেন — ''কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক — অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে — তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী। এইজন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক।''[২৭০] এরপর সেখানে অবস্থিত বাঁশবাঁদি গ্রামটির পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য লিখেছেন — ''নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা 'বাঁশবাঁদি', লাটজঙ্গলের অন্তর্গত, বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারিপাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি; জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকদের সমাজ — কুমার সদ্‌গোপ, চাষি-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিত-কলুও আছে এক এক ঘর, এবং তন্তুবায় দুঘর। জাঙলের সীমানা বড়; হাঁসিল জমিই প্রায় তিনহাজার বিঘা, পতিতও অনেক — নীলকুঠির সায়েবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিনশ বিঘা।''[২৭১] সে অঞ্চলের প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি লিখেছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। . . . 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধূ ধূ করে বালি — . . . মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ, ঘাস যায় শুকিয়ে, গরম হয়ে ওঠে আগুনে পোড়া লোহার মত, কোদাল কি

টামনায় কাটে না; কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যায়; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে, কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে।''[২৭২] এই হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদি গ্রামে মাঝে মাঝে বন্যা হানা দেয় — ''সাঁওতাল পরগণার পাহাড়িয়া নদী কোপাইয়ে ওই দু-তিন বৎসর অন্তর যে আকস্মিক বন্যা আসে — যাকে বলে 'হড়পা বান', সেই বন্যার স্রোতে পড়ে ক্বচিৎ কখনও এক-একটা 'গুলবাঘা' ভেসে এসে হাঁসুলীর বাঁকের এই খাপছাড়া, বাঁশবাঁদি গাঁয়ের নদী কুলের বাঁশবনের বেড়ার মধ্যে আটকে যায়।''[২৭৩] এই হাঁসুলী বাঁকের পাশেই আছে একটা দহ, যাকে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা ভয় ও ভীতির চোখে দেখে -- ''হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির ঘাটের পাশে যে দহটা আছে সেখানে আসে সর্বনেশে মানুষ-গরু-খেকো বড়ো কুমীর — এখানকার লোকে বলে 'ঘড়িয়াল'।''[২৭৪] হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটিকে আধুনিক সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ রেল-ব্যবস্থা মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। রেললাইনের ওপারেই আছে চন্দনপুর গ্রাম — ''রেলের লাইনটা চলে গেছে গাঁয়ের পূবদিক দিয়ে। চন্দনপুর স্টেশন ছাড়িয়ে লাইনটা কোপাই নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চলে গিয়েছে। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির নীলের বাঁধ পুকুরের পাড় থেকে বেশ দেখা যায় ব্রিজটা।''[২৭৫] এই হাঁসুলী বাঁক যে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ঔপন্যাসিক সেটা প্রমাণেও উদ্যোগী হয়েছেন — ''পাথুরের মাটির ঢলন একটা — খানিকটা উঁচু — খানিকটা নীচু, আবার খানিকটা উঁচু — লাল কাঁকরে ভরা — ঢেউ খেলানোর ভঙ্গীতে একটা ঢলন যেন নেমে এসেছে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের দেশ থেকে। পশ্চিম থেকে পূবে চলে এসেছে একটা ব-দ্বীপের চেহারা নিয়ে। এ ঢলনের আশেপাশে বাংলা দেশের মাটি। সেখানেই দেশের চাষের মাঠ, সে সব মাঠে নানা ফসল ফলে। হাঁসুলীর বাঁকে — এই লাল মাটির একটা ফালি এসে শেষ হয়েছে হাঁসুলীর বাঁকের পশ্চিম উত্তর মাথায়।''[২৭৬] এভাবে উপন্যাসটিতে অজস্র স্থানে হাঁসুলী বাঁক ও তার তীরের বাঁশবাদী গ্রামকে স্বতন্ত্ররূপে দেখানো হয়েছে।

এই উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চলকে গ্রহণ করে সেখানকার ভৌগোলিক পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি সেই অঞ্চলের প্রকৃতি

ও মানুষগুলির উপর তার প্রভাবের কথাও আছে — ''হাঁসুলী বাঁকে পৃথিবীর সঙ্গেই যথা নিয়মে রাত্রি প্রভাত হয়। . . . গাছে গাছে পাখি ডাকে, ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশিরবিন্দু ছোট ছোট মুক্তার দানার মত টলমল করে। বাঁশবনের মাথা থেকে বনশিরিষ, নিম আম জাম কাঁঠাল শিরিষ বট পাকুড়ের মাথা থেকে টুপ টাপ ক'রে শিশিরবিন্দু ঝ'রে পড়ে মাটির বুকে। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটার কথা সেই ফুল ফোটে। পূর্ব দিকে নদীর ধার পর্যন্ত অবারিত মাঠের ওপারে — কোপাইয়ের ওপারের গ্রাম গোপগ্রামের চারিপাশে গাছপালার মাথায় সূর্য ওঠে। কিন্তু কাহারেরা জাগে সূর্য ওঠার অনেক আগে।''[২৭৭] ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলটির প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে — ''কার্তিক-অগ্রহায়ণে হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় পলেনেও মাঠের রঙ হয় সোনার বরণ। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস, পাকা ধানের গন্ধে ভুরভুর করে। গোবিন্দভোগ, বাদশাভোগ, কনকচুর, রামশাল, সিঁদুরমুখী, নয়নকলমা — কত রকমের ধান। . . . সোনার বরণ ধানভরা মাঠের বুকে বেড় দিয়ে কাচ-বরণ জল রূপার হাঁসুলী টলমল — কোপাই নদীর বাঁক। . . . খালে নালায় ঝিরঝিরে ধারা জল বয়, রূপার কুচির মত ছোট মাছ ঝাঁক বেঁধে নেমে চলে নদীর সন্ধানে। আউশের মাঠে আউশ ধান উঠে গিয়ে রবি ফসলের সবুজে ভ'রে ওঠে। গম, কলাই, আলু, যব, সরষে, মসন, তিষির অঙ্কুর-রোমাঞ্চ দেখা যায়। হিলহিলে বাঁশবনের মাথা উত্তরে বাতাসে দুলতে থাকে, ক্যাঁ ক্যাঁ — কট কট শব্দে, কখনও বা বাঁশীর মত সুর তুলে। আকাশে উড়ে নেচে বেড়ায় নতুন পাখির দল। . . . দুপুরে রোদ চনচন করে, রাত্রিবেলা গা সিরসির করে।''[২৭৮] এই হাঁসুলী বাঁকের প্রকৃতির সঙ্গে সেখানকার বাঁশবাঁদি গ্রামের কাহার সম্প্রদায়ের মানুষগুলির প্রকৃতির যে অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল সেকথা জানাতেও ঔপন্যাসিক ভোলেন নি। এই জন্য কাহার মেয়েদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট-পাটকেল পাথর, দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে তেমনি ভাবেই সেদিন ওই

ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী। ক্ষমা নাই-ঘেন্না নাই। দিগম্বরীর মত হাঁক ছেড়ে ডাক পেড়ে, শতমুখে কলকল খলখল শব্দ তুলে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে। . . . কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ ক'রে গাঁয়ের ধারে বসে থাকে, তারপর এক-পা, দু-পা ক'রে এগিয়ে এসে বাড়ির কানাচে কানাচে গুনগুন ক'রে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না — তেমনই ভাবে কোপাইও দুদিন বড়জোর চারদিন পরে আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে কুলকুল শব্দ করে ব'য়ে যায়। . . . কোপাই নদীর পাগলামির ছোঁয়াচ কাহার-মেয়েদের জীবনে ঘোচে না।''[২৭৯] ঔপন্যাসিক আরও লিখেছেন — ''বউয়ের রোজকার, বিটির রোজকার কাহার পাড়ায় 'শাক-ঢাকা মাছ'। . . . কোপাই নদীর পাগলামির ছোঁয়াচ কাহার-মেয়েদের জীবনে ঘোচে না।''[২৮০] তিনি কাহার পাড়ার নারী কালো শশীর চোখের গভীরতাকে বাঁশবাঁদির দহের গভীরতার সঙ্গে তুলনা করেছেন — ''কালো বউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। তলাতে কিছু যেন খেলা করছে, উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু ঠিক কিছু বুঝতে পারা যায় না।''[২৮১] এই অঞ্চলটির প্রকৃতি যে, এই কাহার সম্প্রদায়ের মানুষগুলির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছিল এসব উদ্ধৃতি সেটাই প্রমাণ করে।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসেবে মূলত বাঁশবাদির অন্ত্যজ শ্রেণির কাহার সম্প্রদায়ের মানুষদেরই চিত্রিত করেছেন। ঘোষমশায়, চৌধুরীদের মতো দু'চারটি উচ্চবর্ণের মানুষের কথা এই উপন্যাসে এলেও তাদের জীবন কাহিনি পরিবেশন করা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল না; তিনি তা করেনও নি। এরা সবাই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির বাইরের মানুষ। বনওয়ারী, করালী, নসুবালা, সুঁচাদ, বসন, গোপাখিবালা, কালোশশী, সুবাসী, পাখি, নয়ন, নয়নের মা, পরম, পাগল, রতন, প্রহ্লাদ, পানু প্রমুখেরা সবাই কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। ঔপন্যাসিক এখানে তাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও চেহারার বর্ণনাও দিয়েছেন। কাহার পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''বনওয়ারী কোশ-কেঁধেদের বংশের ছেলে, পাকা বাঁশের মত শক্ত মোটা হাড়ের কাঠামো তার। কাহারপাড়ায় — শুধু কাহারপাড়ায় কেন, কাহারপাড়া, আটপৌরেপাড়া, জাঙল তিন জায়গায় তার মত জোরালো মুনিষ নাই; বনওয়ারী শক্ত

মুঠোয় লাঙল ক'ষে টিপে ধরলে টানতে মাঝারি বলদের পিঠ ধনুকের মত বেঁকে যায়, ঘাড় লম্বা হয়ে যায়।''[২৮২] কাহারপাড়ার সবচেয়ে উদ্যমী, সবল ও সতেজ চরিত্র করালী — ''লম্বা দীর্ঘ চেহারা, সাধারণ হাতের চার হাত খাড়াই তাতে কোন সন্দেহ নাই, সরু কোমর, চওড়া বুক, গোলালো পেশীবহুল হাত, সোজা পা দুখানি, লম্বা আমের মত মুখ, বড় বড় চোখ, নাকটি খাঁদা, কিন্তু তাতেই চেহারাখানিকে করেছে সবচেয়ে মিষ্টি, তারও চেয়ে মিষ্টি তার ঠোঁট আর দাঁত। হাসলে সুন্দর দেখায় করালীকে।''[২৮৩] এই করালীর পিসতুতো ভাই নসুবালা। এই চরিত্রটি তারাশঙ্কর নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে কাহার নসুবালার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''নসুবালা করালীর পিসতুতো ভাই। আসল নাম নসুরাম। অদ্ভুত চরিত্র নসুরামের। ভাবে ভঙ্গীতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত। মাথায় মেয়েদের মত চুল, তাতে সে খোঁপা বাঁধে, নাকে নাকছাবি পরে, কানে মাকড়ি পরে, হাতে পরে কাঁচের চুড়ি লাল রুলি, মেয়েদের মত শাড়ী পরে। মেয়েদের সঙ্গে গোবর কুড়ায়, কাঠ ভাঙে, ঘর নিকায়, চন্দনপুরে দুধের যোগান দিতে যায়, মজুরনী খাটতে যায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্টি — গান গায়, নাচে। গান আর নাচ — এই তার সবচেয়ে বড় নেশা। ঘেঁটুর দলে নাচে, ভাঁজোর নাচনে সেই মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে সেরা নাচিয়ে। মেয়েদের সঙ্গেই সে ব্রত পার্বণ করে।''[২৮৪] এদের তিনজনের ছাড়াও কাহারপাড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত পাগল সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য — ''হাঁসুলী বাঁকের পাঁচালীকার পাগল কাহার মজার মানুষ। মনখানি তার নীলের বাঁধের জলের মত। আকাশের রঙেই তার রঙ। . . . কাহার পাড়া তার কাছে আকাশ। কাহার পাড়া হাসলে সে হাসে, কাঁদলে সে কাঁদে।''[২৮৫] কাহারেরা রেগে গেলে তাদের চোখ যে বন্য শ্বাপদের মত জ্বলে তার প্রমাণ পরম কাহার। যখন কালোশশীকে কেন্দ্র করে বনওয়ারী ও পরমের লড়াই বেঁধেছিল, তখনকার পরমের প্রকৃতি সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে পরম। চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মত। অন্ধকারে পরমের হাঁসা চোখ বুনো বিড়ালের মত জ্বলে।''[২৮৬] কাহারপাড়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্র হল সুচাঁদ। ঔপন্যাসিক তার মুখ থেকেই কাহারদের পিতৃপুরুষের কাহিনি পরিবেশন করেছেন। কাহার পুরুষদের

পাশাপাশি মহিলারাও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যে আকণ্ঠ মদ খেত, তা এই সুচাঁদের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন — ''মেয়েরাও মদ খেয়েছে। তাদেরও বসেছে স্বতন্ত্র আসর। আসরের মূল গায়েন সুচাঁদ; সে খুব খুশী। কত্তার পূজো হয়ে গিয়েছে, পূজোর মত পূজো, বলিদান, ঢাক, মদ, কোনো খুঁত নেই। . . . সুচাঁদ নাচছে কখনও, কখনও বলছে সেকালের রোমাঞ্চকর গল্প।''[২৮৭] এভাবে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক চরিত্রদের (কাহারদের) সঙ্গে হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটির অঙ্গাঙ্গী যোগকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

এই উপন্যাসের নায়ক সংক্রান্ত আলোচনায় পণ্ডিতদের মধ্যে আজও বিতর্ক শেষ হয় নি। কেউ মনে করেন বনওয়ারী এই উপন্যাসের নায়ক, আবার কেউ মনে করেন করালী এই উপন্যাসের নায়ক। কিন্তু এদের দু'জনের মাঝে থেকে কখন যে, হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা অনেকেই লক্ষ করেন নি। বনওয়ারী, করালী থেকে শুরু করে এই উপন্যাসের সমস্ত কিছুর গড়ে ওঠার পেছনে এই অঞ্চলটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র আলোচনায় বনওয়ারীর প্রশংসা করে বলেছেন — ''সমাজপতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহার মধ্যে রূপায়িত — সমগ্র কাহার-সমাজের কল্যাণকামনা তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ অতিক্রম করিয়া তাহার একাগ্র সাধনার বিষয়। তাহার চরিত্র-পরিকল্পনায় সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা এরূপ নিবিড় একাত্মতায় মিশিয়া গিয়াছে, যাহা উপন্যাস-সাহিত্যে দুর্লভ। কাহার-বংশের সমস্ত সংস্কার-বিশ্বাস, সমস্ত ঐতিহ্যগত মানসরূপ বনোয়ারিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে যতটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-অনুশীলনের ফল, কতটাই বা সমষ্টিগত সমাজ-প্রেরণার পরিণতি তাহার ভেদরেখানির্ণয় অসম্ভব। বনোয়ারিই কাহার-সমাজ, এবং কাহার-সমাজে ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা বাদ দিলে যে সর্বসাধারণ সারাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাই বনোয়ারি।''[২৮৮] কিন্তু তিনি সরাসরি তাকে এই উপন্যাসের নায়ক বলেন নি। বরং নায়ক সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন — ''এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে, হাঁসুলি বাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডল ও এই উভয়ের বেষ্টন-রেখায় সংহত একটি মানব-সমাজ। বাস্তবিক সমস্ত সমাজ-মনের এরূপ

ভাবঘন, অন্তঃসংগতিশীল, নিবিড় নিশ্ছিদ্র চিত্র যে কোন দেশের কথাসাহিত্যে বিরল। প্রতিটি ব্যক্তিচরিত্রের ভিতর দিয়া এই সমগ্র সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন আংশিক বা পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত। তাহাদের হিংসা-দ্বেষ, কলহ-বিরোধ, লোভ-অসংযম, স্বার্থসংঘাত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবই এক সমীকরণকারী জীবনবোধের অন্তর্ভুক্ত।''[২৮৯] এটা ঠিক যে, বনওয়ারী বা করালী নয়; হাঁসুলী বাঁকের আঞ্চলিক প্রকৃতিই এই উপন্যাসের নায়ক। বনওয়ারী, করালীর মত সবাই এই অঞ্চলটিকে ভিত্তি করেই বিকাশ লাভ করেছে — অঞ্চলটি ছাড়া তাদের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। উপন্যাসটি থেকে অঞ্চলটিকে সরিয়ে নিলে এটি উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেক গুণই হারায়। ফলে সবকিছু মিলিয়ে হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটিই এই উপন্যাসের নায়ক।

এই উপন্যাসে হাঁসুলী বাঁকের ভৌগোলিক পরিচয়, আঞ্চলিক প্রকৃতি ও সেখানকার কাহার সম্প্রদায়ের মানুষগুলির পরিচয়ের পাশাপাশি তাঁদের জীবন-জীবিকার বিস্তারিত পরিচয় আছে। এই অঞ্চলের কাহারদের আবির্ভাব প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায় — এক নতুন জমাপত্তন — নীলকর শ্রীযুক্ত জেনকিন্স সাহেবের নাম। সেই জমার মধ্যে জাঙলের যাবতীয় পতিত ভূমি, তার সঙ্গে গোটা বাঁশবাঁদি মৌজাটাই প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে . . . বাঁশবাঁদি মৌজা বন্দোবস্ত নিয়ে সাহেবেরাই ওখানে ওই পুকুর কাটায় এবং বাঁশবাঁদির সমস্ত পতিতকে নীলচাষের জন্য হাঁসিল ক'রে তোলে। সেই হাঁসিল করবার জন্যই এই কাহার পাড়ার লোকেরা বাঁশবাঁদিতে আসে।''[২৯০] প্রথমদিকে কাহাররা নীলচাষ সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও নীলচাষের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবিকাও বদলায়। পরবর্তী সময়ে এরা গৃহস্থ বাড়িতে জন-মুনিষ খাটার কাজে এবং পাল্‌কি বওয়ার কাজে যোগ দেয়। তবে কাজের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাজনও আছে — ''বাঁশবাঁদি পুরোপুরি কাহারদের গ্রাম — গ্রাম ঠিক নয়, ওই জাঙ্গল গ্রামেরই একটা পাড়া। তবে জমিদারী সেরেস্তায় মৌজা হিসেবে ভিন্ন ব'লে — ভিন্ন গ্রাম ব'লেই ধরা হয়। দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহার-পাড়া। বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে কাহার। বেহারা-কাহার পাড়াতেই চিরকাল লোকজন বেশি, প্রায় পঁচিশ ঘর বসতি। . . . কোশবেঁধে-বাড়ির বনওয়ারী বেহারা-পাড়ার মুরুব্বি। বেহারা কাহাররা পাল্কী বয়। . . .

বেহারা-পাড়া থেকে রশিখানেক পশ্চিমে আট-পৌরে কাহারদের বসতি। আটপৌরেরা পাল্কি কাঁধে করে না, ওরা বেহারাদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে জাহির করে।''[২৯১] তবে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাহারদের জীবিকাতেও পরিবর্তন থাবা বসায়। তাই কাহার যুবক করালীকে রেল কোম্পানীতে কাজ নিতে দেখা যায়। করালীই প্রথম কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ যে নিজেদের 'পিত্তিপুরুষের' পেশাকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র কাজ নেয়। পরে করালীর দেখাদেখি অনেক কাহারই সেই জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়।

কাহারদের জীবন পরিক্রমায় অনিবার্যভাবে প্রেম-ভালোবাসার প্রসঙ্গ আসে। এদের প্রেম-ভালোবাসা তথাকথিত সভ্যসমাজের ভালোবাসা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির — ''এ দেশের এরা, মানে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালোবাসাকে বলে 'রঙ'। — রঙ নয় — বলে 'অঙ'। . . . মেয়ে-পুরুষের ভালোবাসা হলে ওরা বলে — অঙ লাগয়েছে দুজনাতে। . . . ভালোবাসলে সে ভালোবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়া পড়শীর ঘৃণা বল, কোন কিছুর জন্যই — ঢাকতে জানে না কাহারেরা।''[২৯২] এই প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে অনিবার্য ভাবে কামনার আদিমতা ছায়া ফেলে — ''বাঁশবাঁদির বাঁশবনে আজও জমে আছে আদিম কালের অন্ধকার। সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়াকে আচ্ছন্ন করে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক চলে, ওদের চোখেও তখন জেগে ওঠে সেই আদিম যুগের অর্থাৎ অগ্নি আবিষ্কারের পূর্বযুগের মানুষের চোখের অন্ধকার-ভেদী আরণ্য-জন্তুর দৃষ্টিশক্তি।''[২৯৩] এই আদিমতা বনওয়ারী-কালোশশীর সম্পর্কে যেমন দেখা যায়, তেমনি করালি-পাখির সম্পর্কের মধ্যেও দেখা যায়। কাহার পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী একসময় নয়নের মা-র সঙ্গেও এই আদিম কামনা পঙ্কিল প্রেমে লিপ্ত হয়েছিল এবং এ থেকেই নয়নের জন্ম বলে কাহার পাড়ায় একটা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। কাহারদের জীবন পরিক্রমায় একটা অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে — এদের পুরুষেরা স্ত্রী বর্তমান থাকতে বিয়ে করলে স্ত্রীরাও স্বামীর অপেক্ষায় আর থাকে না, তারা গাল দিতে দিতে অন্যপুরুষের ঘরে ওঠে — সতীনের সঙ্গে তারা ঘর করে না — ''কাহার পাড়ার স্বামী যদি স্ত্রী থাকতে বিয়ে করে, তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা নোয়া খুলে ছুঁড়ে

ফেলে দিয়ে স্বামীকে গাল দিতে দিতে চ'লে যায় — অন্য কোন কাহার-মরদের ঘরে গিয়ে ওঠে। সতীনের সঙ্গে ঘর কাহার মেয়েরা করে না। . . . কাহার পাড়ার মেয়েরা ফেলনা নয়, স্বামীকে তাদের ভাত দিতে হয় না, নিজেরাই তারা খেটে খায়, রূপ-যৌবন ছাড়া 'গতরের' অর্থাৎ পরিশ্রমের ক্ষমতার একটা কদর আছে।''[২৯৪] মানুষের জীবন পরিক্রমায় এইরকম রীতি-নীতির প্রচলন কেবল আঞ্চলিক জীবনপটেই সম্ভব; তথাকথিত সভ্যসমাজ এসব অনুমোদন করে না।

এই উপন্যাসের কাহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা হিন্দুধর্মেরই উপাসক। তবে তাদের ধর্মাচরণের রীতি-নীতি বা নিয়ম-কানুন মূলস্রোতের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না। এদের ধর্মসংক্রান্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''নবান্নে এবার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদিতে খুব ধুম গিয়েছে। নবান্নে তাদের ধুম চিরকালের। সদ্‌জাতের অনেক ধুমধাম, এক পুজোর পর আর এক পুজো, তাতে কাহারেরা আনন্দ করে, পূজাস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তাদের নিজের ঘরে সে ধূমের দেবতার চরণের ছাপ পড়ে না। ওদের ধুম গাজন, ধরম পূজো, আমূতি অর্থাৎ অম্বুবাচী, মা বিষহরির পূজো, ভাদ্র মাসে ভাঁজো পরব, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী। মোটমাট সাতটা পরব। এ ছাড়া ষষ্ঠী আছে, মঙ্গলচন্ডী আছে, — সে শুধু মেয়েদের বেরতো, তাও তাদের করতে হয় ওই সদ্‌জাতের মা-লক্ষ্মীদের বেরতো-স্থানের 'পাটা আঙনে' অর্থাৎ পাট-অঙ্গনের এক প্রান্তে ব'সে। নবান্নই ওদের বড় পরব। নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পূজা করে, কালারুদ্দু বাবাঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের পাঁচ 'দব্য প্রস্তুত' ক'রে আনন্দ ক'রে খাওয়ায়।''[২৯৫] তবে এই অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবনে সর্বাধিক প্রভাব ফেলে কত্তাবাবা 'কালারুদ্দুর'। ভয়ে-ভক্তিতে কাহার পাড়ার সকলে এই দেবতাকে মানে। তাই করালীর দ্বারা একটি বিশালাকায় চন্দ্রবোড়া সাপ পুড়ে মরলে সকলে সেটিকে বাবা কালারুদ্দুরের বাহন বলে মনে করে এবং আতঙ্কিত হয়। এরপর কাহার পাড়ায় যত বাধা বিঘ্ন নেমে এসেছে, তার পেছনে এই ঘটনাটির যোগ আছে বলে সকলে মনে করেছে। এর কোপ থেকে বাঁচতেই খুব ধুমধাম করে কত্তাবাবা কালারুদ্দুরের অকালে পূজার আয়োজন করা হয় — ''বাবাঠাকুর-তলায় ভোরবেলার 'ঝুঁজকি' ডাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকী

ভোরের বাজনা তুমুল বাজাতে শুরু করলে। রবিবার অমাবস্যা — ক্ষণ মিলেছে ভাল, বাবাঠাকুরের পূজো হবে। ফুলে বেলপাতায়, তেলে সিঁদুরে, ধূপে প্রদীপে, আতপে চিনিতে দুধে রম্ভায়, মদে মাংসে, কাপড়ে দক্ষিণায় — সমারোহ ক'রে পুজো।''[২৯৬] এই পূজায় কাহারপাড়ার সবাই খুব ধুমধাম করে। কেউ পাঁঠা, কেউ ভেড়া, আবার কেউ কেউ হাঁস মানত হিসেবে বলি দেয়। মদ-মাংস সহযোগে খুব ধুমধাম করেই কত্তাবাবা কালারুদ্দুরের এই অকাল পূজা হয়। এই কত্তাবাবা আসলে দেবাদিদেব মহাদেবেরই আঞ্চলিকরূপ, যার উপাসনা পদ্ধতি কাহারেরা নিজেদের মত করে নিয়েছে। কত্তাবাবা কালারুদ্দুরের বাৎসরিক পূজা হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কের গাজনের সময়। এইসময়েও খুব ধুমধাম হয় — ''বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক-চিল-বক পক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো ফুল্কো ডাঁটির মাথায় চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে। কাঁশী বাজে, শিঙা বাজে, ধূপের ধোঁয়ায় মৌ-মৌ করে বাবা কালারুদ্দুর থান, 'পাটাগানে' অর্থাৎ পাট-অঙ্গনে ভক্তরা নাচে — হাতে বেতের দণ্ড, গলায় 'উতুরী' অর্থাৎ উত্তরীয়, পরণে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির 'তিপুন্ডক', রুখু চুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই-ধেই ক'রে নাচে। . . . চৈত্র-সংক্রান্তি শেষ হয়ে গেল। বছরের শেষ রাতটি 'পেভাত' অর্থাৎ প্রভাত হ'ল, গোটা রাতটি নাচলে কালারুদ্দের ভক্তরা। শিবো হে, কালারুদ্দুর হে, বম্ বম্ বম্ — বম্-ববম্ বম্-ববম্ বম্। চড়কের পাটা পাক দিয়ে 'চক্কর' অর্থাৎ চক্রের মত ঘুরল বন-বন ক'রে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে-বনে আদ্যিকালের অন্ধকার 'চ'কে চ'কে অর্থাৎ চমকে চমকে উঠল।''[২৯৭]

এই উপন্যাসে কাহারদের এরূপ ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, লোককথা, লোকাচারের বিবরণও আছে। ভূত-প্রেত সম্পর্কিত সংস্কার কাহারদের রক্তের মধ্যে থাকে — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় দিন গেলে যে রাত্রি নেমে আসে, তার সঙ্গে জাঙ্গল-চন্দনপুরের রাত্রির অনেক তফাৎ। বাঁশবন জোগান দেয় তার তলায় লুকিয়ে-থাকা আদ্যিকালের অন্ধকার রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে। তার মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, হরেক রকম পোকা ডাকে, তক্ষক ডাকে টক্-টক্ টক্-টক্ শব্দ করে, প্যাঁচা ডাকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে, আবার গভীর রাত্রে

ডাকে হুম হুম পাখি। বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা-বাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা। নদীর ধারে 'দপদপিয়ে' অর্থাৎ দপদপ ক'রে জ্বলে বেড়ায় 'পেত্যা' অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁখচুন্নির চিলের মত ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া-শিমুলের মাথা থেকে। বাঁশবনে ক্যাঁ-ক্যাক ক্যাঁ-ক্যাক ডাক ওঠে, কাহারেরা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায় — গেছো পেত্নী কি কোন ছোকরা ভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে — সেটা উঠে যাচ্ছে সোজা উপরে।''[২৯৮] কালোশশীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর কাহারদের জীবনে তার প্রেতযোনি সংক্রান্ত সংস্কারের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কালো বউয়ের প্রেতযোনি তো অলীক নয়। পিতিপুরুষের কথার মধ্যে আছে ওরা আছে, তারা চোখে দেখছে। ঘরের কোণে, বাঁশবনের তলায়, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে, জলার পাশে — কেউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কাঁদে, কেউ গান করে, কেউ ঘরের চালে ব'সে পা ঝুলিয়ে দেয়, কেউ মাঠে আগুন লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়, কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়। এ ছাড়া আছে 'ভুলো', সে দিক ভুলিয়ে নিয়ে যায় বিপথে — অপমৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে। . . . হাঁসুলী বাঁকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহু বিস্তৃত — আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, প্রেতলোক থেকে নরলোক পর্যন্ত।''[২৯৯] কাহারদের জীবন পরিক্রমায় অপদেবতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় মানুষের দৃষ্টিতে কত অপদেবতা দেখা দেয়, বর্ষার আকাশে 'হাতী নামা' ধরা পড়ে, কোপাইয়ের বন্যায় বড় মশাল জ্বালিয়ে যক্ষের নৌকা আসা দেখতে পায়।''[৩০০] সুতরাং দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক উপন্যাসের রীতি মেনে এই উপন্যাসে আঞ্চলিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, লোককথা, লোকরুচির মত সমস্ত প্রসঙ্গই এসেছে।

এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির সামগ্রিক জীবনের পরিচয় প্রদানের জন্য সেখানকার কাহার সম্প্রদায়ের মানুষদের খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতির উল্লেখও ঔপন্যাসিক করেছেন। এই অন্ত্যজ শ্রেণির গরীব মানুষগুলি মূল ভূখণ্ডের সাধারণ নিম্ন শ্রেণির মানুষজনের মত খাদ্যরীতিই অনুসরণ করে। তবে

মদ-মাংসকে এরা জীবনের অপরিহার্য উপাদান বলে গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে এরা বুনো শুয়োর শিকারেও উদ্যোগী হয় — ''বুনো শুয়োর মারবার আশ্চর্য কৌশল ওদের।''[৩০১] পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও এদের মূল জনসমাজের অন্ত্যজ মানুষদের থেকে খুব একটা পৃথক করা যায় না। 'টিন আর বাঁশের ছেঁচা বেড়া' দিয়ে কাহারেরা নিজেদের বাড়ি তৈরি করে। কাহারপাড়ায় করালী প্রথম মাটির দেওয়ালের বাড়ি দিতে উদ্যোগী হয়। এভাবে এই উপন্যাসে কাহারদের খাদ্যরুচি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থানের বিবরণেও আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ এসেছে।

এই উপন্যাসটি প্রথম পুরুষ কথন রীতি বা সর্বজ্ঞ রীতিতে রচিত। এর বর্ণনার ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক চলিত গদ্যরীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু চরিত্রদের সংলাপের ভাষায় তিনি বাংলা রাঢ়ী উপভাষার কথ্যরীতিকে গ্রহণ করে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''মহৎ ঔপন্যাসিকের মতই তারাশঙ্কর দেশজ বাগ্‌রীতির উপর তাঁর আশ্চর্য অধিকারকে শুধু সপ্রমাণ করেননি, তাকে শিল্পশুদ্ধ করে তুলেছেন।''[৩০২] এই ভাষারীতি সম্পর্কে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল — ''উপন্যাসের সংলাপ ও মন্তব্য বিশ্লেষণে বীরভূম জেলার কোপাই তীরবর্তী আদিম নরগোষ্ঠীর বাগ্‌রীতির চমৎকার ও অব্যভিচারী প্রয়োগ হয়েছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। এই ভাষা বাংলা ভাষারই একটি আঞ্চলিক প্রতিরূপ।''[৩০৩] সত্যি সত্যিই তারাশঙ্করের এই ভাষারীতি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। কিছু দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয় — ''এবা খ্যানত হ'লে আগে তোমার ঐ চৌধুরী বাড়িতেই হবে'', (পৃঃ ১১) ''ইবার যে পুজোটি গেল মুরুব্বি, তার পাঁঠাটি খুঁতো ছিল'', (পৃঃ ১১) ''বস্ বস্ হারামজাদা, তু বস্'' (পৃঃ ১৫), ''আজ্ঞে উ একটা হয়ে গেল আর কি'', (পৃঃ ২৯) ''অ্যাল-লাইনে কুলী-গ্যাঙে কাজ করি'', (পৃঃ ৪১), ''পিত্তিপুরুষদের ভিটে থাকল 'মন্তরায়', এই ভাগ্যি'', (পৃঃ ৫৫), ''কাঠ-ভুঁই দু পুসুরি খোল দিয়েছে, 'সালপেট আলুমিনি' দিয়েছে'' (পৃঃ ৬৬), ''তোমার বাহন মারার পিতিবিধেন হল না বাবা'', (পৃঃ ৮১), ''আমি কি অল্যায় কি বললাম'', (পৃঃ ৯৩) ''লয়ানের আমি সাঙা দিয়ে দোব বাসিনী বউ'', (পৃঃ ৯৫), ''আমার আউশের ভুঁইখানা ছামনেই, দিই কেটে

ঢুকিয়া, ই একেবারে জমির সালসা'', (পৃঃ ১০০) ''এ যে 'রিন্দভোবন' ক'রে ফেলালছে করালী'', (পৃঃ ১১০) ''লারায়নের যেমন লারদ'', (পৃঃ ১১৪) ''বসন আমার প্যাটের বিটি'', (পৃঃ ১৩৩) '' — হে — ঝড় — ঝড়! ব্যানোকাকা! পেলয় ঝড়!'', (পৃঃ ১৪৮) ''নামোতে আন্না হবে, হাঁড়িকুড়ি থাকবে'', (পৃঃ ১৫৭), ''দূর কর্, ছামনে থেকে দূর কর্ — '' (পৃঃ ১৭২), ''পে — ল — য় ঝড় আসছে, 'সাকোলন' 'সাইকোলন'' (পৃঃ ২৫৭) ইত্যাদি মত অসংখ্য সংলাপে হাঁসুলী বাঁকের একান্ত আঞ্চলিক কথ্য ভাষার রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

উপন্যাসের গানগুলির বিষয়বস্তুতে সেই অঞ্চলটির মানুষগুলির জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা বিষয় স্থান পেয়েছে, তেমনি এগুলির ভাষাভঙ্গিতেও সেখানকার আঞ্চলিকতা রক্ষিত হয়েছে। নিচে এই উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল —

১। ''তাই ঘুনাঘুন — বাজলো নাগরী
ননদিনীর শাসনে, — চরনের নূপুর থামিতে চায় না।
ঘরে থাকিতে মনো চায় না। ও তাই — তাই ঘুনাঘুন।''[৩০৪]

২। ''হায় কলিকালে কতই দেখালে —
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে, তাও মারলে রাখালে।. . .''[৩০৫]

৩। ''চোখের জলে লরম হল মাটি—
সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরিত।''[৩০৬]

৪। ''মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে—
কে পেয়েছে, ও সইয়েরা, দাও আমায় ফিরে হে!''[৩০৭]

৫। ''ও সায়েব আস্তা বাঁধালে!
হায় কলিকালে!
কালে কালে সায়েব এতে আস্তা বাঁধালে — ''[৩০৮]

৬। ''জাতি যায় ধরম যায় মেলোচ্ছ কারখানা
ও-পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।''[৩০৯]

৭। ''আমার মনের অঙের ছটা
তোমার ছিটে দিলা না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে —
সে জল পাতা নিলা না—. . .''[৩১০]

৮। ''হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী, যাই বলিহারি—
বাঁধিল নতুন ঘর দক্ষিণ-দুয়ারী।. . .''[৩১১]

৯। ''চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর
জষ্ঠিতে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে।''[৩১২]

১০। ''যে অঙ আমার ভেসে গেল
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ আমার ভেসে গেল
কোপাই নদীর জলে হে!. . .''[৩১৩]

এসব লক্ষণের কারণেই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে উপন্যাসটির শ্রেণি নির্ণয় করতে বসে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপধ্যায় বলেছেন —

''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' গভীর সাঙ্কেতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ও মহাকাব্যের সংঘাতধর্মী উপন্যাস।''[৩১৪] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মত অবশ্যই স্বীকার্য। সত্যি সত্যিই কাহার সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবনকথা নিয়ে লেখা এই উপন্যাসটিতে সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি এসেছে। তবে এটাও কেউ অস্বীকার করবেন না যে, এই মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি তৈরিই হয়েছে কোপাই নদের তীরবর্তী হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটির সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই হাঁসুলী বাঁক তো অবশ্যই মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। উপন্যাসটিতে এখানকার ভূ-প্রকৃতি থেকে শুরু করে তার অধিবাসীদের সামগ্রিক জীবনচর্যার কথাই পরিবেশিত হয়েছে। এদিকে লক্ষ রেখেই সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''আঞ্চলিক পটভূমির অনুপুঙ্ক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান, ভূমিব্যবস্থার এবং গ্রামীণ আর্থনীতিক প্যাটার্নের সঠিক চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি এই উপন্যাসের সার্বিক পরিবেশকে জমাট করে তুলেছে। তা এত জমাট যে, এই উপন্যাসের কোনোটি থেকে কোনোটিকে পৃথক করা যায় না।''[৩১৫] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে — ''গোটা মানুষ, সজীব প্রকৃতি আর সমাজ-পরিবর্তনের খরস্রোত চিত্রণে তারাশংকরের অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁকে তাঁর কালের ক্রনিক্লার করে তুলেছে। . . . এই বক্তব্য পুনর্বার সমর্থিত হয় তাঁর পরবর্তী বড় উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। উপন্যাসের নাম 'উপকথা'। সন্দেহ নেই, টেল-ধর্মী কাহিনীতে এক নরগোষ্ঠীর আদিম বিশ্বাস সংস্কার ধর্মভাবনা অনুস্যূত হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, এই উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত।''[৩১৬] অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় শুধু এখানেই থেমে থাকেন নি, তিনি তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিকে সরাসরি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় (১৯৪৭) মানুষ ও প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী যোগ সাধিত হয়েছে; ভৌগোলিক সত্তা এখানে পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে; প্রকৃতি এখানে কাহিনী-দিগ্বলয়কে বেষ্টন করে ক্ষান্ত হয় নি, কাহিনীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। প্রকৃতির পরিবেশ বদ্ধমূল অ-প্রাকৃত সংস্কার, যুগযুগ প্রচলিত কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি ও পুরাণকাহিনী উপন্যাসটিকে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। অন্ত্যজ কাহারগোষ্ঠীর লৌকিক ও অ-

প্রাকৃত সংস্কার ও বিশ্বাস এবং ময়ূরাক্ষীর বেড়ে অবস্থিত কোপাইদহ বেষ্টিত বাঁশবাদি গ্রাম এই নরগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সর্বোপরি এক রহস্যময় জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার হয়েছে এই উপন্যাসে। আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে এ গ্রন্থ সার্থক।''[৩১৭] এজন্য বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে বসলে সবার উপরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসকেই স্থান দিতে হয়। একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের সমস্ত গুণ এই উপন্যাসটিতে আছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **'ঢোঁড়াই চরিত মানস'**। দুই চরণে রচিত এই উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা শুরুর পূর্বে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, এর প্রথম চরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় চরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বিশ শতকের দুই অর্ধে এই উপন্যাসের দু'টি চরণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু চরণ দু'টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং এদের কোনোভাবেই আলাদা করা সম্ভব নয়, তাই বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসের আলোচনা অংশেই সমগ্র 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটিকে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হতে হল।

এই উপন্যাসটি যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। তাই দেখা যায় যে, যাঁরাই এই উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই এই এর উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি সমালোচকরা এর স্রষ্টা সতীনাথেরও প্রশংসা করতে ভোলেন নি। এদের মধ্যে সবার আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য সুকুমার সেনের কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি এ সংক্রান্ত আলোচনায় লিখেছেন — '' . . . 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (দুইখণ্ড ১৯৪৯, ১৯৫১) ও অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পে সতীনাথ নিজস্ব চিন্তার, সহানুভূতির ও কল্পনার সমুজ্জ্বল পরিচয় দিয়াছেন।''[৩১৮] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তবে খুব সংক্ষেপে উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাতে এই উপন্যাসটিকে পৃথক কোনো শ্রেণীর মধ্যে না ফেললেও বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক'-এর সঙ্গে এই উপন্যাসটিকেও 'উচ্চাঙ্গের উপন্যাস' বলে মন্তব্য করেছেন — ''কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ফেলা যায় না এমন কয়েকখানি

উচ্চাঙ্গের উপন্যাস সাম্প্রতিককালে রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' ও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।''[৩১৯] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন — ''অবশ্যই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯) সতীনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।''[৩২০] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন — ''ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর শক্তিমত্তার সার্থক পরিচয়স্থল দু খণ্ডে প্রকাশিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (প্রথম চরণ বা খণ্ড, বৈশাখ ১৩৫৬, দ্বিতীয় চরণ ১৩৫৮)। বিহারের গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এই উপন্যাস।''[৩২১] আধুনিক সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতে — '' . . . যদি বলি ঢোঁড়াই চরিত মানস সতীনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, তাহলে হয়তো খুব একটা মতান্তর হবে না। অন্তত একথা আমরা সহজেই বলতে পারি যে এমন সার্থক বিস্তারধর্মী উপন্যাস, এমন এপিক লক্ষণাক্রান্ত — বলা বাহুল্য, একালের এপিক — বাংলা সাহিত্যে খুবই দুর্লভ।''[৩২২] আবার অলোক রায়ের মতে — ''বাংলা দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে ঢোঁড়াই চরিত মানসের স্থান সুনিশ্চিত।''[৩২৩] এদিকে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি এর বিষয়বস্তু সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসটির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''বিহারের শহর জিরানিয়া, তার থেকে কিছু দূরে তাৎমাটুলি। তাৎমাদের বৃত্তি ঘরামি আর কুয়োর বালি ছাঁকা। তারা জাতে তাঁতি। তার পাশেই ধাঙড়টুলি। এই পরিবেশে পিতৃহীন, মাতৃ পরিত্যক্ত ঢোঁড়াই বড় হয়। এই তাৎমা ঢোঁড়াইকে লেখক গড়ে তুলেছেন রামচন্দ্রের নতুন সংস্করণ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্ব এর কাল-পরিধি। সমাজের নিম্নতর স্তরে রাজনৈতিক চেতনা কীভাবে প্রবেশ করে বদলে দেয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবর্তিত করে এক ঢোঁড়াইকে 'রামায়ণজী'তে, তার এক অসাধারণ আখ্যান এই গ্রন্থ। এই কাহিনীতে অন্তর্লীন হয়ে আছে তুলসীদাসের রামচরিতমানস। রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তন এবং রামচরিতমানসের সঙ্গে আধুনিক কাহিনীর অন্তর্বয়ন এই তিনদিক থেকে এই আখ্যান বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির

অন্যতম।''[৩২৪] আর এর স্রষ্টা সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য — ''তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ঢোঁড়াইচরিত মানস (১ম খণ্ড ১৯৪৯, ২য় খণ্ড ১৯৫১) সতীনাথের শ্রেষ্ঠরচনা হিসেবে সমালোচক মহলে বন্দিত। তুলসীদাসের রামচরিতমানস এই উপন্যাসের অন্তর্লীন গঠন। পূর্ববিহারের সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, এক সাধারণ মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে নায়ক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত এই মহাকাব্যের মতো বিস্তৃত ও জটিল উপন্যাসটিকে এক অসামান্য মহিমা দিয়েছে।''[৩২৫]

সতীনাথ ভাদুড়ী এবং তাঁর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সম্পর্কে পণ্ডিত-সমালোচকের এসব আলোচনায় উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্পর্কে এর নানা গুণের কথা উঠে আসে। তবে এসব গুণাবলীর মধ্যে অবশ্যই এর আঞ্চলিক সীমা-সংহতির কথাটিও পড়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে — ''সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'ও একখানি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। বিহারের তাৎমাটুলির শিক্ষা-দীক্ষাহীন সরল গ্রাম-জীবনের ছবি এখানে অঙ্কিত। বিহারের এই অঞ্চল তার সকল বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে ঢোঁড়াই-এর চরিত্রকে গড়ে তুলেছে। অন্যান্য চরিত্রেও অঞ্চলের প্রভাব সর্বত্র।''[৩২৬] যাই হোক, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর আঞ্চলিকতার দিকগুলি অনুসন্ধানের পূর্বে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা দরকার।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ২৬শে ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রথম চরণ বের হয়। তখন এর নাম ছিল 'সটিক ঢোঁড়াই চরিত মানস'। এর দ্বিতীয় চরণও সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় বের হয় — সময়কাল ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০শে ভাদ্র। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর তৃতীয় চরণও বের করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু প্রথম দু'টি চরণের সাফল্য প্রত্যাশিত পথে না যাওয়ায় তিনি আর সে পথে হাঁটেন নি। রসজ্ঞ পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টিতে উপন্যাসটি সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হলেও বৃহত্তর পাঠক সমাজে এটি তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি —

জনপ্রিয়তার দিক থেকে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ তার পূর্বে প্রকাশিত সতীনাথের অপর উপন্যাস ‘জাগরী’র ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারে নি। অথচ ঔপন্যাসিক নিজে এই উপন্যাসটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করতেন। সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি এই উপন্যাসটির জন্যেই সতীনাথকে ‘লেখকের লেখক’ বলে অভিহিত করেছেন। আসলে ঔপন্যাসিকের জীবনের বেশির ভাগ সময় বর্তমান বিহারের পূর্ণিয়ায় কেটেছে। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার পর তিনি খুব কাছে থেকে সে অঞ্চলের গ্রামগুলি এবং সেখানকার জীবনচর্যাকে দেখেছিলেন। উপন্যাসটি লেখার সময় সে সবকেই অত্যন্ত জীবন্তভাবে তুলে এনেছেন। তবে এই উপন্যাসের ভিতর তিনি এতদিন বাঙালি পাঠকের কাছে যে অপরিজ্ঞাত অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের অপরিচিত নামধাম সহ জীবনযাত্রা, প্রকৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার, ফুটনোটসহ আঞ্চলিক হিন্দুস্থানি উপভাষার রূপ চিত্রণ করেছেন সে সবের সঙ্গে এই পাঠকসমাজ সম্পৃক্ত হতে পারে নি। এজন্য অনেকের কাছেই ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ দুরূহ উপন্যাস থেকে গেছে। তবে বাংলা সাহিত্যের এটা সৌভাগ্য যে, সতীনাথ নিছক জনপ্রিয়তার কথা না ভেবে একনিষ্ঠভাবে একজন প্রকৃত শিল্পীর কর্ম করে গেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্য এইরকম একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক লক্ষণযুক্ত মানুষের জীবনকথা দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। এজন্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ শতকের মাঝামাঝি রচিত আঞ্চলিক জীবন নির্ভর উপন্যাসগুলির সারণীতে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসটিকে রেখে মন্তব্য করেছেন — ‘‘আঞ্চলিক জীবন এবং প্রায়ই অন্ত্যজ জীবন অথবা পরিচিত শ্রমজীবীজীবনকে অবলম্বন করে নবীন লেখকদের হাতে যে ক’টি উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে আলোচনার যোগ্য বা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনটি — সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’, ‘অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’।’’[৩২৭]

বিহারের গ্রামাঞ্চলে আজকের দিনেও তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’ অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটি ‘রামচরিত মানস’-এর আদলেই রচনা করেছেন। রামায়ণে যেমন ‘আদিকাণ্ড’, ‘বালকাণ্ড’, ‘অযোধ্যাকাণ্ড’, ‘অরণ্যকাণ্ড’ প্রভৃতি বিভাগ আছে, তেমনি এই উপন্যাসেও ‘আদিকাণ্ড’, ‘বাল্যকাণ্ড’, ‘পঞ্চায়েত কাণ্ড’, ‘রামিয়া কাণ্ড’, ‘সাগিয়া কাণ্ড’ ‘লঙ্কা

কাণ্ড' প্রভৃতি বিভাগ আছে। আবার প্রতিটি কাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের নামকরণেও রামায়ণের প্রভাব আছে। যেমন 'জিরানিয়ার বিবরণ', 'তাৎমাটুলির কাহিনী' 'ধাঙড়টুলির বৃত্তান্ত', 'বৌকা বাওয়ার আদিকথা', 'ঢোঁড়াইয়ের জন্ম', 'বস্ত্রলাভের উপাখ্যান' 'গুরু–শিস্য সংবাদ', 'গানহী বাওয়ার বার্তা', 'গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণন', 'তাৎমা ধাঙড় সংবাদ', 'তাৎমানীদের 'ধানকাটনী'র রাজ্যে যাত্রা' প্রভৃতি। উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াইকে ঔপন্যাসিক অন্ত্যজ শ্রেণীর কাছে রামায়ণ কাহিনির শ্রীরামচন্দ্রের আধুনিক বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে উপন্যাসটি জিরানিয়ার তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াইয়ের জন্মকথা থেকে শুরু করে পিতৃহীন অবস্থায় মা কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় বৌকা বাওয়ার আশ্রয়ে বেড়ে উঠে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত গানহী বাওয়ার (গান্ধীজী) আদর্শে দেশ সেবার আত্মনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে বিহারের মফঃস্বল শহর জিরানিয়া থেকে মাইল চারেক দূরের তাৎমাটুলিতে। এই তাৎমাটুলিতে তাৎমারা বাস করে। এরা জাতিতে তাঁতি; কুয়োর বালি ছাঁকা এবং ঘরামির কাজ হল এদের প্রধান জীবিকা। তাৎমাটুলির পাশেই বড় রাস্তার ওপারে ধাঙড়টুলিতে থাকে ওঁরাও গোষ্ঠীর ধাঙড়েরা। সাহেব বাড়িতে মালি কিংবা মজুরের কাজ হল এদের প্রধান জীবিকা। এদের মধ্যে অনেকেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাৎমারা ধর্মে হিন্দু। এই দুই পাড়ার তাৎমা ও ধাঙড়দের মধ্যে বিরোধ চিরকালের। তাৎমারা স্নান করে না বলে ধাঙড়রা তাদের 'নোংরা জানোয়ার' বলে, আর ধাঙড়দের তাৎমারা 'বুড়বক কিরিস্তান' বলে গালাগালি করে। এই তাৎমাটুলির সন্তান ঢোঁড়াই। মাত্র দেড় বছর বয়সে তার বাবা মারা গেলে, মা বুধনী তাৎমাদের রীতি মেনে আবার বিয়ে করে। ফলে ছোট্ট ঢোঁড়াইয়ের আশ্রয় হয় গ্রামের পূজারী বৌকা বাওয়ার কাছে এবং সে তার ভিক্ষান্নে বড় হয়। একসময় সে রামিয়াকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও সে বিয়ে টেকে না। ঘটনাক্রমে ঢোঁড়াই গ্রাম ত্যাগ করে 'পাক্কী' ধরে বিসকিন্ধার কোয়েরী টোলায় এসে হাজির হয়। এখানে এসে সে স্বামীহারা মমতাময়ী যুবতী সাগিয়াকে ভালোবেসে ফেলে। এক সময় কোয়েরীদের সঙ্গে রাজপুতদের বিরোধ বাঁধলে সে কোয়েরীদের নেতা হয়ে ওঠে। ক্রমে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে রাজনৈতিক জীবনে দীক্ষিত হয়ে ঢোঁড়াই

ক্রান্তিদলে যোগ দিয়ে 'রামায়ণজী' নাম নেয়। এ সময় পলাতক ফেরারি জীবন কাটাতে গিয়ে ফিরিঙ্গি ছেলে এ্যান্টনীকে দেখে তাকে নিজের পুত্র ভেবে বসে তার প্রতি পুত্রস্নেহ অনুভব করে। অবশ্য তাৎমাটুলিতে পুনরায় ফিরে এলে ঢোঁড়াইয়ের ভুল ভাঙে। এরপর নিরালম্ব শূন্যজীবনে সে পুলিশের কাছে সারেন্ডার করার জন্য রওনা দেয়। এবারে সাগিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল। এভাবেই সমগ্র উপন্যাসে ঢোঁড়াইয়ের জীবন পরিক্রমাকে তুলে ধরা হয়েছে। দরিদ্র, উপেক্ষিত, পিছিয়ে থাকা, কু-সংস্কারগ্রস্ত একটি মানব-সমাজের জাগরণ পরিবেশিত হয়েছে ঢোঁড়াইয়ের আত্মোপলব্ধি সংক্রান্ত এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের দু'টি চরণেরই পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন মূল ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিকে থেকে স্বতন্ত্র তথা বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চলকে। উপন্যাসে অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিহারের জিরানিয়া নামে (সম্ভবত সতীনাথের আবাসস্থল বিহারের পূর্ণিয়া এখানে জিরানিয়া নাম গ্রহণ করেছে)। উপন্যাসটির শুরুতেই তিনি জিরানিয়ার স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়ে লিখেছেন — ''অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে এর নাম লেখা আছে 'জীর্ণারণ্য'। . . . তখনও যা ছিল এখনও প্রায় তাই। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেল-গাড়ি ইস্টিশানে পৌঁছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।

তাৎমাটুলির লোকেরা একেই বলে 'টৌন' (টাউন)। যেমন-তেমন হেঁজিপেঁজি শহর নয় — 'ভারী সাহার', পীরগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড়।''[৩২৮]

তবে উপন্যাসটিতে শহর জিরানিয়ার কথা উঠে আসে নি; জিরানিয়া থেকে মাইল চারেক দূরের শহরতলি তাৎমাদের বাসভূমি তাৎমাটুলি হল উপন্যাসের ঘটনাস্থল — ''এ হেন শহরের শহরতলি, তাৎমাটুলি; শহর যখন, তার শহরতলি থাকবে না কেন? জিরানিয়া আর তাৎমাটুলির মধ্যে আর কোনো গাঁ নেই। সেইজন্যই তাৎমাটুলিকে বলছি শহরতলি। শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হবে; তাৎমারা বলে 'কোশভর'। তাৎমাটুলির পশ্চিমে শিমূলগাছ-ভরা বকরহাট্টার মাঠ, তারপর ধাঙড়টুলি। দক্ষিণ ঘেঁষে গিয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির লোকেরা এই

রাস্তাকে বলে 'পাক্কী'।''[৩২৯] উপন্যাসটির নানা স্থলে এই তাৎমাটুলি ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ আছে। সেই অঞ্চলের অত্যন্ত পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''এর পর বহুবার বকরহাট্টার মাঠ সবুজ হয়ে গেলে 'মরণাধারে' জল এসেছে, বহুবার কুল পাকার সময় শিমূল বনে ফুলের আগুন লেগেছে, লু বাতাসে শিমূল তুলো উড়ে যাওয়ার সময় 'পাক্কী'র ধারের নেড়া অশ্বত্থ গাছগুলো তাৎমাদের আচার খাওয়ার জন্য কচি কচি ডগা ছেড়েছে।''[৩৩০] উপন্যাসে তাৎমাদের জীবনে সেই অঞ্চলের 'ধানকাটনি'র রাজ্য এক রহস্যময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে — ''অদ্ভুত এই 'ধানকাটনী'র রাজ্য। নতুন পোয়াল আর পচা পাঁকের গন্ধে ভরা দহের ধার রোজ রাতে কুয়াশায় ঢেকে যায়। আগুনের 'ঘুর'-এর ক্ষীণ আলোয়, কারো মুখ চেনবার উপায় নেই, অথচ কাটা ধানের পাহাড়ের উপর তাদের ছায়া নড়ে। সোনার পাহাড়গুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো হাতির মতো দেখতে লাগে। ধানখেগো হাঁসগুলোর ডাক হঠাৎ ছোট ছেলের কান্না বলে ভুল হয়। খড়ের গাদার মধ্যে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে রাতে ঘুমুতে হয়। জলের মধ্য দিয়ে 'পানডুব্বী' ভূত রাত দুপুরে ছপ্‌ছপ্‌ করে চলে বেড়ায় — সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দহের উপর 'রকস্‌' ভূত আলো জ্বালিয়ে হাতছানি দেয় — এই এখানে, তো পরের মুহূর্তে 'হুই-ই-ই' সাঁওতালটুলির ধারে চলে গিয়েছে। 'ঘর' এর ধারে গল্প জমে ওঠে। সব তাৎমার অভিজ্ঞতা একই রকম, — রাতে যখন সে মাঠে গিয়েছিল, তখন তাকে একটা মেয়ে ইশারা করে সঙ্গে যেতে বলে। দেখেই বোঝা গিয়েছে যে মেয়েটা 'শাঁখড়েল'। তার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় সে ঐ পুবের শিমূল গাছটায় উঠে গেল। সকলের গা ছমছম করে।''[৩৩১] তাৎমাটুলির তাৎমারা বহির্বিশ্বের খুব একটা খবর পায় না; রাখতেও চায় না — নিজেদের অঞ্চলটিই তাদের কাছে সব। তারা সে অঞ্চলের সমস্ত নদীনালাকেই 'কোশী' বলে ডাকে। কোশী নদীকে তারা মাতৃত্বের মর্যাদা দেয় — ''জিরানিয়া জেলার পশ্চিমে যত নদীনালা সবগুলোর নামই 'কোশী'। রগচটা 'কোশীমাই' পুরুবের 'বাঙাল মুলুক' থেকে বাপের বাড়ির দিকে চলেছেন হোঁচট খেতে খেতে। চোখের জলে অজস্র নদীনালায় রেখে যাচ্ছেন তাঁর নামের, আর চলার পথের চিহ্ন। রাগটা পড়লেই তিনি আবার ফিরবেন, একথা জিরানিয়া জেলার

প্রত্যেক লোকে জানে। . . . যতদিন মা না ফিরে আসে, ততদিন এইসব মরা নদীগুলোকে তারা সাবধানে আগলে বসে থাকবে। তারপর কোশীমাই ফিরে এলে আবার সমৃদ্ধির জোয়ার আসবে এই পথে। এখন তো কেবল বর্ষাকালে মাটির হাঁড়ি বোঝাই নৌকা যায়। তখন আবার বারো মাস পাক্কীর মোটর ট্রাকগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবে হাজার-মনী নৌকাগুলো। বিরতাহা গোলায় পাটের গাঁইট বাঁধবার পেঁচকলগুলোয় আবার রেড়ির তেল পড়বে।''[৩৩২] কোশী নদীর মতই তাদের কাছে অত্যন্ত জীবন্ত হল গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বড় রাস্তা 'পাক্কী'। এই 'পাক্কী'কে নিয়েই সেই অঞ্চলের মানুষ রোমান্টিক স্বপ্নে মশগুল হয়। 'পাক্কী'কে এরা ভালোবাসে বলেই এর দুরবস্থায় তারা কষ্ট পায়। ঔপন্যাসিক 'পাক্কী'র দুর্দশা দেখে এদের কষ্টের পরিচয় প্রদানের প্রসঙ্গে লিখেছেন — ''পাক্কী' ঢোঁড়াইয়ের কাছে একটা সজীব জিনিস। তার কোনোরকম সন্দেহ নেই যে পাক্কীটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। লোহাতে ঘুণ ধরেছে, সোনাতে মরচে পড়েছে, একি কলির শেষ হয়ে এল নাকি? বাবুসাহেব কাটিয়ে নিয়েছিল পাক্কীর ধারের অনেক আমগাছ। ফৌজের থেকে কাটিয়ে নিল সব সেগুন, শাল আর শিশুগাছগুলো। কুশী থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পাক্কীর গাছের মৌচাকগুলো একজন বাঙালি ঠিকেদার জমা নিয়েছে। আসামে ফৌজদের জন্য মধু চালান যাবে। ফৌজি হাকিমরা পাক্কীর ধারের জমি কতদূর পর্যন্ত তাদের, তা দিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই দুধারের মাটিকাটা গর্তগুলোতে বাবুসাহেব ধান লাগিয়েছে।''[৩৩৩] এই উপন্যাসের দুই চরণেই এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আছে, যেগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই উপন্যাসটির পটভূমি বাঙালির সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎ। বাংলা সাহিত্যে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নির্ভর বহু উপন্যাস লেখা হলেও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর মত পটভূমি খুব কমই গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি সত্যি সত্যিই বাঙালি পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞেয় ছিল।

এই উপন্যাসের চরিত্রদের ঔপন্যাসিক উপন্যাসে গৃহীত বিহারের পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চল থেকে হুবহু তুলে এনেছেন। তাদের নামগুলিও পুরোপুরি অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, ঢোঁড়াই, বৌকা বাওয়া, বুধনী, রেবন গুণী, ধনুয়া মাহাতো, বাবুলাল চাপরাসী, রতিয়া ছড়িদার, শনিচরা, বিরসা, শুক্রা, এতোয়ারী, গুদর মাই, সামুয়ের,

রামিয়া, ফুলঝরিয়া, সাগিয়া প্রভৃতি। উপন্যাসের চরিত্রের যে এমন নাম হতে পারে এই উপন্যাসটি প্রকাশের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে তা অজানাই ছিল। শুধু এটুকু নয়, এই উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ী 'পাক্কী'র দুই পাশের তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলির দুই অন্ত্যজ পল্লীর ঝগড়া, বিবাদ, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দৈনন্দিন জীবনের নানা লৌকিক আচরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিহারের গ্রাম জীবনের রূপকেও জীবন্তভাবে তুলে এনেছেন। এসবের পাশাপাশি পুরো তাৎমা ও ধাঙড় সমাজও তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে উঠে এসেছে। তাই উপন্যাসটির আলোচনায় অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯-৫০) উপন্যাসের নায়ক বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির তাৎমা-সম্প্রদায়ভুক্ত। ঘরামির কাজ, কুয়ো পরিষ্কার আর ধান কাটার কাজ করে তাৎমারা। লেখক কোনো রোমান্টিক আলো ফেলেন নি তাৎমা-সম্প্রদায় ও প্রতিবেশি ধাঙ্গর-সম্প্রদায়ের জীবনে। প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত, অলৌকিক বিশ্বাস-শাসিত, অন্ধ সংস্কার-চালিত তাৎমা সম্প্রদায়ের একটি পিতৃহীন মাতৃপরিত্যক্ত কিশোর কীভাবে বড় হয়ে উঠল, বাহির বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হলো, 'গানহি বাবা'র আন্দোলনে যোগ দিয়ে জীবনের বিশালতাকে উপলব্ধি করলো, তার বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।''[৩৩৪]
এই উপন্যাসের নায়ক হিসেবে অবশ্যই ঢোঁড়াইকে ধরতে হয়। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঢোঁড়াই-এর জীবন থেকে সেই অঞ্চলটিকে সরিয়ে নিলে তার নায়কোচিত অনেক বৈশিষ্ট্যই লোপ পায়। ঢোঁড়াই পুরোপুরি জিরানিয়ার সেই গ্রামাঞ্চলটির সন্তান, সে সেই অঞ্চলটির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যসহ উপন্যাসে হাজির হয়েছে। তাই উপন্যাসটি থেকে জিরানিয়ার সেই পল্লী অঞ্চলটিকে কোনোভাবেই সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

ঔপন্যাসিক এখানে তাৎমাদের জীবন জীবিকারও নানা পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাৎমাদের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — ''বোধ হয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেক দিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে — পেটের ধান্ধায়। না এদের কেউ কোনো দিন কাপড় বুনতে দেখেছে, না এরা স্বীকার করত যে এরা তাঁতি। এরা চাষবাস করে না,

বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না। আর বাড়িতে একবেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না। সেটুকুও বোধহয় জুটছিল না দ্বারভাঙা জেলায়। তাই এসে 'ধন্না' দিয়েছিল ফুকন মণ্ডলের কাছে।''[৩৩৫] তাৎমাটুলির দৈনন্দিন জীবন প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য — ''তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পালতে মাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায় — শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে — দেশলাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপটে যাবার পর আবার সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফর্সা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য। মেয়েরা কিন্তু একটু অন্যরকম। এর বাড়ির উঠোনে আর ওর বাড়ির পিছন দিয়ে তো যাওয়ার পথ। ধোঁদলের হলদে ফুলে ভরা একচালার নিচে যে মেয়েটা তামাক খাচ্ছে, সে না হুঁকোটা নামায়, না চিরকুট কাপড়কানা সামলে গায়ে দেবার চেষ্টা করে। ইদাঁরাতলার ঝগড়া সেই রকমই চলতে থাকে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না; তেলের বোতল হাতে কুঁজো বুড়িটা ফিক্ করে হেসে হয়ত জিজ্ঞাসাও করে ফেলতে পারে যে বাবু কোন্‌দিক যাবেন।''[৩৩৬] 'রোজা', 'রোজগার' এবং 'রামায়ণ' -- এই তিনটি বিষয় নিয়ে এই তাৎমাদের জীবন কাটে — ''তাৎমাটোলার লোকেরা বলে — রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোনো রকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজীর এদের পুরুষের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।''[৩৩৭] তাৎমাটুলির পাশে বড় রাস্তা 'পাক্কী'র পাশেই আছে ধাঙড়টুলি। এই ধাঙড়দের সঙ্গে তাৎমাদের বিবাদ চিরন্তন। এই ধাঙড়দের জীবনযাপন প্রণালীর বিবরণও এই উপন্যাসে আছে — ''ধাঙড়টুলির সঙ্গে তাৎমাটুলির ঝগড়া, রেষারেষি চিরকাল চলে আসছে। ধাঙড়দের পূর্বপুরুষরা আসলে ওরাওঁ। কবে তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে

গঙ্গার এপারে আসে কেউ জানে না। তবে সাঁওতাল পরগণার ওরাওঁদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল আছে। ধাঙড় ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় তারা হিন্দীতে কথা বলে। ধাঙড়দের মধ্যে কয়েকঘর খ্রীস্টান। অধিকাংশ ধাঙড়ই সাহেবদের বাড়ি মালীর কাজ করে, যারা মালীর কাজ না পায় বা না পছন্দ করে তারা অন্য অন্য কাজকর্ম করে। কুলের ডাল কাটা থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটা পর্যন্ত কোন কাজেই তাদের আপত্তি নেই। সকলেরই গায়ে অসীম ক্ষমতা, আর কাজে ফাঁকি দেয় না বলে, সকলেই তাদের মজুর রাখতে চায়। ধাঙড়রা তাৎমাদের বলে নোংরা জানোয়ার। তাৎমারা ধাঙড়দের বলে — 'বুড়বককিরিস্তান' (বোকা খ্রীস্টান)।''[৩৩৮]

তাৎমাদের জীবিকা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''কার্তিক অঘ্রাণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার কিছু অনিশ্চিত হয়ে আসে। ঘরামির কাজ কমে যায় অথচ কুয়ো পরিষ্কারের কাজ তখনও আরম্ভ হয় না। বোধহয় সেইজন্যই তাৎমা মেয়েরা অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে। তারা ফিরে আসে পৌষের শেষাশেষি। পুবেই যায় বেশি, — মায়সী, জামৌর, রুৎবা থানাতে। ওদিকে রোজগার বেশি, 'বাঙ্গাল মুলুকের' কাছে কিনা, সেই জন্য; কিন্তু রোজগার বেশি হলে কি হয়, 'পানি বড্ডা লরম আওর বড্ডা বুখার।' তার ওপর ওদিকে 'মিয়া' বেশি। সব সময় 'জাতপাঁত' বাঁচিয়ে চলাও শক্ত, ঐ 'পাট আর পানি'র দেশে। তাই অধিকাংশ বছরেই তাৎমা মেয়েরা যায় পচ্ছিমের কমলদাহা, বড়হড়ী, ধোকড়-ধারা এসব থানায়।''[৩৩৯] পল্লীর পাশ দিয়ে বয়ে 'পাক্কী' এদের জীবনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে। এরা এই 'পাক্কী'কে জীবন্ত চরিত্র হিসেবে দেখে — ''সত্যিই 'পাক্কীর' সঙ্গে তার নাড়ী বাঁধা। লাঙলের ফালের দাগ যেন 'পাক্কী', আর তার দু-পাশের গাছের সার, হলরেখার দু-ধারের উঁচু মাটি। জীবন কেটেছে ঐ গাছের আওতায়, গোঁসাইথানে, শীতের হিমে, বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের লু-বাতাসে। . . . বর্ষায় দু'ধার জলে ডুবে গেলেও মাথা উঁচু করে থাকে রাস্তাটা। পাক্কী ঢোঁড়াইয়ের কাছে নির্বিঘ্নতা, দৃঢ়তা আর বিশালতার প্রতীক।''[৩৪০] এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের আরও পর্যবেক্ষণ হল — ''ক্ষেতের রঙ বদলায়, লোকের মন বদলায়, আজকের ছোট ছেলেটা কাল জোয়ান হয়ে ওঠে, রোজার 'তাকত' কমে, রোজগারের ধারা বদলায়, তাৎমাদের মোড়ল গরুর গাড়ি চালায়, দুনিয়ার সব জিনিস বদলায়।

বদলায় না কেবল ‘পাক্কী’ আর রামায়ণ। এ দুটোর সঙ্গে যে নাড়ি বাধা তার। এগুলো চিরকাল এক রকম।’’[৩৪১]

অবশ্য সেই অঞ্চলের জনজীবনে জমিদারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ঔপন্যাসিক সুকৌশলে এই অঞ্চলের জমিদারী ব্যবস্থার একটা রূপকেও দেখিয়েছেন — ‘‘আইনত এ অঞ্চলের জমিদার রাজপারভাঙা। সরসৌনিতে, যেখানে সেকালে উইলসন সাহেবের নীলকুঠি ছিল, সেইখানেই জমিদারের ‘সার্কেল কাছারি। . . . আইনের চোখে যাই হোক, আসলে কিন্তু গাঁয়ের জমিদার বচ্চন সিং — গাঁয়ের ‘বাবুসাহেব’। জোত আর রায়তি জমি মিলিয়ে এঁর জমি হবে প্রায় তিন হাজার বিঘা। . . . বাবুসাহেবের জমি এখনও বাড়ছে। ও যে বাড়তেই হবে। জমি যে মানুষের পরিবারের মত। ছেলেপিলে হয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলে, না হয় মরে হেজে ছোট হয়ে আসে। একই রকম কখনও থাকে না। যার লাঠি তার মোষ। স্বাভাবিক নিয়মেই এই সব জমি চলে যাচ্ছে বাবু সাহেবের পেটে।’’[৩৪২] বিসকিন্ধার কোয়েরিটোলার মানুষদের উপর জমিদারের প্রভাবের কথা জানানোর প্রসঙ্গ ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ‘‘তিনি সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর সম্মুখে কোয়েরী টোলার লোকদের এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। ডান পা দিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে জড়িয়ে দু’হাত জোড় করে দাঁড়ানো জমিদারের সম্মুখে, এটা কেবল এ গাঁয়ের রেওয়াজ নয়, এ মুল্লুকের।’’[৩৪৩]

এভাবে এই উপন্যাসে তাৎমা এবং ধাঙড়দের নিজস্ব জীবন ও জীবিকার পরিচয় যেমন আছে, সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের জমিদারতন্ত্রেরও একটা বাস্তবরূপকে তুলে ধরা হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে সে অঞ্চলের সামগ্রিক জীবনযাপনের বাস্তবরূপও উঠে এসেছে। এরূপ মানুষের জীবন ও জীবিকার বিষয়টি মূল জনসমাজের মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে কিছুটা মিললেও অনেক দিক থেকেই স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যেও এরূপ জীবনাচরণের ছবি খুব একটা নেই।

এই উপন্যাসে মূলত হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষজনের কথা বলা হয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্যে তাৎমারা হিন্দু ধর্মের তাঁতি সম্প্রদায়ের মানুষ। অবশ্য ধাঙড়দের মধ্যে কিছু খ্রিস্টান আছে। কোয়েরীটোলায় কিছু কবীরপন্থী মুসলমান

সম্প্রদায়ের কথাও আছে। তবে হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকলেও তাৎমাদের ধর্মাচরণের একটা নিজস্বরূপের পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। তারা নিজেদের পল্লীতে একেবারে নিজস্ব দেবতার উপাসনা করে — ''তাৎমাটুলির বড় রাস্তার ধারে আছে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। তার নীচে একটি উঁচু মাটির ঢিবি বেশ করে সিঁদুর মাখানো। ইনি হচ্ছেন তাৎমাদের 'গোঁসাই'। এই গোঁসাইয়ের সম্মুখে পোঁতা আছে একটি প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ। এই জায়গাটার নাম গোঁসাই থান; লোকে ছোট করে বলে 'থান'। প্রতি বছর ভাই দ্বিতীয়া না তার পরের দিন এই হাড়িকাঠে তেল-সিঁদুর পড়ে, একটা নিশান পোঁতা হয়, আর চাঁদা করে কেনা একটি ভেড়া বলি দেওয়া হয়। এই 'থানে'ই বৌকা বাওয়ার' আস্তানা। বৌকা বাওয়ার আগে কিংবা পরে তাৎমাদের মধ্যে আর কেউ সাধু সন্ন্যাসী হয় নি। ''[৩৪৪] অবশ্য গান্ধীজী এদের কাছে ঈশ্বরের রূপ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তারা তাঁকে 'গান্হী বাওয়া' বলে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁর সমস্ত কর্মসূচীকে ঈশ্বরের আদেশ বলেই মেনে নিয়েছিল।

উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের লোকবিশ্বাস, লোক-সংস্কার, লোকাচার, লোককথার বিবরণও আছে। যেমন, এক জায়গায় তাৎমাটুলির মানুষদের নিজস্ব বিশ্বাসের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলিতে চড়াইপাখি দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শিগগিরই আসছে। তার উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে লোক গুনে গিয়েছে। (আদম শুমারি) সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ার, তাৎমাটুলিতে, ধাঙড়টুলিতে, কী অসুখ! কী অসুখ! 'বাই উখড়ানোর' ব্যারাম — বেহুঁশ জ্বর — 'ঝট্দে বিমার পট্দে খতম'।''[৩৪৫] আর এক জায়গায় ধাঙড়টুলির মানুষদের নিজস্ব বিশ্বাসের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''হাসিখুসি-ভরা ধাঙড়টুলিতে হঠাৎ অমঙ্গল আর আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। শনিচরার বাঁশঝাড়টায় ফুল ধরেছে। . . . এত বড় অমঙ্গলের সূচনা ধাঙড়টুলিতে আর কখনও আসেনি। 'বাঙ্গাবাঙ্গী'-র (ধাঙড়দের দেবতা) নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল, না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না। তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশি সেখানে থেকো না, বারো বার

গাছে তেতুল পাকুক, তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে।''[৩৪৬]

এই অঞ্চলে স্থানীয় ওঝারা দোর্দণ্ডপ্রতাপে বিরাজ করে। উপন্যাসে এই ওঝাদের প্রতিনিধি হল রেবনগুণী। সে অঞ্চলের অন্ত্যজ মানুষদের ওঝাদের সম্পর্কে ধারণার পরিচয় দিতে গিয়ে রেবনগুণী প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''রেবনগুণীর নামে পাড়ার লোকে কাঁপে। তাৎমাটুলির আইবুড়ো মেয়েরা তাকে দূর থেকে দেখলে পালায়। মায়েদেরও মেয়েদের উপর সেই রকমই হুকুম। এক তো তুকতাকের ভয়, তার উপর থাকে চব্বিশ ঘন্টা নেশা করে। পরপর ছটা বিয়ে করেছে, এখনও দুটোকে নিয়ে ঘর করে। গোঁসাইথানে যেদিন ভেড়া বলি হয়, সেদিন প্রতি বছর তার উপর গোঁসাই ভর করেন, সেই সময় সে ভেড়ার কাঁচা রক্ত খায়; মুখে গায়ে ভেড়ার রক্ত মেখে সে হুংকার ছাড়ে। সে কি আর করে? তার মধ্যে দিয়ে গোঁসাই কথা বলেন। তার হাতের বেতের ঘেরটা দিয়ে ছুঁয়ে সে যাকে যা বলবে, তা ফলবেই ফলবে। কুমারী মেয়েরা সে সময় পালায় সেখান থেকে। পাঁচবার সে একটা মেয়েকে ছুঁয়ে, তার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছে। কোনও মা বাবার সাধ্যি নেই যে, সেই সময়কার গোঁসাইয়ের কথার নড়চড় হতে দেয়।''[৩৪৭]

তাৎমারা নিজেদের বিচারব্যবস্থার উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। এজন্য তাদের পল্লীতে মাঝেমাঝেই পঞ্চায়েত বসে। এসব পঞ্চায়েতে গ্রামের নানা সমস্যার সমাধান করা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে নিদান দেওয়া হয় — ''তাৎমাটুলিতে 'পঞ্চায়েতি' নিত্যি লেগেই আছে — এর বৌ ওকে দেওয়া, কোন পক্ষের কোন ছেলেটা মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখাগ্নি করে নিয়েছে, মৃতের বাড়ির বেড়া আর বাঁশগুলো পাবে বলে; কে জোর করে স্বামীর সাক্ষাতে তার স্ত্রীর কপালে সিঁদুর লাগিয়ে তাকে স্ত্রী বলে দাবী করেছে; আরও কত রকমের দৈনন্দিন জীবনের খুচরো মামলা। . . . সব আসামীই তাৎমাটুলির 'পঞ্চায়েতি'তে আসতে ভয় পায়। শাস্তির প্রথম দফা পঞ্চায়েতের প্রথম বৈঠকের মধ্যেই হয়ে যায়। মোটামুটি 'ফয়সালা' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামীর উপর চড়-চাপড় পড়তে আরম্ভ করে। এগুলো কিন্তু আসল শাস্তির ফাউ। এই উপরি পাওনার পর অন্তিম রায় বেরোয়, জরিমানা গাধার পিঠে চড়ানো,

ভোজ — খেলা নয় 'ভাতকা ভোজ' (ভাতের ভোজ) আরও কত কী।''[৩৪৮] তাৎমাদের সমাজে বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিয়েতে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দেয়। জানা যায় যে, পণ দিতে না পারায় গ্রাম্য পুরোহিত বৌকা বাওয়ার বিয়ে হয় নি — ''তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে। তাৎমাটুলির বুড়িরা বলে, 'আহা টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকাটা সন্ন্যাসী হয়ে গেল।' — তাৎমাদের ছেলেরা বিয়ে হলেই সাহেবদের মত মা-বাপের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভয়ে বৌকার মা ভিক্ষায় জমানো আধলাগুলো একদিনও ছেলের হাতে দেয়নি।''[৩৪৯]

উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির অন্ত্যজ মানুষজনের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতির বিবরণও আছে। তাৎমা বা ধাঙড়রা অত্যন্ত গরীব, এদের উপার্জনও অত্যন্ত কম। তাই এদের খাদ্য তালিকা অত্যন্ত সাধারণ মানের। এরা সাধারণত ভাত খায়। খাবারের সময় মুসুর ডালের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ হয় না। ঢোঁড়াই-এর জন্মের পর তার মা বুধনীর জন্য তার স্বামীকে মুসুরের ডাল আনতে হয়। তবে সে নিজে কোনোদিন মুসুর ডাল খায় নি — ''তার স্বামী কোনোদিন মসুর ডাল খায় নি। সে কেন কোন তাৎমাই খায় না। অত গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে এই ভয়ে। খালি খাবে মেয়েরা, ছেলে-পিলে হওয়ার পর কয়েকদিন, তখনি ওদের শরীরে রস শুকোনোর দরকার সেইজন্যে।''[৩৫০] আদা ফোড়ন বা রসুন ফোড়ন দিয়ে এই মসুর ডাল রান্না করা হয়। বিশেষ আনন্দের দিনে এদের মধ্যে মিষ্টি খাওয়া-দাওয়ারও প্রচলন আছে। তাই বুধনীর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান গুদর জন্মালে তার স্বামী বাবুলাল মিষ্টি নিয়ে আসে। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে প্রসাদ হিসেবে 'পেঁড়া' দেওয়া হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তাৎমা বা ধাঙড়রা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিহারের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষজনের মতই পোশাক-আশাক পরিধান করে। তবে সমাজের বিশিষ্টজনেরা মাথায় একধরনের পাগড়ী পরে। এদের বাসস্থানগুলিও অত্যন্ত সাধারণ মানের। এগুলিতে খোলার চালের আচ্ছাদন থাকে। আর প্রত্যেক বাড়িতে কুয়ো থাকে — ''জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল,

আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোনোরকমে চলে যায়।''[৩৫১] এভাবে এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষদের সামগ্রিক জীবনাচরণের ছবি প্রকাশ পেয়েছে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক মান্যচলিত বাংলায় রচনা করেছেন। তবে তিনি পাদটিকাসহ এই উপন্যাসে অনেকগুলি স্থানীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনেকের মতে এরূপ আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার উপন্যাসটিকে সাধারণ পাঠকের কাছে দুরূহ করে তুলেছে এবং সেজন্য উপন্যাসটি প্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। তবে এটা মানতেই হয় যে, এসব আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার কাঠামোকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। এই উপন্যাসে যে সমস্ত আঞ্চলিক শব্দ-বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তার কিছু দৃষ্টান্ত হল — 'টৌন', 'ভারী সাহার', 'কলস্টর', 'চেরমেন', 'বাং-গালী', 'কোশভর', 'কিসান', 'কৃপা তুমহারি সকল ভগবান', 'ঝোটাহারা', 'পঞ্চায়তি', 'হাভেলি', 'গোঁসাই থান', 'পীপর গাছ' 'আদৌড়ি', 'পাকিট বাত্তিমার', 'ওয়ালেতের রাজা', 'বিলি বাচ্চাটার' 'পুরুখ', 'বৌকা বাওয়া' 'গান্হী বাওয়া', 'তামাম হল্লা', 'বিনা ঘোড়েকা', 'একতিয়ার', 'কিরিয়া করম', 'চুমৌনা', 'রাজা লোগ', 'পরমাৎমা', 'পাকা প্রসাদী', 'করউঁ কাহ মুখ এক প্রশংসা', 'বাই-উখরানো', 'লাট্টুমার রৈলী', 'গাহকীর ভারমার', 'কিরানীবাবু', 'সিনুর', 'মুখিয়ারা', 'ভকত', 'ঝোটাহাররা', 'বরহমভূতবালা', 'ঘরবালী' প্রভৃতি। এই রকম অজস্র স্থানীয় শব্দ এই উপন্যাসে আছে। এই ভাষারীতির দিকে নজর দিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''বিহারের গ্রামাঞ্চল তার সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে এ উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। এ উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে ধুলোমাটির স্পর্শ পাওয়া যায়। আঞ্চলিক উপভাষার শব্দ ব্যবহারে এসেছে স্থানিক রঙ।''[৩৫২]

বাইরের ঘটনার অভিঘাতে আঞ্চলিকতার বাতাবরণে পরিবর্তন আসা যে কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের একটা বিশেষ দিক। এই উপন্যাসটিতে যে সময়কালটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছিল। উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটিতে তার অভিঘাতের প্রসঙ্গও বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে — ''গান্হী বাওয়ার খবরের বেলায়ও হল এই রকমই। এমনি কেউ নামই শোনেনি। ঐ যে সেদিন রাতে বাবুলালের কাছ থেকে শুনল,

তারপর কিছুদিন চলল নিত্যি নূতন খবর। বিলিতি কুমড়োর খোসায় গান্‌হী বাওয়ার মূরত আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোনো ভুল নেই। এখন কি করা যায়? এ রকম করে তো গান্‌হী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। . . . থানে কুমড়োটার পূজো হয়, পান সুপুরি গুড় দিয়ে। . . . সে রাত্রে রেবনগুণীর বাড়িতে ভজনের আসর জমে — যা গ্রামের ইতিহাসে আর কখনও হয় নি। ঢোঁড়াই 'ভকত' গান্‌হী বাওয়ার নাম দেওয়া বটোহীর গান গায়। গুণী তার সঙ্গে তান ধরে। সে রেবনগুণীর সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে গান্‌হী বাওয়ার দৌলতে।''[৩৫৩] ঔপন্যাসিক আরও লিখেছেন — ''তাৎমাটুলির পঞ্চায়তিতে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, আলবৎ উঁচুদরের সন্ন্যাসী গান্‌হী বাওয়া। মুসলমানকেও পিঁয়াজ গোস্ত ছাড়িয়েছে। . . . থানের মতো ঘর-দুয়োর-আঙ্গন 'সাফসুৎরো' রাখতে পারিস তবে না সাধুসন্ত এসে দাঁড়াতে পারে। . . . খালি রবিবারে আঙ্গন সাফ করলেই হবে না। ঝোটহাদেরও একটু 'পাক সাফ' থাকতে হবে। মেয়ে মানুষের জাতটাই এমন। হাজার বলেও ওদের দিয়ে কিছু করাতে পারবে না।''[৩৫৪] শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় — মাসে একদিন স্নান মেয়েদের করতেই হবে। এই গান্‌হী বাওয়া অর্থাৎ গান্ধীজীর খবরে তাৎটুলিতে ব্যাপক আলোড়ন ওঠে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় — ''এর পর নিত্যি নতুন কাণ্ড। আজব আজব খবর গান্‌হী বাওয়ার। . . . প্রকাণ্ড বেলগাছের মগডালের পাতা তিরতির তিরতির করে নড়ছে — তিনটে করে পাতা একসঙ্গে। পাতাগুলোয় কী যেন লেখা লেখার মতই লাগে। ঠিকই গান্‌হী বাওয়ার নাম। জয়, জয় হো! নয়ন সার্থক জীবন সার্থক বাওয়ার আজ। ঢোঁড়াই-এর এত কষ্ট করে আসা সার্থক হয়েছে। জয় হো গান্‌হী বাওয়া। তোমার নামের গুণেই না এত লোক বেলগাছটার ডালে ডালে হুঁকো বেঁধে দিয়ে গিয়েছে। ঐ বেলতলার ধুলো ঢোঁড়াই লাল কাপড়ের খুঁটে করে বেঁধে নিয়ে আসে।''[৩৫৫] শুধু তাই নয় গান্ধীজীর সম্পর্কেও এরা নানা অলৌকিক গল্প ফাঁদে — ''কলির রঘুনাথ মহৎমাজী। তাঁর চেলাদের বলে 'কাংগ্রিস'। . . . মহাৎমাজী আসবেন জিরানিয়ায়। ভূমিকম্পে মুলুকের লোকসান দেখে তার প্রাণ কেঁদেছে। এতবড় 'সন্ত' তিনি যে আঙিনার কোণের সরষে গাছটা পর্যন্ত ঝাঁটা চাপা পড়লে তাঁর প্রাণ

কেঁদে ওঠে। কোথায় থাকেন মহাৎমাজী। — পাক্কী যেখানে শেষ হয়েছে তার থেকেও অনেক দূরে, মুঙ্গের তারাপুর, অযোধ্যাজীর চাইতেও দূরে। পুরুবে ধান-কাটনীর দেশ, গনৌরীর ভাইটা যেখানে কাজ করে, সেই কলকাতা, জিরানিয়া, তাৎমাটুলি, বিসকান্ধা, শোনপুরের মেলা, কুশীজী পার হয়ে গঙ্গাজী পার হয়ে অনেক গাঁ, আর একটা কী যেন খুব ভালো নাম, ভাগলপুর — ভাগলপুর, আর কাঠিহার, আরও কী কী যেন, — এই মুলুকটার ভাল মন্দ দেখাশোনার ভার মহাৎমাজীর উপর। আঙুলের ডগা কেটে গেলে মাথা জানতে পারবে না? তার ব্যথা লাগবে না? তাই মহাৎমাজী আসছেন জিরানিয়াতে।''[৩৫৬]

শুধু 'গান্‌হী বাওয়া' নন, তাঁর চেলা অর্থাৎ কংগ্রেসি ভলেন্টিয়ারদেরও এরা সমীহের চোখে দেখে। তাদের কাছে গান্ধীজীর নির্দেশ সম্বলিত চিঠি এদের আরও আলোড়িত করে তোলে — ''একদিন জিরানিয়া-ফেরৎ একজন বলন্টিয়র ঝোলার ভিতর থেকে বার করে দিল মহাৎমাজীর চিঠি; যে যে 'বোট' দেবে সবার নামে এক-একখান। রামায়ণের হরফের মত লেখা মহাৎমাজীর। . . . ঘরের মধ্যে সাদা বাক্সটাতে প্রণাম করে ঢোঁড়াই চিঠিখানা তার মধ্যে ফেলে। ধন্য হো মহাৎমাজী, ধন্য হো কাংগ্রিসের বলন্টিয়র, যাদের দয়ায় নগণ্য ঢোঁড়াই রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাঠবেড়ালির কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল। দুঃখে তার বুক ফেটে যায়, সে যদি লিখতে জানত তা হলে নিজে হাতে লিখে দিত মহাৎমাজীকে। এই চিঠির মধ্য দিয়ে মুলুকের এক পারের লোক সেই কোথায় অন্য পারের মহাৎমাজীর কাছে কাছে পৌঁছাতে পারছে, এক সঙ্গে, এক সময়। তাৎমাটুলি, জিরানিয়া, বিসকান্ধা, গঞ্জের-বাজার, ঢোঁড়াই, রামপিয়ারী, পিথো সাঁওতাল, বলন্টিয়র, তিলকুমাঝি, মাস্টার সাহেব একই জিনিস চায়। তারা সকলে একই চিঠি দিয়েছে মহাৎমাজীকে। সরকার, হাকিম, পুলিশ, জমিদার, সার্কিল মানিজর, গিধর, কোয়েরি, বাবু-সাহেব, ইনসান আলি বোধ হয় কিরিস্তান সমুয়র, সব তাদের বিরুদ্ধে। জাতের মিল নেই তবু কত কাছে এসে গিয়েছে তারা। . . . রামজীর রাজ্য জুড়ে পলকা সুতোর জাল বুনে চলেছেন তাঁরই অবতার মহাৎমাজী।''[৩৫৭] এভাবে এই উপন্যাসে স্থানিক প্রেক্ষাপটে বাইরের ঘটনার

প্রভাবের বিবরণ দিয়ে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক উপন্যাসের ঔপন্যাসিকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

এভাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলেও এর শ্রেণি নির্ণয়ে সমালোচকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। অনেকেই এই উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে চেয়েছেন; আবার কেউ কেউ উপন্যাসটি আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে মহাকাব্যিক পটভূমির দিকে অগ্রসর হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''. . . সতীনাথের মধ্যে ছিল সেই উচ্চাঙ্গের মানসিকতা, অভিজ্ঞতাকে যা অনাসক্ত জীবন-ভাষ্যের রূপ দিতে পারে। উত্তর-বিহারের এক খণ্ড অঞ্চলকে লেখক ব্যবহার করেছেন তাঁর সমস্ত উপন্যসের ঘটনা ভূমি হিসেবে — রাজনৈতিক, পারিবারিক অথবা আঞ্চলিক এই তিন প্রকার উপন্যাসের কোনো ক্ষেত্রেই ঐ খণ্ড সীমারেখাকে অতিক্রমের প্রয়োজন তাঁর হয় নি। ''[৩৫৮] অধ্যাপক অশুকুমার সিকদার জানিয়েছেন যে, এই উপন্যাসটিতে ঢোঁড়াই-এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিকতার গন্ডী অতিক্রম করে গেছেন — ''. . . জন্মের সামান্যতম গণ্ডি অতিক্রম করে যায় যে ঢোঁড়াই, একদিকে উপন্যাসটি তার আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। অন্যদিকে আঞ্চলিকতার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে নিয়ে এই উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অণু-ভারতবর্ষ, জিরানিয়া বা জীর্ণারণ্য পেয়েছে ব্যাপ্ত ভারতবর্ষের দ্যোতনা।''[৩৫৯] সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'কে সে যুগের উপন্যাসের ক্ষেত্রে নবীন বলে মন্তব্য করে লিখেছেন — ''ঢোঁড়াই চরিত মানসের নবীনত্ব সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের, . . . তাৎমাটুলির মধ্যে দিয়ে, হাটে-মাঠে-ঘাটে দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াইরাম যেন গোটা দেশের হৃদয়ের সঙ্গে অলক্ষ্য বন্ধনে বাঁধা।''[৩৬০] তিনি উপন্যাসটি সম্পর্কে আরও লিখেছেন যে, এখানে আঞ্চলিকতা বাস্তবতার নামান্তর হিসেবে এসে উপন্যাসটিকে জমিয়ে তুলেছে। তবে ইতিহাসের টান প্রবল হয়ে উঠলে যেমন অঞ্চল পিছনে সরে যায়, এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে — ''ঢোঁড়াই চরিত মানসে আঞ্চলিক বা পরিবেশ-ভিত্তিক মাত্রা সর্বত্রই উপন্যাসের বাস্তবতাকে জমিয়ে তুলেছে। তবে তার মধ্যেও কম বেশির ভেদ আছে।

ইতিহাসের টান প্রবল হয়ে উঠলে অঞ্চল পেছনে সরে যায়। ঢোঁড়াই চরিত মানসেও তাই।''[৩৬১]

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর শ্রেণি বিচার প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন — ''তুলসীদাসের রামচরিত মানসের আদলে এটি রচিত : এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এখানে অর্থবহ। রোজা, রোজগার আর রামায়ণ নিয়ে তাৎমাটুলির জীবন। সেই বদ্ধ জীবনে কীভাবে বাইরের স্রোত এল, বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই কীভাবে স্রোতের টানে সীমাবদ্ধ জীবন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো, তা লেখক বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন।''[৩৬২] তবে একথা বললেও তিনি উপন্যাসটির আঞ্চলিকতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন — ''এই উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবেও দেখা যেতে পারে। আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনটি প্রধান উপাদান — অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি, শিল্পগত নির্লিপ্তি। এই তিনটি শর্ত অবশ্য পালনীয়। এইসব উপাদানের সমাবেশ হয়েছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এ। বিহারের গ্রামাঞ্চলকে, গ্রামীণ মানুষকে, তাদের মানসিকতা ও সংস্কারকে লেখক নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন। এই গ্রামজীবন ও মানুষ সম্পর্কে সতীনাথের অভিজ্ঞতা নিশ্ছিদ্র, সহানুভূতি সীমাহীন ও নির্লিপ্তি শিল্প-নিয়ন্ত্রিত। এই উপন্যাসে লেখক আমাদের কাছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতালোক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বিহারের শিক্ষাবর্জিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামের ভীরুচাষি, ক্ষেতমজুর ও মহাজন জোতদার-সম্প্রদায়ের কাছে গান্‌হীবাবা (মহাৎমাজী) নামটি কীভাবে পরিচিত হয়ে উঠল, লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন কীভাবে ভীরু মানুষগুলিকে বদলে দিল, তার জীবনচিত্র এ উপন্যাসে আছে।''[৩৬৩] অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারও উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছেন — ''ঢোঁড়াইতে আঞ্চলিকতাই কথাবস্তু, আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে নিজের ভাষা মিলিয়ে সহজভাবেই সতীনাথ তার বর্ণনা দেন। কখনোই কথাবস্তু বর্ণনায় লেখকের কৌশলী চাল বলে মনে হয় না। 'আঞ্চলিকতা শুধু ভাষার জিনিস নয়, ভাবের জিনিস' — এ সত্য সতীনাথের লেখায় যত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারুর উপন্যাসেই তা বোঝা যায় না।''[৩৬৪]

সমালোচকেরা নিজেদের মত করে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাস সম্পর্কে নিজেদের মতামত দিয়েছেন। আমাদের কাজ ছিল অনুসন্ধান চালিয়ে উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা ধর্মটি খুঁজে বের করা। একথা স্বীকার করে নিতে কোনো দ্বিধা নেই যে, সতীনাথ ভাদুড়ী এই উপন্যাসে বিহারের পূর্ণিয়া (উপন্যাসে যার নাম জিরানিয়া) সংলগ্ন অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলটির সর্বাঙ্গীণ চিত্র যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, বাংলা সাহিত্যের খুব কম উপন্যাসেই তা আছে। ফলে সে অঞ্চলের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণি তাৎমা ও ধাঙড়দের প্রকৃতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, উপভাষার শব্দচয়ন, সে অঞ্চলের উপর বাহিরের শক্তির প্রভাব প্রভৃতি সব কিছুর বিবরণ এখানে উঠে এসেছে। ফলে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসটিকে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে দ্বিরুক্তি করার অবকাশ থাকে না।

বিভূতিভূষণের বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস **‘ইছামতী’** বিশ শতকের প্রথমার্ধের একেবারে শেষে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির জন্য ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে বিভূতিভূষণ মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান। এই পুরস্কার প্রাপ্তি থেকেই মনে হয় ‘ইছামতী’ উপন্যাসটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা উপন্যাসটিকে আর পাঁচটা উপন্যাস থেকে পৃথক করে। আসলে উপন্যাসটি রচনাকালীন সময়ের শতবর্ষ পূর্বের বাংলার নীলচাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পল্লীবাংলার সমাজ জীবনকে নিয়ে লেখা। এখানে কিছুটা হলেও ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের প্রক্ষেপ পড়েছে। আবার ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এখানে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনাও স্থান পেয়েছে। তবে এসবের পাশাপাশি আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবেও এই উপন্যাসটির বিশেষ মূল্য আছে।

বাংলার বুকে আবহমান কাল ধরে বয়ে চলা নদীগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হল ইছামতী। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার পূর্বভাগ দিয়ে বয়ে চলা এই নদীটি চুর্ণী, মাথাভাঙা এবং যমুনার জলস্রোতকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এর যাত্রাপথের কিছু অংশ বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় পড়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার নীল আন্দোলনের ঢেউ কমবেশি সর্বত্র প্রভাব ফেললেও নদীয়া-

যশোরের বিভিন্ন অঞ্চলে তার দাপট বেশি অনুভূত হয়েছিল। বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে এই অঞ্চলের মোল্লাহাটির নীলকুঠি এবং তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিকে গ্রহণ করেছেন। এখানে সমকালের প্রেক্ষিতে ইছামতী-তীরস্থ অঞ্চলটির প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষজনের জীবন-জীবিকাসহ লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকরুচি, লোককথার পাশাপাশি পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, বিশিষ্ট ভাষারীতির মত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলির বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস আছে।

এই উপন্যাসে একই সমান্তরালে দু'টি কাহিনির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় — ১) নীলচাষ ও নীলকুঠি সংক্রান্ত কাহিনি এবং ২) ভবানী বাঁড়ুয্যের সংসারিক জীবন কাহিনি। এই দু'টি কাহিনির মধ্যে নালু পাল অর্থাৎ লালমোহন পালের একটি উপকাহিনিরও অবতারণা করা হয়েছে, যেখানে শৈশব থেকে মামার বাড়ির আশ্রিতা নালু পাল অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে আপন বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের জোরে সেই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী হয়ে উঠেছে; এমনকি একসময় নীলকুঠিটি পর্যন্ত কিনে নিয়েছে। অবশ্য বড়লোক হয়ে উঠলেও নালু বা তার স্ত্রী তুলসীর মধ্যে কোন অহংকার জন্ম নেয় নি, তারা সাধারণ গ্রাম্য মানুষই থেকে গেছে। যাই হোক, মূলকাহিনির মধ্যে প্রথমটির পটভূমি মোল্লাহাটি গ্রামের নীলকুঠি, যেখানে নীলকরদের বড়সাহেব শিপটন এবং ছোটসাহেব ডেভিড্ দোর্দণ্ড প্রতাপে গ্রাম্যচাষিদের উপর ক্ষমতা জাহির করে তাদের নীলচাষের কাজ চালিয়ে যায়। এই দু'জন নীলকরের মধ্যে শিপটন অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির লোক এবং ঐ অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সপ্তাহে তিনদিন নীলকুঠিতে কোর্ট বসিয়ে সে ঐ অঞ্চলের যাবতীয় ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করে। সেই অঞ্চলের মানুষ শিপটনকে সম্ভ্রম ও ভয়ের দৃষ্টিতেও দেখে। অবশ্য তার আপাত রাশভারি চরিত্রের আড়ালে একটি উদার মন আছে, এজন্য সে সহজে কোনো অন্যায় কাজ করে না এবং কোনো অন্যায় হতেও দিতে চায় না। ঘরে ইংরেজ স্ত্রী লেডি শিপটন থাকলেও গ্রাম্য সুন্দরী গয়ামেমকে সে রক্ষিতা করে রাখে। আর ছোটসাহেব ডেভিড্ কিছুটা দিলখোলা মেজাজের লোক। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের গ্রামে কাটানোর ফলে সে গ্রাম্যভাষা এবং গ্রাম্য খাদ্যাভ্যাস আয়ত্ত করে ফেলে। শারীরিক অবয়ব বাদ দিলে তাকে ইংরেজ বলে চেনাও মুশকিল।

তবে আপাত দিলখোলা মেজাজের আড়ালে ডেভিড্ অত্যন্ত নির্মম — দেওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে প্রজাদের জব্দ করার যাবতীয় কুকর্ম সে-ই করে। উপন্যাসে দেওয়ান রাজারাম রায়, সদর আমিন প্রসন্ন চক্রবর্তী, সহিস ভজা মুচি, করিম লেঠেল প্রমুখদের নিয়ে শিপটন ও ডেভিড্ ঐ অঞ্চলে বিস্তৃত তাদের 'নীলের সাম্রাজ্য' চালায়।

এই উপন্যাসের এই কাহিনির শুরুটা হল ১২৭০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজির ১৮৬৩ সাল। এখানে প্রথমে নীলকরদের সচ্ছলতার ছবি দেখানো হয়েছে। দেওয়ান, আমিন, সহিস, পেয়াদা, লাঠিয়ালদের নিয়ে বড়সাহেব শিপটন ও ছোটসাহেব ডেভিড্ মোল্লাহাটি অঞ্চলে যেন একটা 'নীলের সাম্রাজ্য' বিস্তার করে। তাদের দাপটে প্রজারা টু শব্দটি করতে পারে না। ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য মানুষজন নীলকরদের কতটা ভয় করত, সেটা হাটের রাস্তায় বড় সাহেব শিপটনের গাড়ি দেখে নালু পাল ও সতীশ কলুর ধান ক্ষেতে লুকিয়ে পড়া থেকেই বোঝা যায়। এই নীলকরদের বলে বলীয়ান হয়ে তাদের দেওয়ান রাজারাম রায়ও সেই অঞ্চলের ত্রাস হয়ে ওঠে। এরা কতটা দোর্দণ্ডপ্রতাপী ছিল তা নীলচাষ করতে না চাওয়া রাহাতুনপুর গ্রাম জ্বালিয়ে সেখানকার প্রজাদের শায়েস্তা করার ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়। এই দুর্ঘটনাটি কার ইঙ্গিতে সম্পন্ন হয়েছে, সেটা সকলে বুঝতে পারলেও কেউ তা মুখে আনে না, এমনকি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সরজমিনে তদন্তে এসেও কিছু প্রমাণ করতে পারে না। তবে এই উপন্যাসে নীলবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে নীলকুঠির সঙ্কটকেও দেখানো হয়েছে। প্রথমে কুঠিয়ালরা একজোট হয়ে নীলবিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস করে। কৃষকদের নেতা তিতুমীরকে সদলবলে তারা বন্দীও করে। তবে শেষপর্যন্ত নীলকরদের রমরমা থাকে না — রাজারাম দেওয়ানকে বাগ্দী প্রজারা একা পেয়ে সড়কি চালিয়ে হত্যা করে, ছোট সাহেব ডেভিড ও বড় সাহেবের মেম দেশে ফিরে যায়। আর শারীরিক অবসন্নতার কারণেই হোক, বা নীলকুঠির প্রতি মায়াতেই হোক শিপটন মোল্লাহাটিতেই থেকে যায়। তার সেবার দায়িত্ব নেয় গয়ামেম। এই গয়া সেই অঞ্চলের এক বাগ্দী পরিবারের অবিবাহিত কন্যা। তার রূপে অনেকে আকৃষ্ট হলেও শিপটনের ভয়ে কেউ তার কাছে ঘেঁষার সাহস পেত না। বুড়ো আমিন প্রসন্ন চক্রবর্তী তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। গয়াও তাকে একটু-আধটু প্রশ্রয় দিত। তাই মৃত্যুর আগে শিপটন গয়াকে কিছু জমি লিখে দিতে চাইলে প্রসন্ন চক্রবর্তী সবচেয়ে সেরা জমিটিই

তাকে মেপে দেয়। শিপটন সাহেবের মৃত্যুর পর নীলকুঠি বিক্রী হয়ে যায় এবং এর নতুন মালিক হয় নালু পাল ওরফে লালমোহন পাল, যে একসময় হাটে যাবার পথে শিপটনের টমটমের আওয়াজ পেয়ে মালপত্র ফেলে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ত। সে ওখানে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করে।

নীলচাষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই কাহিনিটির পাশাপাশি এই উপন্যাসে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে কেন্দ্র করে আর একটি কাহিনি বিকশিত হয়েছে। সে মোল্লাহাটি গ্রামের চন্দ্র চাটুয্যের ভাগ্নে। বিচিত্র প্রকৃতির ভবানী প্রথম জীবনে সন্ন্যাসীর মতো গৃহত্যাগ করে দেশ-বিদেশের নানা স্থান ঘুরে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে মোল্লাহাটিতে এসে উপস্থিত হলে স্ত্রী জগদম্বার পীড়াপীড়িতে নীলকরের দেওয়ান রাজারাম তার তিন অনূঢ়া ভগ্নী — তিলু, নীলু ও বিলুর সঙ্গে ভবানীর বিয়ে দিয়ে মোল্লাহাটিতেই থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। ধনী শ্যালকের আশ্রয়ে থাকলেও ভবানীকে কখনো কোনো অন্যায় সুযোগ নিতে বা লোভের বশবর্তী হয়ে দুষ্কর্ম করতে দেখা যায় না। সে যুগের তুলনায় অনেকটা বেশি বয়সে স্বামীকে পাওয়ার কারণেই হয়ত প্রৌঢ় ভবানীকে পেয়ে তিলু, বিলু ও নীলু তিন বোনই খুব খুশিতে থাকে। তিন স্ত্রীর মধ্যে তিলুর প্রতি ভবানীর কিছুটা বেশি পক্ষপাতিত্ব ছিল। এটা তার অন্য দুই স্ত্রী জানলেও এতে তারা মোটেই অসন্তুষ্ট ছিল না। শুধু পরিবারে নয়, আপন বহুদর্শিতা, উদারতা, মধুর ও আন্তরিক ব্যবহারের মতো নানা চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে ভবানী গ্রামসমাজে একটা সম্ভ্রমের আসন তৈরি করে নেয়। গ্রামস্থ কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে মহিলা মহল পর্যন্ত সকলেই তাকে আপন করে নেয়। সে-ও যেন মোল্লাহাটির মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। ক্রমে সস্ত্রীক ভবানী গ্রামের প্রান্তে পড়ে থাকা স্বধর্মনিষ্ঠ অর্ধশিক্ষিত রামকানাই কবিরাজ, খেপী সন্ন্যাসিনী, সাধারণ অবস্থা থেকে ধনী হয়ে ওঠা নালু পাল, গ্রামসামজের বিধিনিষেধ না মেনে চলা নিস্তারিণী, কুসুম প্রমুখের মতো মোল্লাহাটি গ্রামের সকল নারী-পুরুষের আপনজন হয়ে ওঠে। এমনকী দুর্ধর্ষ ডাকাত হলা পেকে-কেও তিলু-ভবানী আপন করে নেয় এবং সেও তাদের বশ্যতা স্বীকার করে। গ্রাম্য দলাদলি তাদের ছুঁতে পারে না — গ্রামস্থ সকলের ঘর থেকেই তাদের কাছে আমন্ত্রণ আসে, গ্রামের লোকেরা তীর্থ যাত্রার বাসনা পোষণ করলে পথপ্রদর্শক পরীক্ষার দায়িত্ব ভবানীর উপর পড়ে, নালু পাল তীর্থযাত্রী দলটিকে

ভোজন করিয়ে পুণ্য অর্জন করতে চাইলে সেই তদারকির ভার পড়ে তিলু ও ভবানীর উপর। অধ্যাত্ম সাধনা ভবানী চরিত্রের আর একটি দিক। সারাজীবন সে ঈশ্বরের সন্ধান চালিয়েছে। তিলুর গর্ভে তার সন্তান খোকন জন্ম নিলে খোকনকে দেখে এবং তার সঙ্গে সময় কাটিয়ে ভবানীর এই আধ্যাত্মিকতার দিকটি যেন পূর্ণতা পায়। এইসময় বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা এবং রেলগাড়ির মত যানবাহন চালু হয়ে গেছে। বিলুর মৃত্যুর পর ভবানী, তিলু ও নীলুর পরিকল্পনায় বুদ্ধিমান খোকনের ইংরেজি পড়ানোর ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসে ভবানী বাঁড়ুয্যের কাহিনি শেষ হয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা আর্থ-সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় লেখা বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাসটি আসলে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সামাজিক আখ্যান। এখানে ইছামতী তীরস্থ বাংলার গ্রামজীবনের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা এককালের বাংলার সামগ্রিক গ্রামজীবনের বাস্তবচিত্র বলেই গণ্য হত। এই উপন্যাসের মোল্লাহাটির নীলকুঠি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল যেন সমগ্র বাংলার গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই নিরিখে বলা যায় যে, সেই অর্থে 'ইছামতী' উপন্যাসে আঞ্চলিকতা নেই। তবুও এখানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি থেকে উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণ স্পষ্ট হয়। ফলে উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতার আলোচনায় ঢুকে যায়। এই আলোচনায় ঢোকার সময় 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে 'ইছামতী' উপন্যাস সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাশ যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণে রাখতে হয় — ''ইছামতী নদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষের জীবনকথা এই উপন্যাসের মূলজীব্য। কাহিনীর কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক চরিত্র, ঘটনা অথবা রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা এখানে নেই। সাধারণ মানুষ, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ সচরাচর প্রচলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিবাদী আখ্যান রচনা করেছেন।''[৩৬৫]

এই উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণগুলির কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এর বিজ্ঞাপন অংশটির দিকে নজর দিতে হয়। সেখানে বলা হয়েছ — ''ইছামতী কি আগে ইচ্ছামতী ছিল? স্বপ্ন-কল্পনায় মেশা এই নদী। বিভূতিভূষণও এই নদীর কাকচক্ষু জলে স্নান করতে করতে বোধ করি সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন।

আজ যে নদী দেখছেন কোথাও কোথাও — কচুরিপানায় বুজে যাওয়া সে ইছামতী নয় — স্নিগ্ধ শান্ত স্বপ্নিল নদী যার দুই কূল আচ্ছন্ন করে থাকত বাঁশ-ঝাড় আর অসংখ্য পত্রবহুল ছায়া-ঘন পাছপালা। এইখানে নদীজলে গা ডুবিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন গত একশ বছরে কত মানুষের জীবন সার্থক সফল হয়েছে; কত জীবন হয়েছে ব্যর্থ, কত হাসি কান্না, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র উপল। সেই স্বপ্নেরই ফল এই 'ইছামতী' উপন্যাস।''[৩৬৬] এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই' উপন্যাসটির আখ্যান হল একমাত্র ইছামতী তীরস্থ অঞ্চলটিরই আখ্যান; অন্য কোনো অঞ্চলে এই আখ্যানটি নির্মাণ করা সম্ভব নয়। উপন্যাসটির সূচনাতেও ঔপন্যাসিক ঐ অঞ্চলটির কথা বলেছেন —

''ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্ততঃ যশোর মধ্য দিয়ে যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙ্গর সংকুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুন্দরবনে সুঁদরি গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েচে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোন লোকই রাখে না।

ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, সে অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েচেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করচেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।''[৩৬৭] উপন্যাসের প্রায় সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে ইছামতী তীরস্থ নদীয়া-যশোর সীমান্তের মোল্লাহাটির নীলকুঠি ও তৎসলগ্ন গ্রামগুলিতে, যার মধ্যে পাঁচপোতা, রাহাতুনপুর প্রভৃতি গ্রামও পড়ে। প্রকৃতি প্রেমিক ঔপন্যাসিক সময়-সুযোগ পেলেই এখানে ইছামতী নদী ও তার দুই তীরের বর্ণনা দিয়েছেন। পাশাপাশি ইছামতী তীরস্থ মোল্লাহাটি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন কৃষিপ্রধান অঞ্চলটির প্রকৃতির বর্ণনাও দিয়েছেন। ঐ অঞ্চলটির বিবরণে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন — ''ভবানী বাঁড়ুয্যে দেড় বছরের মধ্যেই এ গ্রামকে, এ অঞ্চলকে বড় ভালোবাসলেন। এমন ছায়াবহুল দেশ তিনি কোথাও দেখেন নি জীবনে। বৈঁচি, বাঁশ, নিম, সোঁদাল, রড়া, কঁচুলতার বনঝোপ। দিনে রাতে শালিখ, দোয়েল, ছাতারে আর বৌ-কথা-ক পাখির কাকলী। ঋতুতে

ঋতুতে কত কি বনফুলের সমাবেশ। কোনো মাসেই ফুল বাদ যায় না — বনে বনে ধুন্দুলের ফুল, রাধালতার ফুল, কেয়া, বিল্বপুষ্প, আমের বউল, সুঁয়ো, বনচট্‌কা, নাটা-কাঁটার ফুল।''[৩৬৮] এই অঞ্চলটিকে পটভূমি করেই দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকটি লিখেছিলেন। তবে বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসটি না লিখলে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র এই অঞ্চলটির সামগ্রিক পরিচয় আমরা পেতাম না। তিনি এই উপন্যাসে শুধু ঐ অঞ্চলটিকেই তুলে আনেন নি; সেইসঙ্গে সেখানকার 'আঞ্চলিক রঙ'কেও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই উপন্যাসে একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামসমাজের কথা আছে। প্রধান চরিত্রদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। যেমন, ভবানী বাঁড়ুয্যে, তার তিন স্ত্রী — তিলু, বিলু এবং নীলু, দেওয়ান রাজারাম রায় ও তার স্ত্রী জগদম্বা, চন্দ্র চাটুয্যে, ফণী চক্কত্তি, কবিরাজ রামকানাই চক্রবর্তী, প্রসন্ন চক্রবর্তী প্রমুখ। এরা সবাই উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। এদের মধ্যে একমাত্র ভবানী বাঁড়ুয্যে বাদে সবাই ঐ অঞ্চলটিরই সন্তান, এমনকি প্রসন্ন চক্রবর্তী আমিন বাদে কারোরই বাইরের জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এরা ছাড়াও এই উপন্যাসে সেই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের কামার, কুমোর, কলু, নাপিত, হাড়ি, ডোম, মুচি, বাগদি, কাওড়া, বুনো, জেলের মত শূদ্র সম্প্রদায়ের তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষ এবং কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের উল্লেখ আছে। যেমন, নালু পাল, সতীশ কলু, ঈশ্বর নাপিত, হরি নাপিত, অঘোর মুচি, রাম বাগদি, ডাকাত হলা পেকে, অক্রূর জেলে, নরহরি পেশকার, তিনকড়ি, নীলমণি সমাদ্দার, নবু গাজি, দবিরুদ্দি-র মতো বিভিন্ন বৃত্তির অজস্র মানুষের উপস্থিতি এই উপন্যাসে আছে। এদের পাশাপাশি গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে বেশ কিছু উচ্চ ও নিম্নবর্ণের নারী। যেমন, নিস্তারিণী, বিরাজমোহিনী, বাগদি কন্যা গয়া মেম ও তার মা, নালু পালের স্ত্রী তুলসী ও তার ননদ, যতীনের বৌ প্রমুখ। এছাড়া বড়সাহেব শিপ্‌টন ও তার মেম, ছোট সাহেব ডেভিড্‌, ডাঙ্কিন প্রমুখ ইংরেজের উপস্থিতিও এই উপন্যাসে আছে। ইংল্যান্ড থেকে এলেও এরা অনেকটাই সেই অঞ্চলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল — ''সাহেবেরা ছোট-হাজারি খেলে বড় অদ্ভুত ধরনের। এক এক কাঁসি পান্তা ভাত এক ডজন লেবুর রস মেখে। রাত্রের টেবিলের ঠাণ্ডা হ্যাম। একটা

করে আস্ত শসা জন পিছু। চার-পাঁচটা করে খয়রা মাছ সর্ষের তেলে ভেজে। বহুদিন বাংলা দেশের গ্রামে থাকবার ফলে ওদের সকলেরও আহারবিহার এ দেশের গ্রাম্য লোকের মত হয়ে গিয়েচে। ওরা আম-কাঁটালের রস দিয়ে ভাত মেখে খায়। অনেকে হুঁকোয় তামাক খায়।''[৩৬৯] তাই বলা যায় যে, এই উপন্যসের প্রায় সব চরিত্রই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে; অন্যত্র এরা তেমনভাবে খাপ খাওয়াতে পারবে না।

উপন্যাসে গৃহীত মানুষগুলির জীবন পরিক্রমার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাদের জীবিকার বিবরণও এই উপন্যাসে দিয়েছেন। গ্রামের ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''পাঁচপোতা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার কেউই চাকরি করেন না। কিছু না কিছু জমি জমা সকলেরই আছে। সন্ধ্যার পর নিজ নিজ চন্ডীমন্ডপে পাশা-দাবার আড্ডায় রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাটানো এঁদের দৈনন্দিন অভ্যাস।''[৩৭০] চন্ডীমণ্ডপ এই গ্রামের মানুষগুলির জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ — ''চন্ডীমণ্ডপ হচ্ছে পল্লীগ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিষ্কর্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের দল জুটে কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা (তাসের প্রচলন এ সব পাড়া গাঁয়ে আদৌ নেই, ওটা বিলিতি খেলা বলে গণ্য) চালে। প্রত্যেক গৃহস্থের একখানা করে চন্ডীমণ্ডপ আছে। সকাল থেকে সেখানে আড্ডা বসে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের চন্ডীমণ্ডপে আড্ডা জোর বসে থাকে, কারণ সারাদিনে অন্ততঃ আধসের তামাক যোগাবার ক্ষমতা সব গৃহস্থের নেই।''[৩৭১] ঔপন্যাসিক ব্রাহ্মণদের জীবন পরিক্রমার বিবরণে এখানে ক্ষান্ত দেন নি। তিনি এদের সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন — ''এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা দাবা খেলে। জীবনসংগ্রাম এদের অজ্ঞাত, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম কাঠালের বাগান আছে, লাউ কুমড়োর মাচা আছে, আজ মাছ ধারে কিনে গ্রামের জেলেদের কাছে, দু'মাস পরে দাম দেওয়াই বিধি। সুতরাং ভাবনা কিসের? গ্রাম্য কলু ধারে তেল দিয়ে যায় বাখারির গায়ে দাগ কেটে। সেই বাখারির দাগ গুণে মাসকাবারির দাম শোধ হয়। এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবনযাত্রা, সেখানে অবকাশ যাপনের এই সব অলস ধারাই লোক বেছে নিয়েছে।''[৩৭২] চন্ডীমণ্ডপেই এই

নিষ্কর্মা ব্রাহ্মণগুলির দিনের শুরু হয়, আর এখানেই শেষ হয়। সেখানে পরনিন্দা-পরচর্চা থেকে শুরু করে নানারূপ আলাপ আলোচনা হলেও বাইরের জগৎ সম্পর্কে এই অলস, কর্মবিমুখ, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানগুলির তেমন কোনো জ্ঞানই নেই। তাদের চন্ডীমণ্ডপীয় আলোচনায় উঠে আসে — '' . . . সাহেবদের দেশে নাকি কলের গাড়ি উঠেচে। কলে চলে। কাগজে ছাপা করা ছবি নাকি সে দেখে এসেচে! . . .কালে কালে কতই দেখবো। আবার শুনেচ খুড়ো, মেটে তেল বলে একরকম তেল উঠেচে, পিদিমে জ্বলে। . . . বলে কলির কেতা, কলকেতা। আমাদের সর্ষে তেলই ভালো, রেড়ির তেলই ভালো, মেটে তেল, কাঠের তেলে আর দরকার নেই বাবাজি।''[৩৭৩] তীর্থদর্শন করতে গেলে এদের পথপ্রদর্শক হিসেবে ঈশ্বর বোষ্টমকে সঙ্গে নিতে হয়। অবশ্য ভবানী বাঁড়ুয্যের জীবনযাপন প্রণালী এদের সঙ্গে মেলে না, সে বহুদর্শী ব্যক্তি। এজন্য ঈশ্বর বোষ্টমকে পরীক্ষা করার দায়িত্ব তার উপরেই বর্তায়। উপন্যাসে ভবানী বাঁড়ুয্যে তার জীবন পরিক্রমা এই মূর্খ ব্রাহ্মণদের চন্ডীমন্ডপীয় আড্ডায় সীমাবদ্ধ না রেখে কখনো নিজের বাড়িতে, কখনো ইছামতীর নির্জন তীরে, কখনো খেপী সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে, আবার কখনো বা স্বধর্মনিষ্ঠ রামকানাই কবিরাজের সঙ্গে ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তা ও আলোচনায় মগ্ন রাখে।

তবে ব্রাহ্মণেরা তেমন কোনো কাজকর্ম না করলেও দেওয়ান রাজারামের নিরলস প্রচেষ্টায় বড়সাহেব শিপ্টন এবং ছোটসাহেব ডেভিড্-এর তত্ত্বাবধানে মোল্লাহাটি নীলকুঠির কাজ কিন্তু চলতেই থাকে। ঔপন্যাসিক শিপ্টনের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন — ''মোল্লাহাটির নীলকুঠির বড় সাহেব শিপ্টনকে এ অঞ্চলে বাঘের মত ভয় করে লোকে। লম্বাচওড়া চেহারা, বাঘের মত গোল মুখখানা, হাতে সর্বদাই চাবুক থাকে। এ অঞ্চলের লোক চাবুকের নাম রেখেছে 'শ্যামচাঁদ'। কখন কার পিঠে 'শ্যামচাঁদ' অবতীর্ণ হবে তার কোন স্থিরতা না থাকায় সাহেব রাস্তায় বেরুলে সবাই ভয়ে সন্ত্রস্থ থাকে।''[৩৭৪] আর দেওয়ান রাজারাম সম্পর্কে জানিয়েছেন — ''রায় মশায়ের পুরো নাম রাজারাম রায়। মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবের খয়েরখাই ও প্রজাপীড়নের জন্য এদেশের লোকে যেমন ভয় করে, তেমনি ঘৃণা করে। কিন্তু মুখে কারো কিছু বলার সাহস নেই। নিকটবর্তী পাঁচপোতা গ্রামে বাড়ি।''[৩৭৫] কুঠিতে

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এলে তার খাতির-যত্ন থেকে শুরু করে নীলের জমি চিহ্নিত করা, চাষিদের দাদন দেওয়া, কেউ নীলচাষে রাজি না হলে তাকে জব্দ করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই দেওয়ান রাজারাম, প্রসন্ন চক্রবর্তী আমিন, রসিক বাগ্‌দি লাঠিয়াল প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে সুনিপুণ দক্ষতায় করে যায়। তার এসব কাজের ফিরিস্তি দিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''কুঠিতে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর আসবেন। দেওয়ান রাজারাম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন আজ সকাল থেকে। ভেড়া, মাছ, ভালো আম ও ঘি যোগাড় করবার ভার তাঁর ওপর। মাঝে মাঝে এ রকম লেগেই আছে, সাহেবসুবো অতিথি যাতায়াত করচে মাসে দু'বার তিনবার।''[৩৭৬] মুসলিমপ্রধান গ্রাম রাহাতুনপুরের চাষিরা নীলচাষ করতে না চাইলে গ্রামটি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে — ''রাত্রে রাহাতুনপুর গ্রাম একেবারে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। বড় বড় চাষিদের গ্রাম, কারো বাড়ি বিশ-ত্রিশটা পর্যন্ত ধানের গোলা ছিল — আর ছিল ছ'চালা আটচালা ঘর, সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। কিভাবে আগুন লেগেছিল কেউ জানে না, তবে সন্ধ্যারাত্রে ছোট সাহেব এবং দেওয়ানজি রাহাতুনপুরের মোড়লের বাড়ি গিয়েছিলেন; সেখানে প্রজাদের ডাকিয়ে নীল বুনবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। তারা রাজী হয় নি। ওঁরা ফিরে আসে রাত এগারোটার পর। শেষরাত্রে গ্রামসুদ্ধ আগুন লেগে ছাইয়ের ঢিবিতে পরিণত হয়েচে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সকলে সন্দেহ করচে।''[৩৭৭] নীলকুঠীর কাজকর্মের পাশাপাশি এই উপন্যাসে নালু পাল, অঘোর মুচি, অক্রূর জেলে, দীনু মুচিদের মতো নিম্নবর্ণের মানুষগুলির নানা বৃত্তির উল্লেখ আছে। আপন পরিশ্রমের জোরে ব্যবসা করে নালু পাল ও সতীশ কলু সে অঞ্চলের ধনী হয়ে ওঠে; এমনকি একসময় মোল্লাহাটির নীলকুঠিটি কিনে নিয়ে জমিদার হয়ে যায়। ঐ অঞ্চলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে টাকা-পয়সার প্রচলন থাকলেও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত কড়ি। এ প্রসঙ্গে নালু পালের দোকানের বেচাকেনার বর্ণনা উল্লেখ করা যায় — ''দোকানে ওর বড় ভিড় জমে গেল। কড়ির খদ্দের বেশি, পয়সার কম। টাকা ভাঙাতে এলোনা একজনও। কেউ টাকা বার করলে না।''[৩৭৮] ঐ অঞ্চলের চোর-ডাকাতদের উৎপাতের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক হলা পেকে ও অঘোর মুচির নানা দুঃসাহসিক চুরি-ডাকাতির বিবরণ দিয়েছেন।

এই উপন্যাসে গৃহীত ইছামতী নদী তীরস্থ মোল্লাহাটী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলটির মানুষগুলির ধর্মবিশ্বাসের পরিচয়ও আছে। এখানে মুসলিম সমাজের কিছু মানুষের উল্লেখ থাকলেও হিন্দুধর্মের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তখনও ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে কৌলিন্য প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল। দেওয়ান রাজারাম রায় ধনী ব্রাহ্মণ হলেও তার তিন বোন তিলু, বিলু ও নীলু বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলেও অনূঢ়া ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে তিন বোনের বিয়ের কথা উত্থাপিত হলে বড়বোন তিলুর মনোভাবের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''তিলু কত রাত পর্যন্ত ছাদে বসে ভাবলে। ত্রিশ বছর তার বয়স হয়েচে। স্বামীর মুখ দেখা ছিল অস্বপনের স্বপন। এখনো বিশ্বাস হয় না; সত্যিই তার বিয়ে হবে? স্বামীর ঘরে সে যাবে? বোনেদের সঙ্গে, তাই কি? ঘরে ঘরে তো এমনি হচ্চে। চন্দ্রকাকার বাপের সতেরোটা বিয়ে ছিল। কুলীন ঘরে অমন হয়েই থাকে। বিয়ের দিন কবে ঠিক করেচে দাদা কে জানে। বরের বয়স পঞ্চাশ তাই কি, সে নিজে কি আর খুকি আছে এখন?''[৩৭৯] অবশ্য বিয়ের অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ এই উপন্যাসে নেই। তবে ভবানী বাঁড়ুয্যে ও তিলুর সন্তান খোকার অন্নপ্রাশনের বর্ণনা এখানে আছে — ''ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে কোলে নিয়ে পাড়া প্রদক্ষিণ করতে চললেন, পেছনে পেছনে স্বয়ং রাজারাম চললেন ফুল আর খই ছড়াতে ছড়াতে। দীনু মুচি ঢোল বাজাতে বাজাতে চললো। বাঁশি বাজাতে বাজাতে চললো তার ছেলে। রায়পাড়া, ঘোষপাড়া ও পুবেরপাড়া ঘুরে এলেন ভবানী বাঁড়ুয্যে অতটুকু শিশুকে কোলে করে নিয়ে। বাড়ি বাড়ি শাঁখ বাজতে লাগলো। মেয়েরা ঝুঁকে দেখতে এলো খোকাকে।''[৩৮০] এই উপন্যাসে খোকার জন্মতিথি পালন এবং সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে মানুষকে খাওয়ানোর প্রসঙ্গও আছে। এসবের পাশাপাশি ব্রাহ্মণদের তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে এবং তীর্থযাত্রা করে ফিরে আসার পর তাদের উৎকৃষ্ট ফলাহার করে নালু পালের তীর্থভ্রমণের পুণ্য করার কথাও এখানে আছে। তবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষগুলির ধর্মাচরণের পার্থক্য ছিল। নিম্ন বর্ণের খেপি সন্ন্যাসিনীর আশ্রম সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''মূর্তি নেই, ত্রিশুল বসানো সিঁদুরলেপা একটা উঁচু জায়গা আছে গাছতলায়, আসন বলা হয় তাকেই। ভবানী বাঁড়ুয্যে একমনে বসে থাকবার পরে সন্ন্যিসিনী সেখানে এসে বসলো তাঁর পাশেই। সন্নিসিনীর রং কালো, বয়েস

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, মুখশ্রী তাড়কা রাক্ষসীকে লজ্জা দেয়, মাথার দু'দিক থেকে দু'টি লম্বা জট এসে কোলের উপর পড়েছে।''[৩৮১] ব্রাহ্মণেরা এদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলত। তাই তারা ভবানী বাঁড়ুয্যেকে পরমর্শ দেয় — ''ও সব জায়গায় ব্রাহ্মণের গেলে মান থাকে না। শুনিচি সে মাগী নাকি জাতে বুনো। তুমিও বাবাজি সেখানে আর যেও না।''[৩৮২] এই ব্রাহ্মণেরা ধনী নালু পালের বাড়িতে দুর্গা পূজার প্রসাদ নিতে যেতে অস্বীকার করে। অবশ্য ভবানী বাঁড়ুয্যে এসব সংকীর্ণতার মধ্যে থাকে নি।

উপন্যাসে গ্রাম্য লোকাচার-লোকসংস্কৃতির বিবরণ প্রসঙ্গে 'তেরের পালুনি' অনুষ্ঠানের কথা আছে। ভাদ্র মাসের তেরো তারিখে ইছামতীর ধারে পাঁচপোতা গ্রামের বৌ-ঝিদের বনভোজনের উৎসব হল 'তেরের পালুনি' — ''মেয়েরা পাড়া হিসেবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বনভোজনের আয়োজন করচে। এখানে আর রান্না হয় না, বাড়ি বাড়ি যার যার যেমন সঙ্গতি — খাবার জিনিস নিয়ে এসে কলার পাতা পেতে খেতে বসে, মেয়েরা ছড়া কাটে, গান গায়, উলু দেয়, শাঁখ বাজায়। এই বনভোজনের একটি চিরাচরিত প্রথা এই, তুমি সম্পন্ন গৃহস্থঘরের বৌ, তুমি ভালো জিনিস এনেচ খাবার জন্যে — যারা দারিদ্র্যের জন্য তেমন কিছু আনতে পারে নি , তাদের তুমি ভাগ করে দেবে নিজের আনা ভালো খাবার। এ কেউ বলে দেয় না, কেউ বাধ্যও করে না — এ একটি অলিখিত গ্রাম্য প্রথা বরাবর চলে আসচে এবং সবাই মেনেও এসেচে।''[৩৮৩] এই পরব উপলক্ষে গ্রামের বৌ-ঝিরা হাসি, ইয়ার্কি, ঠাট্টা, তামাসায় এক আনন্দমুখর দিন কাটায়। কেউ কেউ গান, ছড়া প্রভৃতির মাধ্যমে আসর জমিয়ে তোলে। যেমন ফণি চক্কোত্তির বিধবা বোন বিধূ সেই অঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়া হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করে —

''আজ বলেচে যেতে
পান সুপুরি খেতে
পাতের ভেতর মৌরি-বাটা
ইস্কে বিস্কে ছবি আঁটা
কলকেতার মাথা ঘষা
মেদিনীপুরের চিরুনি

এমন খোঁপা বেঁধে দেবো
চাঁপা ফুলের গাঁথুনি
আমার নাম সরোবালা
গলায় দিব ফুলের মাল — ''[৩৮৪]

এই পরবের মধ্য থেকে ঐ অঞ্চলের লোকাচার এবং লোকসংস্কৃতির ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে মোল্লাহাটি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষজনের ঘরবাড়ি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনাও আছে। ঘরবাড়ির পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, সেখানকার অধিকাংশ মানুষই ছিলেন গরীব; তাদের বাড়ি হত মাটির চারচালা বা ছয়চালা। একমাত্র বড়োলোকেরাই আটচালা ঘর বানায় — ''আটচালা ঘর তৈরি করা এ সব পাড়াগাঁয়ে বড়মানিষির লক্ষণ, আর চরম বড়মানুষি অবিশ্যি দুর্গোৎসব করা!''[৩৮৫] অবশ্য প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতে চন্ডীমন্ডপ থাকত। এই উপন্যাসে ফণি চক্কত্তির চন্ডীমন্ডপের বিবরণে লেখা হয়েছে — ''ফণি চক্কত্তির সেকেলে চন্ডীমন্ডপ। একটা বাহাদুরি কাঠের খুঁটির গায়ে খোদাইকরা লেখা আছে — ''শ্রীশিবসত্য চক্কবর্তী কর্তৃক সন ১১৭২ সালে মাধব ঘরামি ও অক্রূর ঘরামি তৈরি করিল এই চন্ডীমন্ডপ ইহা ঠাকুরের ঘর ইহা জানিবা'' — সুতরাং চন্ডীমন্ডপের বয়স প্রায় একশত বছর হতে চলেচে। অনেক দূর থেকে লোকে এই চন্ডীমন্ডপ দেখতে আসে। খড়ের চাঁচ ও পাট, রলা ও সলা বাখারির কাচ, ছাঁচপড়নের বাঁশের কাজ, মটকায় দুই লড়ায়ে পায়রায় খড়ের তৈরী ছবি দেখে লোকে তারিফ করে। এমন কাজ এখন নাকি প্রায় লুপ্ত হতে বসেচে এদেশে।''[৩৮৬] ঐ অঞ্চলের মানুষদের খাদ্যতালিকায় নানা ধরনের জিনিস স্থান পেত। ভাত, মুড়ির চল বেশি ছিল, বিভিন্ন প্রকার গ্রাম্য তরি-তরকারি তো ছিলই, সঙ্গে ছিল ইছামতীর মাছ; খয়রা মাছের উল্লেখ উপন্যাসে বেশ কয়েকবার আছে। এদের খাদ্য তালিকায় নানাপ্রকার ফলও ছিল; ফলের মধ্যে কাঁঠালের উল্লেখ অনেকবার আছে। সন্ধ্যে বেলা দেওয়ান রাজারামের খাদ্যতালিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — ''তিলু একটা কাঁসার জামবাটিতে মুড়ি ও ছোলাভাজা সর্ষের তেল দিয়ে জবজবে করে মেখে নিয়ে এলো — সে জামবাটিতে

অন্তত আধ কাটা মুড়ি ধরে। বিলু নিয়ে এলো একঘটি জল ও একটা পাথরের বাটিতে আধ পোয়াটাক খেজুর গুড়।''[৩৮৭] ভবানী বাঁড়ুয্যে ও তিলুর সন্তান খোকার অন্নপ্রাশনের খাওয়া-দাওয়ার বর্ণনায় লেখা হয়েছে — ''ব্রাহ্মণভোজনের সময় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা হতে লাগলো। কে কত কলাইয়ের ডাল খেতে পারে। কে কত মাছ খেতে পারে। মিষ্টি শুধু নারকোল নাড়ু। খেতে বসে অনেকে বললেন এমন নারকোলের নাড়ু তারা অনেককাল খান নি। অন্য কোন মিষ্টির রেওয়াজ ছিল না দেশে। এক একজন সাত আট গণ্ডা নারকোলের নাড়ু, আরো অতগুলো অন্নপ্রাশনের জন্য ভাজা আনন্দনাড়ু উড়িয়ে দিলে অনায়াসে।''[৩৮৮] লুচি-চিনি সেই অঞ্চলে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার বলে গণ্য হত। এর সঙ্গে ঐ অঞ্চলের মানুষজনের পরিচয় খুব কম হত। নালু পাল তার বাড়ির দুর্গোৎসবে লুচি-চিনি খাইয়েছিল।

ঔপন্যাসিক যশোর অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপ দিয়েই চরিত্রদের সংলাপগুলি রচনা করেছেন। এই ভাষা সম্পর্কে ভবানী বাঁড়ুয্যের প্রথম দিককার অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''তিলুর কথার সুরে যশোর জেলার গ্রাম্য টানগুলি ভবানী বাঁড়ুয্যের এত মিষ্টি লাগে! তিনি নিজে নদীয়া জেলার লোক, সেখানকার বাংলার উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী সুমার্জিত। এদেশে এসে প্রথম শুনলেন এ ধরনের কথা।''[৩৮৯] এই উপন্যাসে যশোরের আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্যে গ্রাম্য মানুষগুলির মুখে 'এ'-কারের স্থানে 'ই'-কারের বহুল প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, 'মুগির ডালি,' 'ঘি দিলি ক্ষীরি তার হয়', 'শিবির মাটি', 'পুবির ঘর', 'বাড়িতি থাকবে', 'কৃপা হলি', 'বলতি বলতি', 'রাত্তিরি খাবেন', 'ওদের জন্যি, 'করতি পারে', 'শুনিচি', 'যেতি হবে', 'কথা শুনলি' প্রভৃতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস 'ইছামতী'তে আঞ্চলিক উপন্যাসে এত সব বৈশিষ্ট্য থাকলেও উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয় নি। সত্যিকথা বলতে কি আঞ্চলিক উপন্যাসে সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে যে 'আঞ্চলিক রঙ' উঠে আসে তার পুরো ছবি এই উপন্যাসে নেই। এই উপন্যাসে মোল্লাহাটির নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে যে কাহিনিটি পরিবেশিত হয়েছে, বাংলায় নীলচাষের রমরমার

সময়ে যে কোনো অঞ্চলেই সেরূপ কাহিনি গড়ে ওঠা সম্ভব। আর পাঁচপোতা গ্রামের কাহিনিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ভবানী বাঁড়ুয্যে এবং তার পরিবার; এরা উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। উপন্যাসটির নায়করূপে চিত্রিত হয়েছে যে মানুষটি অর্থাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যে আদতে বহিরাগত; ঐ অঞ্চলের সন্তান নন। এখানকার গ্রামসমাজটি সমকালের যে কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম সমাজেরই একটি প্রতিনিধি বলে মনে হয়। উপন্যাসে গ্রামাঞ্চলটির সর্বাঙ্গীণ চিত্র রচনার পাশাপাশি ভবানী বাঁড়ুয্যের ঈশ্বর অনুসন্ধানও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে বিভূতিভূষণের মানসিকতা সম্পর্কে অধ্যাপক-সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''তাঁর শেষ বড়ো উপন্যাস 'ইছামতী' (১৯৫০)-তেও বিমুগ্ধ প্রকৃতিদৃষ্টি, ঈশ্বরবিশ্বাস ও দরিদ্রজীবনপ্রীতি উপস্থিত।''[৩৯০] এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনেরও কিছু প্রক্ষেপ পড়েছে। তাই এই উপন্যাসের শ্রেণি নির্ণয় করতে গেলে অনেক কিছুই উঠে আসে। ইতিহাসের আশ্রয়ে সামাজিক উপন্যাস, অধ্যাত্মপ্রেমমূলক উপন্যাস, আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস প্রভৃতি শ্রেণি বিভাগগুলির কথা মাথায় আসে। আর এসব থেকে মনে হয় যে, 'ইছামতী' উপন্যাসটি আদৌ বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় আসে না।

তবে উপন্যাসটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এর মধ্যে আঞ্চলিকতার অনেক উপকরণকেই খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচনায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাতেও তার ইঙ্গিত আছে — ''বিভূতিভূষণ ইতিহাস সচেতন শিল্পী নন, পরিবর্তমান কালের নানা তরঙ্গবিক্ষোভের শিল্পী নন, যুগবিক্ষোভ বা বাস্তবতার রূপকার নন। সুতরাং 'ইছামতী'তে তার অন্বেষণে লাভ নেই। প্রকৃতিপ্রেমিক, দরিদ্র সংসারপ্রেমিক, ঈশ্বরবিশ্বাসী বিভূতিভূষণের পরিচয়ই 'ইছামতী'তে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি সাধারণ গরীব মানুষের সুখদুঃখের ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। তা তিনি পেরেছেন।''[৩৯১] সত্যি সত্যিই 'ইছামতী' উপন্যাসে গরীব মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সেটা উঠে এসেছে মূলত যশোরে ইছামতী তীরস্থ মোল্লাহাটির নীলকুঠি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলটির প্রেক্ষাপটেই। উপন্যাসটি বিজ্ঞাপনেও লেখা হয়েছে — ''ইচ্ছা ছিল এক শতাব্দীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন, মানুষের দৃষ্টি, তার জীবন-স্বপ্নের বিকৃতি, এর পূর্ণ চিত্র

রেখে যাবেন — হয়তো লিখবেন আরও দু'তিনটি উপন্যাস এই ইছামতীকে অবলম্বন করে কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে তা সম্পূর্ণ হল না।''[৩৯২] হয়তো আরও দু'একটি খণ্ড লিখলে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রকৃতি এবং মানুষজনের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশিত হয়ে এর আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার পেছনে যে ঘাটতিগুলো আছে সেগুলিকে পূর্ণ করা সম্ভব হত। তাই বলা যায় যে, বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' হয়তো পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস হয় নি; তবে আঞ্চলিক উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণ পূরণ করে এটি একটি আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দশম প্রকাশ : শ্রাবন ১৪১৬, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ১৬,
২। তদেব, পৃ ১৯
৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড) : সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ : জুন ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৩৪৬,
৪। কালের প্রতিমা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২২
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োবিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পৃ ৫৫৩
৬। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য : গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, তৃতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২২৫
৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩৪৮
৮। তদেব, পৃ ৩৪৮
৯। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২১৩
১০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪-২০০৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৬৬৮
১১। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, পৃ ২২৮
১২। কয়লাকুঠির দেশ : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইতেদেবট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ২
১৩। তদেব, পৃ ১৩
১৪। তদেব, পৃ ১৩
১৫। অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় রচিত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশ, তৃতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০০২, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ ৪-৫
১৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৪
১৭। লেখকের কথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৭
১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩৫৫
১৯। কালের প্রতিমা, পৃ ২২
২০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩২১
২১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৪৭৯-৪৮০
২২। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২১৪
২৩। তদেব, পৃ ২১৪
২৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড) পৃ ৩৬১

২৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫১৬
২৬। তদেব, পৃ ৫১৬
২৭। পদ্মানদীর মাঝি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৩, চুয়াল্লিশতম মুদ্রণ মাঘ ১৪১৮, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৭
২৮। তদেব, পৃ ১৩
২৯। তদেব, পৃ ১৬
৩০। তদেব, পৃ ২০
৩১। তদেব, পৃ ৩০
৩২। তদেব, পৃ ১৫
৩৩। তদেব, পৃ ৩৪
৩৪। তদেব, পৃ ১৪
৩৫। তদেব, পৃ ৪৩
৩৬। তদেব, পৃ ৪০
৩৭। তদেব, পৃ ২২
৩৮। তদেব, পৃ ৬১
৩৯। তদেব, পৃ ৪২
৪০। তদেব, পৃ ১১২-১১৩
৪১। তদেব, পৃ ১৪
৪২। তদেব, পৃ ৩৯
৪৩। তদেব, পৃ ১৮
৪৪। তদেব, পৃ ২৯
৪৫। তদেব, পৃ ৫৯
৪৬। তদেব, পৃ ১১১
৪৭। তদেব, পৃ ৬৯
৪৮। তদেব, পৃ ১৮
৪৯। তদেব, পৃ ২৪
৫০। তদেব, পৃ ৫৩
৫১। তদেব, পৃ ২৫
৫২। তদেব, পৃ ৮৩
৫৩। তদেব, পৃ ৩৫
৫৪। তদেব, পৃ ২৬
৫৫। কালের প্রতিমা, পৃ ৯২-৯৩
৫৬। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
৫৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৬৪
৫৮। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২১৩
৫৯। অশুকুমার সিকদারের 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি উপন্যাস' প্রবন্ধ, চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪১৫, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ২০৭
৬০। কালের প্রতিমা, পৃ ৯২
৬১। নিতাই বসুর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮) গ্রন্থের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা অংশ।
৬২। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য : গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২৬৩
৬৩। তদেব, পৃ ২৬৩
৬৪। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ১৬৮
৬৫। উপন্যাসের শৈলী : আশিসকুমার দে, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ ৭৯
৬৬। কথাশিল্পী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৪, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ ২০
৬৭। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৫
৬৮। বাংলা সাহিত্যসঙ্গী : শিশিরকুমার দাশ (সংকলন ও সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ ১২২
৬৯। মানিক উপন্যাস : জীবনের জটিলতা : কানাই সেন, প্রথম প্রকাশ : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা, পৃ ৫২
৭০। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'বাংলা সাহিত্যের নানারূপ' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশ, প্রথম প্রকাশ : ১লা তদেবাদ্র, ১৩৮৫, ষষ্ঠ মুদ্রণ : শ্রাবন, ১৪১০, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, পৃ ১৪১-১৪২

৭১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪১
৭২। নতুনফসল : সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০২, অঞ্জলী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ৩৭৬
৭৩। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
৭৪। বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ২২৩
৭৫। নতুনফসল, পৃ ৯
৭৬। তদেব, পৃ ১২৫
৭৭। তদেব, পৃ ৭-৮
৭৮। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
৭৯। নতুনফসল, পৃ ২৪
৮০। তদেব, পৃ ২৫
৮১। তদেব, পৃ ২৩-২৪
৮২। তদেব, পৃ ৬৫
৮৩। তদেব, পৃ ৩৭
৮৪। তদেব, পেছনের প্রচ্ছদ
৮৫। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য : বাসুদেব মোশেল (সম্পাদিত), গ্রন্থে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত ‘আঞ্চলিক উপন্যাস‘ প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮, বুকসওয়ে, কলকাতা, পৃ ৪২৮
৮৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়) — ভুদেব চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৪, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৩৭৪-৩৭৫
৮৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৩
৮৮। সাহিত্য বিতান : মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৬, পৃ ৪০৭
৮৯। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন : ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত) গ্রন্থের সমরেশ মজুমদারের ‘উপন্যাসে আঞ্চলিকতা বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস’ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৪১২, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ ১০৬৮
৯০। তদেব, পৃ ১০৬৮
৯১। আরণ্যক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়, দ্বাবিংশ মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পেছনের প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ
৯২। বিভূতি রচনাবলী (১ম খণ্ড) : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৩৭৭, পৃ ৪১৭
৯৩। সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী, পৃ ২৬
৯৪। কালের প্রতিমা, পৃ ৫৩
৯৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬১৪
৯৬। আরণ্যক, পেছনের প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ
৯৭। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ১৭৭
৯৮। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৬৪
৯৯। তদেব, পৃ ২৬৫
১০০। উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, পৃ১১৩-১১৪
১০১। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পৃ ২৩৯
১০২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ, ৬১৪-৬১৫
১০৩। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৭০
১০৪। আরণ্যক, পৃ ১২০
১০৫। তদেব, পৃ ১৩
১০৬। তদেব, পৃ ২১
১০৭। তদেব, পৃ ১৫৫
১০৮। তদেব, পৃ ১৫৭
১০৯। তদেব, পৃ ১১
১১০। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, পৃ ৪২৯
১১১। সাহিত্য প্রকরণ, পৃ ১৭৪
১১২। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ১০৭
১১৩। ধাত্রীদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ — আশ্বিন ১৩৪৬, অষ্টাদশ মুদ্রণ — পৌষ ১৪০৫, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ ৫
১১৪। তদেব, পৃ ৫
১১৫। তদেব, পৃ ২২৪
১১৬। তদেব, পৃ ১৮৯
১১৭। তদেব, পৃ ১৬৩
১১৮। তদেব, পৃ ৮২
১১৯। তদেব, ১১৯
১২০। তদেব, পৃ ৯০

১২১। তদেব, পৃ ৭৭
১২২। তদেব, পৃ ৬
১২৩। তদেব, পৃ ৭
১২৪। তদেব, পৃ ৭৬
১২৫। তদেব, পৃ ১৬৬
১২৬। তদেব, পৃ ১৬৭
১২৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৯
১২৮। তদেব, পৃ ৫৫১-৫৫২
১২৯। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৫০
১৩০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫২
১৩১। কালিন্দী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্দশ মুদ্রণ, পৌষ ১৪১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ ১৭
১৩২। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৪২-২৪৩
১৩৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫২
১৩৪। কালিন্দী, পৃ ৩
১৩৫। তদেব, পৃ ২৩৫
১৩৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫৩
১৩৭। কালিন্দী, পৃ ১৮
১৩৮। তদেব, পৃ ৮৮
১৩৯। তদেব, পৃ ৬৯
১৪০। তদেব, পৃ ৬৯
১৪১। তদেব, পৃ ১২৫
১৪২। তদেব, পৃ ১২৫
১৪৩। তদেব, পৃ ৮২
১৪৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫৩
১৪৫। কালিন্দী, পৃ ১৭
১৪৬। তদেব, পৃ ২১
১৪৭। তদেব, পৃ ৭২
১৪৮। তদেব, পৃ ৮৩
১৪৯। গণদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'প্রথম সংস্করণের নিবেদন' অংশ।
১৫০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫৫
১৫১। তদেব, পৃ ৫৫৮
১৫২। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৬২
১৫৩। তদেব, পৃ ১২০
১৫৪। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৪৫
১৫৫। তদেব, পৃ ২৪৬
১৫৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২১২
১৫৭। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ১৯৯
১৫৮। কালের প্রতিমা, পৃ ২৩২
১৫৯। তদেব, পৃ ১৬৪
১৬০। পঞ্চগ্রাম : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠ মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ভূমিকা অংশ
১৬১। কালের প্রতিমা, পৃ ৩৩
১৬২। তদেব, পৃ ১৬৩-১৬৪
১৬৩। তদেব, পৃ ১৬৩
১৬৪। গণদেবতা, পৃ ১৬
১৬৫। তদেব, পৃ ২০৪
১৬৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৫
১৬৭। তদেব, পৃ ১৬৩
১৬৮। তদেব, পৃ ১৬২
১৬৯। পঞ্চগ্রাম, পৃ ৪০-৪১
১৭০। তদেব, পৃ ২৪-২৫
১৭১। গণদেবতা, পৃ ৬৬
১৭২। তদেব, পৃ ১৩০

১৭৩। তদেব, পৃ ২০৩
১৭৪। তদেব, পৃ ৪২
১৭৫। তদেব, পৃ ১০৮
১৭৬। তদেব, পৃ ১২০
১৭৭। তদেব, পৃ ২৩২
১৭৮। তদেব, পৃ ১৩১
১৭৯। তদেব, পৃ ১৩২
১৮০। তদেব, পৃ ১৩২
১৮১। তদেব, পৃ ১৩৩
১৮২। পঞ্চগ্রাম, পৃ ১৩৪
১৮৩। তদেব, পৃ ১৩৪
১৮৪। তদেব, পৃ ১৫৬
১৮৫। তদেব, পৃ ১৬৩
১৮৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫৮
১৮৭। তদেব, পৃ ৫৬১
১৮৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৮
১৮৯। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃষ্ঠা ৪১
১৯০। কবি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিংশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, উৎসর্গপত্র
১৯১। তদেব, পৃ ১৭১
১৯২। তদেব, পৃ ১
১৯৩। তদেব, পৃ ৮৩
১৯৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৯
১৯৫। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫৪
১৯৬। কালের প্রতিমা, পৃ ৪২
১৯৭। কবি, পৃ ১৮
১৯৮। তদেব, পৃ ১৫৫
১৯৯। তদেব, পৃ ১১০
২০০। তদেব, পৃ ১১৭
২০১। তদেব, পৃ ১০৬
২০২। তদেব, পৃ ২৩
২০৩। তদেব, পৃ ৩২
২০৪। তদেব, পৃ ৩৫
২০৫। তদেব, পৃ ৩৬
২০৬। তদেব, পৃ ৫১
২০৭। তদেব, পৃ ৫৩
২০৮। তদেব, পৃ ৬৩
২০৯। তদেব, পৃ ৮৩
২১০। তদেব, পৃ ১০৮
২১১। তদেব, পৃ ১২৮
২১২। তদেব, পৃ ১৭১
২১৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৮–৫৪৯
২১৪। তদেব, পৃ ৫৪৯
২১৫। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫৬
২১৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৬
২১৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তদেবূমিকা অংশ, পৃ ১
২১৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬২৪
২১৯। তদেব, পৃ ৬২০
২২০। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৩৫
২২১। কালের প্রতিমা, পৃ ১৫৫
২২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪০০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, 'উপনিবেশ' উপন্যাসের ভূমিকা, পৃ ১৯৭
২২৩। তদেব, উপনিবেশের ভূমিকা, পৃ ১৯৮
২২৪। তদেব, আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত ভূমিকা অংশ, পৃ খ

২২৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬২০
২২৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২০১
২২৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ভূমিকা অংশ, পৃ ২৫৪
২২৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২০৫
২২৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ৪৭
২৩০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৬৬
২৩১। তদেব, পৃ ২৪৬
২৩২। তদেব, পৃ ২০১
২৩৩। তদেব, পৃ ২০২
২৩৪। তদেব, পৃ ২৫৩
২৩৫। তদেব, পৃ ২৫৫
২৩৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ১৮
২৩৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ ২৫২
২৩৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত ভূমিকা অংশ, পৃ খ
২৩৯। তদেব, পৃ ২২২
২৪০। তদেব, পৃ ২২৩
২৪১। তদেব, পৃ ২৩৭
২৪২। তদেব, পৃ ২৬৬-২৬৭
২৪৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ৬৭
২৪৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৩৫
২৪৫। তদেব, পৃ ২৪৬
২৪৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ ২৩৫
২৪৭। তদেব, পৃ ২৫৫
২৪৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৪৯-২৫০
২৪৯। তদেব, পৃ ২৫৯
২৫০। তদেব, পৃ ২৫৯
২৫১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ১৯
২৫২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৬০
২৫৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬২৬
২৫৪। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২৫২
২৫৫। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ ৩০১
২৫৬। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'বাংলা সাহিত্যের নানারূপ' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশ, প্রথম প্রকাশ : ১লা তদেবাদ্র, ১৩৮৫, ষষ্ঠ মুদ্রণ : শ্রাবন, ১৪১০, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা,
২৫৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৬৪
২৫৮। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫২
২৫৯। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃষ্ঠা ২৪১
২৬০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৬৪
২৬১। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
২৬২। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা : চিরায়ত জীবন' প্রবন্ধ, উপন্যাসের বর্ণমালা — সুমিতা চক্রবর্তী, পৃ ৪৭
২৬৩। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ১৬৯
২৬৪। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চৌত্রিশতম মুদ্রণ ২০১২, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবেদন অংশ
২৬৫। আমার সাহিত্যজীবন, পৃ ২৮
২৬৬। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃ ২৮৫
২৬৭। তদেব, পৃ ২৮৫
২৬৮। তদেব, পৃ ২৮৬
২৬৯। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫৩
২৭০। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃ ৫
২৭১। তদেব, পৃ ৫
২৭২। তদেব, পৃ ৭
২৭৩। তদেব, পৃ ৮
২৭৪। তদেব, পৃ ৯
২৭৫। তদেব, পৃ ২৬

২৭৬। তদেব, পৃ ১০০
২৭৭। তদেব, পৃ ৬০–৬১
২৭৮। তদেব, পৃ ২৬২
২৭৯। তদেব, পৃ ৭
২৮০। তদেব, পৃ ৯৫
২৮১। তদেব, পৃ ৮২
২৮২। তদেব, পৃ ৬৪
২৮৩। তদেব, পৃ ৩২
২৮৪। তদেব, পৃ ৩৫
২৮৫। তদেব, পৃ ২০১–২০২
২৮৬। তদেব, পৃ ১৭০
২৮৭। তদেব, পৃ ৫২
২৮৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৬৫
২৮৯। তদেব, পৃ ৫৬৫–৫৬৬
২৯০। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃ ১৮
২৯১। তদেব, পৃ ১৭
২৯২। তদেব, পৃ ১৪
২৯৩। তদেব, পৃ ৬৯
২৯৪। তদেব, পৃ ২০২
২৯৫। তদেব, পৃ ২০৬
২৯৬। তদেব, পৃ ৪৫
২৯৭। তদেব, পৃ ১২৮–১২৯
২৯৮। তদেব, পৃ ৮২–৮৩
২৯৯। তদেব, পৃ ১৮৬–১৮৭
৩০০। তদেব, পৃ ১৫১
৩০১। তদেব, পৃ ৮
৩০২। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫২
৩০৩। কালের প্রতিমা, পৃ ২৮
৩০৪। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃ ৮৮
৩০৫। তদেব, পৃ ৮৯
৩০৬। তদেব, পৃ ৯৩
৩০৭। তদেব, পৃ ১৪৪
৩০৮। তদেব, পৃ ১৪৫
৩০৯। তদেব, পৃ ১৪৭
৩১০। তদেব, পৃ ১৬৯
৩১১। তদেব, পৃ ২১১
৩১২। তদেব, পৃ ২১৭
৩১৩। তদেব, পৃ ২৪০
৩১৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৬৯
৩১৫। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫২
৩১৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৭
৩১৭। তদেব, পৃ ২৪৬
৩১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড) : সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৩৯৯
৩১৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৮১৪
৩২০। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩১১
৩২১। কালের প্রতিমা, পৃ ১৩২
৩২২। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২৩৮
৩২৩। বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি : অলোক রায়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ১২৪
৩২৪। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃষ্ঠা ৯০
৩২৫। তদেব, পৃ ২১৭
৩২৬। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৬
৩২৭। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩২১

৩২৮। ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী, সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১০, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৩
৩২৯। তদেব, পৃ ৩
৩৩০। তদেব, পৃ ৪
৩৩১। তদেব, পৃ ৬৯
৩৩২। তদেব, পৃ ২০০
৩৩৩। তদেব, পৃ ২১২-২১৩
৩৩৪। কালের প্রতিমা, পৃ ১২৫
৩৩৫। ঢোঁড়াই চরিত মানস, পৃ ৩-৪
৩৩৬। তদেব, পৃ ৫
৩৩৭। তদেব, পৃ ৫
৩৩৮। তদেব, পৃ ৫-৬
৩৩৯। তদেব, পৃ ৬৬-৬৭
৩৪০। তদেব, পৃ ১৬৮-১৬৯
৩৪১। তদেব, পৃ ২১২
৩৪২। তদেব, পৃ ১৩৩-১৩৪
৩৪৩। তদেব, পৃ ১৪৮-১৪৯
৩৪৪। তদেব, পৃ ৬
৩৪৫। তদেব, পৃ ১৭
৩৪৬। তদেব, পৃ ১০০
৩৪৭। তদেব, পৃ ১৮-১৯
৩৪৮। তদেব, পৃ ৪২-৪৩
৩৪৯। তদেব, পৃ ৭
৩৫০। তদেব, পৃ ৮
৩৫১। তদেব, পৃ ৫
৩৫২। কালের প্রতিমা, পৃ ১৩৪
৩৫৩। ঢোঁড়াই চরিত মানস, পৃ ২৫-২৮
৩৫৪। তদেব, পৃ ২৮-২৯
৩৫৫। তদেব, পৃ ২৯
৩৫৬। তদেব, পৃ ১৬৯-১৭০
৩৫৭। তদেব, পৃ ১৮৭-১৮৯
৩৫৮। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩১০
৩৫৯। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস : অশ্রুকুমার সিকদার, চতুর্থ সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ২৫৪
৩৬০। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২২৭
৩৬১। তদেব, পৃ ২৩৯
৩৬২। কালের প্রতিমা, পৃ ১২৫
৩৬৩। তদেব, পৃ ১৩৩
৩৬৪। উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি পৃ ১৫৫
৩৬৫। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৩০
৩৬৬। ইছামতী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চদশ মুদ্রণ, জৈষ্ঠ ১৪১৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পেছনের প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ।
৩৬৭। তদেব, পৃ ৩
৩৬৮। তদেব, পৃ ৪৬
৩৬৯। তদেব, পৃ ১১২
৩৭০। তদেব, পৃ ৮
৩৭১। তদেব, পৃ ১১৮
৩৭২। তদেব, পৃ ১১৮
৩৭৩। তদেব, পৃ ৬৯-৭০
৩৭৪। তদেব, পৃ ৪
৩৭৫। তদেব, পৃ ৬
৩৭৬। তদেব, পৃ ২৪
৩৭৭। তদেব, পৃ ২৬
৩৭৮। তদেব, পৃ ৩৭
৩৭৯। তদেব, পৃ ৯

৩৮০। তদেব, পৃ ৪৪
৩৮১। তদেব, পৃ ৪০
৩৮২। তদেব, পৃ ৭৫
৩৮৩। তদেব, পৃ ১০৩
৩৮৪। তদেব, পৃ ১০৪
৩৮৫। তদেব, পৃ ৯২
৩৮৬। তদেব, পৃ ৬৯
৩৮৭। তদেব, পৃ ৭
৩৮৮। তদেব, পৃ ৪৪
৩৮৯। তদেব, পৃ ৩২
৩৯০। তদেব, কালের প্রতিমা, পৃ ৭০
৩৯১। তদেব, পৃ ৭২
৩৯২। ইছামতী, পেছনের প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ।